

ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ।

অমোঘে উইল

“জীবন-সংগ্রাম,” “মানব-চিত্র,” “সংসার-চিত্র”

প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত ।

এচ, পি, ব্যানার্জি কর্তৃক প্রকাশিত ।

আবণ, ১৩২০ সাল ।

মূল্য ১।০ টাকা ।

PRINTED BY K. C. CHAKRAVARTY,
GIRISH PRINTING WORKS,
52. *Sukea Street*.—*Calcutta*



ভূমিকা ।

দ্ব্যপ্রণীত “জীবন-সংগ্রাম,” “মানব-চিত্র” ও “সংসার-চিত্র” পুস্তক তিনখানিকে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণ স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। ছয় মাসের মধ্যেই “জীবন-সংগ্রামের” ১ম সংস্করণ এক সহস্র পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায়, দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাইতে হয়, এক্ষণে তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। “মানব-চিত্র” ও “সংসার-চিত্রের” ও দ্বিতীয় সংস্করণ চলিতেছে। এজন্য আমি আমার পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট কৃতজ্ঞ। এক্ষণে আমার “ভবরামের উইল” প্রকাশিত হইল, জানি না ভবরামের উইলকে তাঁহারা কি চক্ষে দেখিবেন।

“জীবন-সংগ্রাম,” “মানব-চিত্র” ও “সংসার-চিত্র” প্রকাশিত হইবার পর নানারূপ ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া জননী বীণাপাণির সেবা হইতে একবারে বঞ্চিত ছিলাম—ইহা আমার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় গত পোক মাসে বায়ু পরিবর্তনের জন্ত যখন পশ্চিমে যাই, তখন আমার অভিন্নহৃদয় অকুজ্জিন্ন ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু, লক্ষপ্রতিষ্ঠ লেখক “সুধা,” “পথের কথা,” “ঘরের কথা,” “নবায়ন” প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িতা শ্রীযুক্ত ককিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভায়া আমাকে আর একখানি পুস্তক

লিখিবার জন্ত উৎসাহপূর্ণ ভাষায় পত্র লেখেন। সে পত্রখানির ভাষা কি উৎসাহপূর্ণ,—কি আবেগময়ী! সে পত্রখানিতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল;—“ভাই! তুমি আর একখানি পুস্তক লেখ, তা হই করিয়া বিক্রয় হইবে।”

বঙ্গুর উৎসাহ ও অনুরোধপূর্ণ পত্র না পাইলে, ভয়স্বাস্থ্যে “ভবরামের উটল” হয় তা লিখিতে পারিতাম না। তাই পুস্তকখানি সমাপ্ত করিয়া স্নেহসিক্ত হৃদয়ে সুস্বপ্নরূপে বার বার স্মরণ করিতেছি। এক্ষণে বঙ্গুরের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে কি ন পাঠক-পাঠিকাগণ বলিতে পারেন।

২রা শ্রাবণ)

১৩২০ সাল।)

প্রস্তুতকার।



"জীবন-সংগ্রাম," "মনের চিত্র," "সংসার চিত্র," "ভবরামের উইল"

ভাষিত প্রকৃ-প্রণেতা—

শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসর্গ-পত্র ।

স্বদেশনিষ্ঠ, সুলেখক, ধর্মপ্রাণ বন্ধু

শ্রীযুক্ত পীযুষকান্তি ঘোষ মহাশয়ের নামে

আমার অতি আদরের

“ভবরামের উইল”

উৎসর্গীকৃত হইল ।

তার পীযুষ,

আজ চারি বৎসরের মধ্যে এমন একটি দিনও যায় না, যে
আমি তোমার কণা ভাবি না ! যখনই তোমাকে মনে পড়ে,
নই তোমার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাই ! তোমার
মনে হইলেই,—তোমার সেই সরল, অকপট, পবিত্র, মহান
হৃদের কাছে সত্য সত্যই মস্তক অবনত করিতে ইচ্ছা করে ।
তোমার হৃদয়খানিতে অদম্য উৎসাহ ও তেজ, পবিত্রতা ও সরলতা

সর্বোপরি পরোপকার-স্পৃহা যেন মাথান রহিয়াছে। ভাই ! তোমার গর্ব করিবার অনেক জিনিস আছে ; কিন্তু অহঙ্কারের ছায়া কোনদিন ত তোমার হৃদয়ে দেখিতে পাইলাম না ! স্বনাম-ধন্য ধর্মবীর ও কর্মবীর, বৈষ্ণব ধর্মের মেরুধর্ম স্বরূপ, একমিষ্ট দেশ-সেবক, সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম-সংস্কারক, অদ্বিতীয় লেখক ও বক্তা, “অমৃতবাজার” পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও দেশ-বিখ্যাত সম্পাদক স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের আয়ুজ্য তুমি, তাই বুঝি অহঙ্কারের কালিমা কোনদিন তোমার হৃদয়খানি স্পর্শ করিতে পারে নাই ! ভাই ! তোমাকে যে চিনিয়াছে, সেই জানে তুমি কি ও কেমন, আর তোমার এই ক্ষুদ্র বন্ধু বুঝিয়াছে, তোমার হৃদয়খানি সংসারের ময়লা গাটি হইতে কত উচ্চস্তরে অবস্থিত।

ভাই ! তোমার সুমিষ্ট ইংরাজী লেখার মাধুরীতে মুগ্ধ নয় কে ? তোমার সম্পাদিত “স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে” অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে যে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছ, ধর্ম সম্বন্ধীয় একরূপ সুললিত প্রবন্ধ আর কেহ লিখিয়াছেন কি না জানি না !

ভাই পীয়ুষ ! পরোপকার-স্পৃহা, নেশার মত যেন তোমার হৃদয়খানিকে সর্বক্ষণ বিভোর করিয়া রাখিয়াছে। কর্মস্তুপের মধ্যে অহোরাত্র ডুবিয়া আছ, তত্রাচ পরোপকারের জন্ত কেহ দণ্ডায়মান হইলে তাহাকে বিফল মনোরথ হইয়া কোনদিন ফিরিতে হয় নাই। ভাই ! সে সময় তোমার মানাপমান জ্ঞান

মাকে না, যেন কি এক স্বর্গীয় দীপ্তিতে তোমার মুখখানি উজ্জ্বলিত
হইয়া উঠে ! তখন পরোপকারের কৃত্ত তোমার উচ্চ মহৎ-হৃদয়
কুদ্রের দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইতেও সঙ্কুচিত হয় না ! পরোপকারের
নামে যেন কোন অজানিত স্থান হইতে অদম্য বল ও উৎসাহ
আসিয়া তোমার হৃদয়কে স্ফীত করিয়া তুলে ! তখন তোমার
হৃদয়ের ভিতর যেন সপ্তসিংহ গর্জিয়া উঠে । এমনটি ত আর
কোনখানে খুঁজিয়া পাইলাম না ভাই !

ভাই পীযুষ ! “ভবরামের উইল” আমার বহু পরিশ্রমের ফল !
সুতরাং ইহা আমার অতি আদরের সামগ্রী ! দুর্বল দেহে ; ভয়-
স্বাস্থ্যে “ভবরামের উইলকে” সম্পূর্ণ করিবার কৃত্ত প্রাণপণ
করিয়াছি ।

ভাই ! আমি যে কেবল তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি,
তাছাড়া নহে, তোমার হৃদয়ের উচ্চ গুণগুলি সর্বদা আমি জন্মের
রাখিয়া রাখা করি ; তাই আমার এই অতি যত্নের ধন, ধর্মপ্রাণ
সাদক “ভবরামের উইল”খানি তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম ।
তোমার বৃদ্ধ বন্ধুর ইহা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ উপহার ! স্নেহভরে
গ্রহণ কর ।

সন ১২০ সাল
তারিখ ১২ শ্রাবণ
ইং ১৩০১

}

প্রস্তুতকার ।

ভবরঞ্জন উইল ।



প্রথম প্যারাচ্ছেদ ।

“হুঁনি কি ভাব যে প্রকৃত বলিয়া একবারেই স্বাধীন । বোঝা
হইত ততাই করিলে ?”

“তোমার কাছে বরাবরই অধীন হইয়া আছি । স্বাধীন আর
কেন হইলাম ? বিবাহিত প্রকৃত যদি স্বাধীন হইত, তাহা হইলে কি
তোমরা আনন্দিতকে এমন করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বাধিয়া রাখিতে
সমর্থ হইতে ?”

“টান্টা করিত, কথা গুলাকে লঘু করিলে চলিবে কেন ? হিন্দু
ত আর কলহে পাশ করিয়া স্বাধীন ঘর করিতে আসে না !
তাচ্ছিল্য করিয়া সকল কথা আমাকে বলিতে চাও না এবং
মাদের সকল কথা বৃদ্ধিবার শক্তি নাই সত্য—কিন্তু সে সম্বন্ধে
প্রকৃষের কোনও দায়িত্ব নাই ?”

ভবরামের উটল।

“আজ তোমাকে যে ভিন্ন মূর্তিতে দেখিতেছি? কৈ এমন করিয়া ত একদিনও আমার সঙ্গে কথা কও না।”

“সেই পশ্চিমে দাঁড়াইয়া আমি অবশিষ্ট আমিও তোমাকে ভিন্ন মূর্তিতে দেখিতেছি! কিছুতেই তোমার মতির স্থিরতা নাটকতদিন তোমাকে মিনতি করিয়া ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাস করিয়াছি,—কিন্তু কোন সত্ত্বের পাট নাট! আজ আবার ভনিতেছি কিছুদিনের জন্য পশ্চিমে দাঁড়াব। আমি কি তোমার মনের একটা কথাও জানিবার অধিকারিণী নই?”

“সুখী হইলাম। তুমি যে এমন করিয়া আজ আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ, ইহাতে প্রকৃতই আনন্দ হইতেছে। আজ পর্য্যন্ত তোমাকে যে আমি চিনিতে পারিলাম না, ইহাই আমার দুঃখ।”

“তোমার জন্মের ভিতরটুকু এতদিনের মধ্যেও আমি একবার দেখিতে পাইলাম না—দুঃখে ক্ষোভে এই জন্মটুকু সর্বক্ষণ আমারও নয়নপ্রাপ্ত দিয়া অশ্রু পরিতে থাকে।”

“তবে বলিতেছি শুন। সংসারে আমরা কতদিনের জন্য আশিরাছি বল দেখি?”

“তা’ কি ঠিক করিয়া বলা যায়?”

“একটা আন্দাজ করিও ত বলা যায়?”

“বড় জোর পঞ্চাশ বাট বৎসরের জন্য।”

“তারপর আমরা কোথায় বাটব বলিতে পার?”

"যে প্রকারে মীমাংসা আজও পর্যাশ্রিত করিতে পারিল না, সে প্রকার আমাকে করিতেছ কেন ?"

"বেশ কণা ! এমন স্থানে মানুষকে যাউন ও হয়, যে স্থানের সম্বাদ আজও পর্যাশ্রিত পার নাহি । এমন বল দেখি এমন অজানিত স্থানে যাউবার জন্য কি একটুও প্রস্তুত থাকা উচিত নয় ?"

"নিশ্চয়ই ।"

"দেখ ! তাম্রিয় খোঁজিয়াই আমাদের দিন কাটিয়া যাউতেছে । উদ্দেশ্য চিন্তা, — অর্থের ভাবনাতেই — জীবনের সমুদায় সময়টাই অতিবাহিত হইয়া যায় । স্বার্থ-স্বার্থ করিয়াই আমরা পাগল ! পার্থিব সুখ, পার্থিব স্বার্থ, পার্থিব ঐশ্বর্য্য হইলেই আমরা মত্ত জ্ঞান করি ! উহাই কি জীবনের লক্ষ্য ?"

"তু ' কি উড়াইতে পারে ?"

"কেন পারে না ?"

"তাহা হইলে আমরা উড়াতেই সূক্ষী হইতে পারিতাম । আবার সুখের আশ্রয়েই আমরা দিগকে ছুটিতে হইত না ! অন্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর যিনি — তিনিও যখন সূক্ষী নন, তখন সুখ সে পার্থিব বস্তুতে নাই, একথা বেশ বুঝিতে পারা যায় ।"

"বেশ কণা বলিয়াছ ! তাহা হইলে প্রকৃত সুখের আশ্রয়ণ সকলেরই করা কর্তব্য ! পার্থিব কলিক সুখে মগ্ন থাকা বোধ হয় কাহারও উচিত নয় ?"

ভবরামের উইল ।

“কখনই না ?”

“কেন তবে আমরা থাকি ?”

“কি করিয়া কুনিব ? বোধ হয় আমাদের কর্মক্ষম ! নচেৎ
সংসারের মধ্যে কত অমূল্য নিধি ছড়ান আছে, সেদিকে না চাহিয়া
মোহাক্ত নয়নে জন্মের স্তম্ভ যাত্রা তাহাকেই আঁকড়াটির পরিত্য
ছুটিব কেন ?”

“সাগর ! তোমার কথা শুনিয়া আজ আমার যে আনন্দ
হইতেছে, অনেকদিন এরূপ আনন্দ আমি জীবনে উপভোগ করি নাই
সত্য সত্যই আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই ! লজ্জাক্রমে লোভ
প্রাচীর এতদিন তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলটি আমাকে দেখিতে দেয়
নাই ! আজ আমি অকপট হৃদয়ে আমার জীবনের অতীত কথা
তোমাকে শুনাইব । বাল্যকাল হইতেই আমি ভাবি—জীবনট
কষদিনের জন্ত ? কেন আসিয়াছি ? জীবনের অবসানে কোথায়
আবার আমাদের গকে যাইতে হইবে ? কিন্তু, মীনাঃসাত হইল না ।
সংসারের কোলাহলে,—স্বার্থের চিন্তায় জীবনের এক তৃতীয়াংশ
চলিয়া গেল ! পরপারে যাইবার জন্ত জীবনটা দ্রুতপতিতে
অগ্রসর হইতেছে ! অনাচার, অত্যাচার, কাম, ক্রোধ, লোভ,
মোহাদি প্রবল শত্রুগণ সজোরে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে !”

“সংসারের কোলাহল হইতে স্বার্থের পার্শ্ববিক গচ্ছন হইতে
যখন একটু দূরে থাকি, তখনই ভাবিবার একটু অবসর পাই

ভাবিতে ভাবিতে পরাণ শিউরিয়া উঠে ! ভাবি,—নোহের বৃণি
পাকে পড়িয়া কি নিষ্ঠুরভাবেই জীবনটা বিনষ্ট হইতেছে ! এমন
করিয়াই কি ইহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিব ?”

“বাল্যকাল হইতে পথপ্রদর্শক গুজিতেছি—এমনই হতভাগা
কোনও পথপ্রদর্শক পাউলান না !”

“সত্য ! সত্য সত্যই অদয় অস্থির হইয়া উঠে ! ক’টা বৎ-
সরেও ত সমস্যার আসিয়াছি—কোথায় অমৃতের সন্ধানে ঘুরিব—
তিন কালের পূলা কাদা নাথিয়া জীবনটাকে লুপ্ত করিত,—
করুণা করিয়া ফেলিতেছি ! কত যুগ-যুগান্তর পরিয়া আনন্দের
আসিয়াছি—যাইতেছি,—আমাদিগকে সত্যের পথ দেখাইবার জন্ত,
—অমৃতের সন্ধান দিবার জন্ত চারিদিকে বৃহত্তর ভৈরী নিনাদ
হইতেছে, তবু ত আনন্দের পূলা খেলা ছাড়িতে পারিতেছি না—আন-
ন্দের ত মোহনিনী ভাস্কিতেছে না ! সবাই বলে জীবনটা ছ’দিনের,
—সবাই জানে এখানে আনন্দের নিদ্রিষ্ট ক’টা বৎসর বাতীত আর
কোন দিন থাকিতে আসি নাই ; কিন্তু কেহও একথা প্রাণের
ভিতর অমৃতভব করে না ! আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, খেলার সাপী-
ককে খাশানে দখল করিয়া “ভরিবোল” ধানি করিয়া আসিয়াই,—
এ ধানির প্রতিধ্বনি বায়ুর সঙ্গে মিশিতে না মিশিতে,—নয়নের
জ্বালায় শুষ্ক হইতে না হইতেই—পূলা কাদা লইয়া খেলা করিতে
বস ! কি মজার সংসার !”

“এতদিন আমার হৃদয় নরভূমির মত শুষ্ক হইয়াছিল—সেই শুষ্ক নরভূমির উপর দাবানল জ্বলিতেছিল,—প্রাণ জ্বলিয়া পুড়িয়া চাই শুইবার উপক্রম হইয়াছিল! আজ সেই দগ্ধ হৃদয়ে যেন একটু শান্তির বারি ধারা পড়িয়াছে। তাই নিরাশা হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছে।”

“আমি অমৃতের স্বাদনে বাইব—জানি না আমার অদৃষ্টে দটাবে কি না! কে জানে আশা নদী শুষ্ক হইয়া যাইবে কি না! যদি সেই সাধু মহাত্মা দর্শন দেন, তবে সাগরবালা! আমাদের জীবন সার্থক হইবে,—আমরা মৃত্যু হইব!”

“শুষ্ক কৃপা বাতীত ভবনদী পার করিবার সাধা আর কাহারও নাই। কত সাধু সন্তাদী দেখিয়াছি, ভক্তি অশ্রুতে কাহারও চরণ ধৌত করিতে পারি নাই! সে সময় বৃষ্টি এতদিন আসে নাই!”

“কতক সন্তাদী বলিয়াছিলেন—‘বিশ্বাস কর! যাহাকে বিশ্বাস করিবে সেই তেমনাকে ভক্তির পথ দেখাইয়া দিবে।’ বিশ্বাস ভক্তি বৃষ্টি তখন হৃদয়ে ছিল না!”

“সেই সন্তাদী স্বপ্নের একটি ভক্তি বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত বলিয়াছিলেন। পূর্বকালে এক রাজা পুত্রকলত্র পরিবেষ্টিত হইয়া বহুদিন রাজ্য-সুখ ভোগ করিতেছিলেন। সুখের স্ফূর্তি তাঁহার আর মিটে নাই। রাজ্যের পর রাজ্য—কত রাজ্য ক্রয় করিলেন, সুখের বাসনা-প্রসারের কামনা তবু মিটিল না! বান্ধক্য আসিল। ভিন্ন

রাজ্যলাভের স্পৃহা আরও বদ্ধিত হইতে লাগিল । রাজার এক দিন সভাস্থানের উদয় হইল । ভাবিলেন অসংখ্য রাজার রাজ্য আমি... তবু সুখ শাস্তি ত পাটলাম না । সুখ শাস্তি লাভের জন্য সদাই ত আমার অশাস্তিতে কালযাপন করিতে চইতেছে ! তবে কি আরও কতকগুলি রাজ্য লাভ করিতে পারিলে আমি সুখী হইব ? না... তাহাও ত সম্ভব নহে ! তবে প্রকৃত সুখ কোথায় ? যেখানে গমন করিলে প্রকৃত সুখ পাইব, তাহার অন্বেষণেই বাইব । সেই সুখের লক্ষ্য কে দেখাইয়া দিবে ? গুরু ত চাই । প্রতিজ্ঞা করিলেন অরণো গিয়া তাঁহাকে প্রথম দেখিতে পাটাবেন, তাঁহাকেই গুরুপদে দরশন করিবেন । এক দম্ভা পরধন লুণ্ঠনের জন্য অরণো লুকাইত ছিল । রাজা দম্ভার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন, “আপনি আমার গুরু” । দম্ভা ভাবিল আজ আমার শুভমাত্রা ! বিনা বস্ত্র-কাতে আশীর্ভূত লাভ হইবে । প্রসঙ্গে বলিল “আচ্ছা আমি তোমার গুরু । তোমার অঙ্গুলীতে সে তীব্রক অঙ্গুরীয়কগুলি আছে অগ্রে আনাকে দান করা” । রাজা অঙ্গুলীর দিকে এ পমায় লক্ষ্য করেন নাই । দেখিলেন তাহার মিত্রা বাবজাত তীব্রক ও নলিনাগিকা খচিত অঙ্গুরীয়গুলি অসাবধানবশতঃ অঙ্গুলীতেই রহিয়া গিয়াছে । রাজা অঙ্গুলি চইতে নলিনাগিকা খচিত অঙ্গুরীয়গুলি উন্মোচন করিয়া ভক্তিপূর্ণ সনয়ে,—কৃতজ্ঞলিপ্যেট দম্ভাকে প্রদান করতঃ প্রণাম করিলেন । দম্ভা অনিচ্ছিত চিত্তে রাজাকে বলিল,

“বতঙ্গ না আমি ফিরিয়া আসি, তুমি ভগবানের নাম
জপ কর।”

আনন্দিত চিত্তে সন্ধ্যা গ্রহণ করিল। বচকাল সে অরণ্যে
আর প্রবেশ করিল না। রাজা সেই গুরুমূর্তি সদয়ে অঙ্কিত করির
ভগবানের নাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কি কঠোর ভক্তি
বিশ্বাস!

“স্বরূপ ভগবান রাজার তপঃ প্রভাবে বিচলিত হইয়া মহাতেজঃ সৌম্য
মূর্তিতে আসিয়া দেখা দিলেন। রাজা বিশ্বাস করিলেন না, বলি-
লেন তুমি ত আমার গুরু নও। আমার গুরুদেব এখনও প্রত্যা-
গমন করেন নাই। তিনি আমাকে নাম জপ করিতে বলিয়া
গিয়াছেন, ফিরিয়া আসিয়া সাফাৎ করিবেন। রাজাকে আর
গুরুর অপেক্ষায় থাকিতে হইল না। ভগবানের বিভূতি দর্শনে—
প্রকৃত সুখ শান্তির আনন্দ পাইলেন।”

এরূপ বিশ্বাস, ভক্তি কি কখন আনন্দের আসিবে সাগরবালা ?
হৃদয়ের অস্থি-মজ্জা দিয়া যে এরূপ বিশ্বাস ও ভক্তি আনিতে
পারে, সেই প্রকৃত সুখের মুখ দেখিতে পার।

“সংসারে থাকিয়াই ত সব পাওয়া যায়।”

“তোমার প্রাণে ভয় হইল বুঝি ? বেশ জানিও আজই
আমি সন্ন্যাসী সাজিয়া বনে যাইতেছি না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত
থাকিও।”

“ঠাট্টা কর কেন ? বলি সংসারে থাকিয়াই ত সব চটেতে পারে ?”

“কেন চটেবে না ? সংসারই ত প্রকৃত সাধনার স্থান । বরঞ্চ পরমা অপরমা সংসারকে উৎকৃষ্ট স্থান বলা যাউতে পারে !”

“নিশ্চিন্ত চটলান ।”

“আমিও তাহা বুঝিয়াছি ! এতক্ষণ ভয়ে তোমার হৃদয়টা ছুঁ ছুঁ হইতেছিল—কেনন নয় ?”

“নাউক সে কথা কবে তুমি যাউবে ?”

“প্রত্যয়ে ।”

“তোমার জীবনের অতীত কথাগুলি আমি আজ শুনিব ।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

পৌষ মাস । কনকনে শীত । শীতের সন্ধ্যায় নধুপুরের বাজারায় বসিয়া স্বামী স্ত্রীতে উপরোক্ত কথোপকথন হইতেছিল । পার্শ্বে আট মাসের ছোট খোকা বদা নিদ্রা বাইতে ঘাইতে দিম্বাল করিতেছে । হৃদয়ে কেঁজ খোকা ফকু—গোলাপফুলের বাগানে ছুটাছুটি করিতেছে । নান্নায়ণ দ্বারবান সমস্ত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ক্রোড়ে উঠাইতে পারিতেছে না । স্বামী ভবরাম কলোপাখ্যার ও উত্তার স্ত্রী সাগরবালায় পরিচয় প্রাপ্তে আশঙ্কক ।

ভবরামের বয়স চল্লিশে পদার্পণ করিতে এখনও পূর্ণ এক বৎসর অবশিষ্ট থাকিলেও বারংবার চিরু পূর্ণ ভাবেই দেখে প্রকটিত । সম্মুখের একটি দন্ত অধিত, অপর কায়কটি পতনোন্মুখ হইয়া নড়াচড়া করিতেছে । দন্তকের বেশগুলি প্রায় সমস্তই শুদ্বর্ণ ধারণ করিয়াছে, কেবল দুই আনা আন্দাজ এখনও কৃষ্ণাকারে বর্তমান । স্বাস্থ্য ভয়, নিজের ও ছেলে ছটার স্বাস্থ্যায়ত্তির জন্য নধুপুরে তাওয়া বদলাইতে আসিয়াছেন । হস্তভাব ও সঙ্গতি আকাজকা জনের থাকিলেও সংসারের কোলাহলে স্বাধীনতার পড়িয়া সঙ্কল্প হাবুডুব খাইতেছেন ।

শ্রী সাগরবালা একবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন । দেখিতে গোরাঙ্গী নহেন শ্রামবর্ণা ! সাগরবালা যদিও তিনটি সন্তানের জননী—কিন্তু স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকায় তিনটি সন্তানের জননী বলিয়া পাত্ৰায় মেয়েরাও ধারণা করিতে পারেন না । গোলগাল গড়ন । যাবনের ঢল ঢল লাবণ্য এই সন্তানের জননীকে এখনও ত্যাগ করিতে না পারিয়া সর্বদা আপনার পূর্ণ অধিকার বজায় রাখিয়াছে । সাগরবালার দশম বর্ষে বিবাহ হইয়াছে,—আজ একাদশ বর্ষ ভবরাম হাঁককে লইয়া ঘরকন্না করিতেছেন, কিন্তু এখনও বৃদ্ধিতে পারেন না । সাগরবালাকে ভগবান কি পাত্তিতে গঠিত করিয়াছেন । সাগরবালার যাবতীরে ভবরাম বাবু কখন আনন্দে আত্মভারা হন,—ভাবেন এই সংসারেই স্বর্গ আছে,—যাহার স্বর্গের পূণক স্থান নির্দেশ করিয়া দেন—তাহার ভ্রাতৃ । অথবা লোক ভূলাটবার জন্য একটা কামনিক স্বর্গের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন । আবার এক একবার সাগরবালার প্রকৃতি দেখিয়া ভবরাম ভ্রূপে মিরমান হইয়া পড়েন ; ভাবেন—লোক সংসারে থাকে কেন ? বাহার সমদাম্বীয়ার সহিত বুকের মিল—বনের বনিবনা হয় না, তাহার সম্যাসী হইয়া বনে বনে অশ্রু দরাই প্রেয়ঃ ! লোক সংসারকে কেন স্রবের স্থান বলে ? সংসার বর্ষ আছে নরক !

কিন্তু সত্যি সাগরবালার সহিত যখন ভবরামবাবুর মনের মিল হয়, তখন ক্রোধে, রূপায় তাহার চক্ষু লাল হইয়া উঠে,—

তখন সারা পৃথিবীটা যেন অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়! কাজ কামে মনোযোগ নাই, লাভ ক্ষতির দিকে দৃকপাত নাই,—ছেলে ছুটীও যেন তাহার নিজের ছেলে নহে এমন ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাদের গর্ভধারিণীর সঙ্গে মতাস্তর তাদের সঙ্গে আবার সম্পর্ক কি? কাজেই তখন ভবরামবাবুর চক্ষে এই পৃথিবীখানা যেন একটা কঠিন পাথরের মত হইয়া যায়। যেন সব নিস্তব্ধ, নিষ্পন্দ, অন্ধকার! যেন এখানে পশু পক্ষী নাই,—লোকজন নাই,—গাছপালা নাই! আছে কেবল ভবরামের উদ্ভৃষ্ট, নশ্বোদ্ভূত, অন্ধদগ্ধ জদয়! সেই জদয়খানা তখন পৃথিবীর গর্ভের অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া থাকে, তাহার কোন সাড়া শব্দও থাকে না!

পাঠক! পাঠিকা! তোমরা হাসিতেছ? বুঝতী পাঠিকারা হাসিতে পার। কিন্তু পাঠক! তোমার যদি সহধর্মিণী লইয়া ঘর করা অভ্যাস থাকে তবে তুমি হাসিও না! বুকে হাত দিয়া বল দেখি তোমরাও এরূপ দিন হয় কি না? একা ভবরামের কথায় হাসিলে চলিলে কেন? আর ভবরামের এ অবস্থা তোমরা কি অস্বাভাবিক বলিয়া মনে কর?

মাঝে মাঝে সাগরবালার সঙ্গে ভবরামবাবুর মতের মিল হয় না। ইহার জন্ত দম্পতী যুগলের মধ্যে কে দায়ী তাহা পাঠক পাঠিকা বিচার করুন। আমরা বাচা জানি তাহাটে কেবল বলিয়া যাইব।

ভবরামবাব বলিলেন—“সাগরবালা ! সন্ধ্যা হইতে জানালা
বন্ধ করিয়া ঘরে আলো জালিয়া শুইয়া আছ, তোমাকে
প্রহর বসি, তবু ঘুমি শুনিবে না । নিশ্চয় বায়ু গৃহে প্রবেশ করিতে
না পারায় কেবল তোমার নয়, ছেলে ছটীরও স্বাস্থ্যহানি ঘটতেছে
যে ! স্বামীর কথা না শুনিয়া তাহার যে অপমান করিতেছ—এই
অপমানের তুলনায় তোমার পাপের মাত্রা অধিক হইতেছে । সে
দিন তোমাকে এত করিয়া বুঝাইয়াছিলাম যে ডাক্তার পঞ্চমুখচন্দ্র রায়
অকাজন পুড়িয়া যাবার ভয়ে রাত্রে ঘরে আলো জালিয়া রাখেন না ।”

সাগরবালা বলিল—“তোমার সবই অনাস্থ্য কথার ! হিচ
কিছুই ছেলেদের অসুখ করিবে যে !”

এই সামান্য কথায় তখনই ভবরামবাবকে চণ্ডাল স্পর্শ করিল !
তিনি যদি তখন মতিভ্রষ্ট ঠাণ্ড করিয়া ছুই কথা বুঝাইয়া বলেন, তাহা
হইলে সকল গোল মিটিয়া যায় ! তাহা না করিয়া বিসম উত্তেজিত হইয়া
বলিলেন, “সচি হইলে—অসুখ করিলে তোমাকে ত আর ডাক্তার
আনিতে ছুটিতে হইবে না, সে কাজটা ত করুণাময়কেই করিতে হয় ।”

করুণাময় বন্দোপাধ্যায় ভবরামের অসুখ ! করুণাময় ভব
রামের কণ্ঠের সঙ্গী, এমন কি দক্ষিণ হস্ত বলিলেও অত্যাক্তি হয়
না । ইহারা দুই ভ্রাতাই ব্যবসারী । ব্যবসায়ই ইহাদের উপ
জীবিকা । নৌকা বেক্সপ দাঁড়ি মানি উভয়েরই সাহায্য না পাইলে
জীবন জলে একটানা শ্রোতের মত বাঁচচাল হইয়া যায়, ইহাদের

ভবরামের উইল ।

বাবসা তরলীগুলিও তিরুপ উভয় ভাতার চেঁচায় এখন মোটে
মুখে উজান বহিয়া চলিতেছে ! একের অভাব হইলেই বাণিজ্য
তরলীগুলির দ্বারা আঁকিতও থাকিবেন না ! হয় ত ছাঁটুকলেই তরল
নয় হইয়া যাইবে । ভবরামের মস্তিষ্কপ্রসূত বুদ্ধিরূপ রজ
পরিয়া কনিষ্ঠ গুণ তানিয়া চলিয়াছে ! পবন উজান টান
কনিষ্ঠের শক্তিকে ধ্বংস করিতে পারে নাট ! একতার বল,
বিশেষতঃ ভাতার সহিত লাতৃশক্তি নিশ্চিত হইলে - সত্য সত্য
অসম্ভব সাধিত হইতে পারে ! আবার উহার সহিত যদি উপযুক্ত
সুন্দর বা নিজের শক্তি একত্র হয়, তবে শত বাধা, বিঘ্ন
বিপত্তিতে সে শক্তি কখনও পরাভব স্বীকার করে না ! আবার
উহার সহিত যদি উপযুক্ত পার্থক্য কল্পচরিত কল্পশক্তির সমাবেশ
ঘটে, তবে সে বাণিজ্যতরলী পৃথিবীর সর্বশক্তির কাছে অত্যা
হইয়া উঠে ! বাড়িক সে সব কথা । বলিতে বসিয়াছি সাগর
বালার কথা ভাতার উপর ভাসাইলাম বাণিজ্যতরলী ! কোথাক
হাসিবেন যে !

সন্ধ্যা ১০ট. বাড়িয়া গিয়াছে । ভবরামবাবু বাবসাস্থল হইতে
আসিয়া দৈপিলেন জানালা দরজা চারিদিক বন্ধ ! পবনদেবে
প্রপিতামহ মহেশ চেঁচা করিয়াও সে শয়ন ঘরপানিতে যে প্রবেশ
করবেন, সাগরবালা একপা একটু ছিটু গোলা রাখেন নাই !
দৈপিল্যই ভবরামের সর্বশরীর জলিয়া গেল । তিনি তাড়াতাড়ি

কোনও দরজাগুলি খুলিয়া দিলেন। কিছু বলিতে পারিলেন না। পাছে অবার কলহের উৎপত্তি হয়। আত্মাগুলির পর, শয়ন করিতে বাটর দিগলেন থোক তুটি সিঁড়ি শয্যায় নিছা ছাড়াইয়াছে। দেখিয়া ক্রোধে তাহার শরীর জলিয়া উঠিল। কোনকামিনীও কাছে বলিলেন “সাগরবালা”। তুমি “কি চেলেদটাকে মারিলে?” একটি ত বতলিন অগ্রসর হইয়াছে।”

ভবরামের পক্ষ প্রকটি অকালে মুকামের পতিত হওয়ায় ক্রোধে তাহার বড় ভয় পাছে হত্যাধন কোন কঠিন অস্ত্র হয়।

সাগরবালাও বলিয়া বলিল—“তোমার মুখে কেবল অম-
লাবের কথা ছাড়া আর কিছু নেই। যদি তোমাকে ওসব কথা
আমি জানিতে হতাম না।”

যদি দ্বিতীয় প্রেক্ষণ মতের অমিল লতায় মাঝে মাঝে ঝগড়া
হয়। কোন বার এক রাতি, কোন সময়ে চন্দ্রিশ ঘণ্টা পরায়
অসন্তোষের কথাবার্তা থাকে না। কিন্তু আমরা বিশেষ জানি—
প্রত্যেক বারের ঝগড়াতেই ভবরামবাবু গাঢ়িয়া কথা কহিয়াছেন।
সাগরবালাকে সচিহ্ন অগ্রে কথা কাটতে কোনবারেই হয় না।
তোমার হরত বলিলে দ্বিতীয় পক্ষ বলিয়া ভবরামবাবু একটু
বৈদ্য। কিন্তু আমরা জানি তিনি স্বেণ নহেন। তবে একটু
ভীতি কটেন। সাগরবাবুর সঙ্গে কলহ বা কথাবার্তা না
কহিতে পাঠালে প্রীতির মনটা কিছুই হইয়া যায় তাহা ত পূর্বেই

বলিয়াছি! একরূপ অবস্থার আগে কথাকথা কি তোমার
স্বৈর্ঘ্যের লক্ষণ বলিবে? দাম্পত্য প্রেমের মধুবন্ধ যাতাদের জন্ম
অন্তর্যব করিবার শক্তি নাই, তাহারাই হিংসা করিয়া অপরের
সৈন্য বলে! আজকালকার লোকের নাতা নিজেই নাই, তাহ
অপরের দেখিলেই হিংসা হয়। বাউক সে কথা।

ভবরামবাবুর সঙ্কীর্ণ সাগরবালার বিবাদের সূত্রপাতই ঘটে
না—যদি তিনি মস্তিষ্কে নীতল রাখিয়া দীর্ঘ স্থির ভাবে যেখানট
মতেব অনৈক্য চাইতেছে, সেখানট ভাল করিয়া বুঝাইয়া
দেন। ভবরাম বাবু একবার বলিলেন—“এটা কর’না সাগরবাল।
সাগরবাল। অভিমানবশতঃ অথবা অস্বতঃপ্রবৃত্তি সে কাজট
বিশৃঙ্খলতার সহিত করিয়া ফেলিল। ক্রোধ বা বিরক্তি—সহ
করা অপেক্ষা এ ক্ষেত্রে অক্ষাঙ্গিণীর ভাল বা অস্বতঃ প্রবৃত্তি
করিবার জন্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করা কর্তব্য—কিন্তু কেবল ভবরাম
কেন—সংসারের অনেক ভবরামই তাহা করেন না। সুতরাং
ভবরামের জ্ঞান অশাস্তি ও মাঝে মাঝে তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়।

আর একটি বিবয়েন জন্ত ভবরামের সঙ্গে সাগরবালার
মতভেদ ঘটে। ভবরাম ইচ্ছা করেন সাগরবালাকে নিজেদের বংশের
রক্তমজ্জার সহিত মিশাইয়া লইতে। ভবরামের ইচ্ছা সাগর-
বালার পিত্রালয়ের আচার-ব্যবহার, কিছুই সাগরবালাতে থাকিবে
না; কিন্তু সাগরবাল। একবারে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না—

অথবা তাহা ইচ্ছা করে না! ভবরাম ভাবে, সাগরবালার মা, স্বামী, মহোদয় কি সাগরবালার মত আমাকে বা আমার ভাইকে ভয়বাসিতে বা য়েত করিতে পারে? আমার একটু পারিলেও তাহার ত আমার ভাইকে বা ভাতৃবধূকে ততটুকুও পারিবে না। তখন সাগরবালার কান্দন সঙ্গে মঙ্গলক বাণিয়া চলিলে তখন এই সব মতগুলোর সঙ্গে সাগরবালার মত না মিশিলেও স্বামীকে প্রত্যক্ষ দেখান যথ্য বলিতে পারিত না। “দাম্পত্য কলহ শৈবের” মত ভবরামও তাহার দি বাবায়ের বিদাকে ছোর করিয়া কিছু বলিতে পারিত না। বাবায়ের মধ্যে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে ইত্যে মধ্যে দম্পতী দুগলের মধ্যে একটু একটু ক্ষুদ্র বাবধানের মত কারণের জন্য কলহের স্রষ্টা হইত। ইহা কিছু আবার ভবরাম বাবুর আগতেই দিন কতক পদে ঘাট মিলনে পরিণত হইত। কিছুদিন আব কোনকণ তর্ক বা মতভেদ দম্পতিদুগলের মধ্যে তিষ্ঠিতে পারিত না।

সাগরবালার আব একটি দোষ বা গুণ তোনরা না বলিতে হইত বল,—সাগরবালার প্রত্যেক বিষয়টি স্বামীর নিকট জানিতে চায়। সে হস্ত ভাবে, আমি অন্ধাঙ্গিনী—আমার অজানিত স্বামীর কি কার্য্য থাকিতে পারে। থাকিলেও তাহা অজ্ঞায়। সাগর-বালার প্রত্যেক বিষয়েই স্বামীকে প্রশ্ন করে। “কোথায় গিয়াছিলে?” “কেন গিয়াছিলে?” এত দেরী কেন?” প্রশ্নগ হইতে বেড়াইয়া

আসিয়া অবধি তোমার এরূপ চিন্তাচঞ্চল্য ও ভিন্ন ভাব দেখিতে কেমন ? ইত্যাদিরূপ প্রশ্ন সাগরবালার প্রায়ই আছে। ভবরাম ভাবে সাগরবালা সব কথা বুঝিতে পারে না, বা পারিবে না—মিছামিছা বলিয়া লাভ কি ! স্বামী যে অগ্রাহ্য বা অবিশ্বাস করি সব কথা সাগরবালাকে বলে না, ইহা মনে না করিলেও ভবরাম সকল কথা সকল সময় না বলার জন্য সাগরবালা মনে মনে ভাবিয়া চরিত্র হয় ।

সাগরবালা মধুপুরে আসিয়া অবধি ভবরামের এই ভাবান্তরে কারণ সম্বন্ধে জ্ঞানবান প্রশ্ন করিয়াছে—জানিবার জন্য কতবার কাকুতি মিনতি করিয়াছে—এ পর্যন্ত সাগরবালা স্বামীর নিকট তাহার সহজ সরাসরি পায় নাই । তাহার যে জানিবার কোন অধিকার নাই, ইহাও স্থির করিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেন না । জিজ্ঞাসা করিলে ভবরাম বাজে কথায় বা হাঁ—চ' করিয়া সারিয়া দেন । ভবরামের বিশ্বাস—বলিলে সাগরবালা সব কথা ধারণা করিতে পারিবে না, কিংবা কর্তব্য পথে বাধা পাইবে অতএব বৃথা বলিয়া ফল কি ?

অনেক দিন চাইতে স্বামীর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া সাগরবালা আজ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে, যে সব কথা এতদিন স্বামীর আশ্রয়ে প্রাপ্ত খুলিয়া বলেন না,—এতদিন চেষ্টা করিয়াও পারিতে পাই নাই, আজ সেই সব কথা শুনিবার জন্য লজ্জা সহ্য

করিয়া স্বামীর সঙ্গে তর্ক করিবেন । কেন আমি কি অন্ধ-
কি নহি ? আমি কি স্বামীর সকল কথা জানিবার, শুনিবার,
স্বামীর অধিকারিণী নহি ? আমি যদি বুঝিতে না পারি, গাছাতে
বুঝিতে পারি, সেরূপ ভাবে তিনি আমাকে উপদেশ প্রদান করেন না
কেন ? সে ক্ষমতা কি আমি দায়ী ! আমি ত তাঁহার আশ্রিতা,
কর্তৃকনিষ্ঠা, শিষ্যা ! তবে কেন তিনি আমাকে সব কথা প্রকাশ
করিয়া বলিবেন না । সাগরবালার অনেকদিনের সঞ্চিত অভিমান,
আজ হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়াছে ।

সাগরবালার প্রকৃতিটা একটু বিভিন্ন রকমের । এইজন্যই
অজ্ঞ পর্য্যন্ত ভবরাম বাবু সাগরবালাকে ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে
সকেন নাই । সাগরবালার অপর কোন স্ত্রীলোকের সহিত মেলা-
পেলা করিতে ভালবাসে না । স্বামী এজন্য বিরক্তি প্রকাশ
করিলে সাগরবালার প্রশান্ত চক্ষু দুটী জলভারাক্রান্ত হয় । বলে
আমার আলাপ করিতে ভাল না লাগিলে আমি কি করিব ;
তাহা ভাল না লাগে, তাহা কি জোর করিয়াও আমাকে করিতে
হবে ?”

ভবরাম বাবু বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলেন—“লোকে ইহাতে তোমাকে
অহঙ্কারী বলিবে, না হয় সভ্যতা বা সামাজিকতা দুইটার একটাও
জান না, এই প্রকার অসুস্থমান করিবে ।” সাগরবালার মাটির দিকে
লম্বল নেত্রদুটি স্থাপিত করিয়া বলে—“বিনা দোষে নিন্দা

করিলে আর আমি ক্ষম হইয়া মাঠেব না।” আমরা কিন্তু ভাবি
মাগরবালার সঙ্গে সকলের প্রকৃতি মিলে না বলিয়াই কাহান
সহিত সে মিশিতে পারে না। “মুখে এক পেটে আর” তা
মাগরবালার আদৌ পছন্দ করে না।

• আজকালকার মেয়েদের মত মাগরবালার নরবেলি চং জা
না। স্বামীস্বামী অনন্ত প্রেম, অকস্মৎ ভালবাসা কেবল যে তাহ
অন্যথানে ভরিয়া আছে, তাহা নহে মাগরবালার অন্যথ
দম্যভাবে পূর্ণ। তাঁহার ঈশ্বরোত্তম হইতে পাঠক হয় ত কতকটা উ
অন্যতম করিতে পারিঙ্গাচন; কিন্তু কথায়, ইঙ্গিতে বা কার্য
ভবরামকে ইহা জানিবার দিতে সে লজ্জাবোধ করিত। স্ব
করণ্যে বাস্তব, ৩টা বাড়িয়া গিয়াছে, তবু তিনি আহা করিব
সময় পান নাই। মাগরবালার শুষ্ক মুখে বসিয়া আছে, একটু
পর্যন্ত উদরস্থ হয় নাই। স্বামী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“তো
মুখ শুখাইয়া গিয়াছে, তুমি কি এখনও জল পান্যস্থ থাও না
মাগরবালার?”

মাগরবালার লজ্জায় আনন্দ-আনন্দ করিয়া বলিল,—“অ
আমার শরীরটা ভাল নাই।” ভবরাম বাবু কখন মাগরবাল
মনের ভাবটা বুঝিয়া লইতেন, কখন বুঝিয়া উঠা তাঁহার পক্ষে ক
হইত! মাগরবালার প্রকৃতিটা ভবরামের নিকট প্রকৃতই জট
এবং দুর্বোধ্য ছিল।

মাগরবালা সম্মাসিনী কি ভবরাম বাবুর গৃহিণী, হহা তিনি
 বৃন্দময় বুদ্ধি উঠিতে পারেন না। আজকালকার মেয়ে
 এই অর্থ সংকয়ের দিকে স্পষ্ট খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।
 ভবরাম বাবুর কতকটা ইচ্ছাও তাই যে মাগরবালা কিছু সংকয়
 দিতে আরম্ভ করুক। সুন্দরকে ত আর বিশ্বাস নাই।
 মাগরবালা কিছু সে বিষয়ে একবারে মজ্জিত। টাকা ও নোটগুলি
 মাগরবালা তাহার লোহার সিন্দুকে রাখিতে সেরূপ বাস্তবতার
 আকর্ষণে স্বামী ও দেবরকে সেরূপ বাহির করিয়া দিতেও
 পারেন। মাগরবালার প্রকৃতিটা উদ্ভট একনের ন্যায়
 যে সে কি করিয়া পাড়ার পাচজন মেয়ের সঙ্গে তেজা মেলা করে
 নাই। তাহার প্রকৃতির সঙ্গে যে কাহারও প্রকৃতি মিলে না।
 মাগরবালা তাহার লোহার সিন্দুকের চাবিটা স্বামী কিংবা দেবরকে
 দিতে কখনই প্রস্তুত নয়। অনেক মাদা মাদনাতেও তাহা পাওয়া
 যায়। তাহাতে ভবরাম বাবু নাকে নাকে মনে করেন, তবে ভয়ত
 মাগরবালা কিছু সংকয় করতে পারিয়াছে। তাহাতে ভবরাম বাবুর
 মাঝে মাঝে খুব আনন্দ না হইতেছে, তাহা নহে ; কিন্তু এবারে
 মের সে দুই দূর হইয়া গিয়াছে। সেদিন মাগরবালার
 করুণাময়বাবু তাহার বৌদিদিকে একখানি চিঠি লিখিয়াছে—
 বৌদিদি! আপনার লোহার সিন্দুকের চাবিটা পাঠাইবেন।
 আমার ছড়োয়া সীতাহারটি একটি খাঁদারকে দিব। কিছু

বেশী টাকা লাভ পাওয়া যাইবে। আপনাকে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মূল্যবান হার পরে গড়াইয়া দিব” ইত্যাদি।

সাগরবালা চিঠি পড়িয়া সেইদিনের ডাকেই লোহার সিন্দূকের চাবিটি পার্শেল করিয়া পাঠাইয়া দিল। ভবরাম বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“এইবার জানা যাইবে তুমি কত হাজার জমাইয়াছ?”

সাগরবালা সহজভাষে উত্তর করিল—“দরকার হয়, বাহা আছে ঠাকুরপো লইয়া খরচ করিবে। উহা তোমাদের কারবারের টাকা। আমি আর লইয়া কি করিব?”

হরি! হরি! ভবিষ্যতের জ্ঞান সঞ্চয় হইতেছে বলিয়া ভবরাম বাবু যে আশা এতদিন হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, তাহা সাগরবালা এক ফুৎকারেই উড়াইয়া দিল। ইহাতে ভবরাম বাবু কি করিয়া সাগরবালার প্রকৃতিটা বুঝিয়া উঠিবেন, তোমরা বল দেখি?

এদিকে কিন্তু সাগরবালা স্বামীর যথার্থই সহধর্মিণী। বঙ্গ-বাংল্যভায়, অতিথি অভ্যাগতের সেবায়, আশ্রিত ও দাস দাসীর প্রতি বহু প্রকাশে, তাহাদের সুখ দুঃখ নিজের সুখ দুঃখের মত দেখিতে আতুর দীন দরিদ্রের সেবায় স্বামী অপেক্ষাও সাগরবালা অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। এসব বিষয়ে সাগরবালা সত্য সত্যই মুক্তহস্ত। ঘেঁষা কল্পণাময়কে সাগরবালা পুত্রাপেক্ষাও অধিক মেহ করেন।

মাউক সে কথা—ভবরাম বাবু মধুপুরে আসিয়া অবধি কেমন কেন উন্নয়ন হইয়া গিয়াছেন । আজ কিম্ব সাগরবালা স্বামীর নিকট ফুল কথা শুনিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে ।

সাগরবালা লজ্জা, সরম, সংকোচ ত্যাগ করিয়া, ভবরাম বাবুকে আবার ঠাঠার লুকান কাহিনী বলিল । ভবরাম বাবু প্রত্যুষেই সাগরবালাকে ত্যাগ করিয়া গাইবেন ; শ্রুতরাং দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিলেন, “কোথা থেকে বলিব বল ?”

স্বামীর সম্মতিতে সাগরবালা পুলকিত হৃদয়ে বলিল—“সেই যেদিন পশ্চিমে যাও, সেইদিন হইতে আরম্ভ কর ।”

ভবরামবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং সাগরবালা খোঁকাঁকে ক্রমাগত লইয়া স্বামীর পাশ্বে আসিয়া বসিল ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

আমি সেই—সন্ধ্যার ২৬শে অক্টোবর রাতে তোমার নিকট হইতে বিদায় হইয়া বোম্বে মেলের আরোহণ করিলাম । সন্ধ্যার ত্রিভুজ নিদ্রায় অতিবাহিত হইয়া গেল । যখন আমার নিদ্রা ভাঙ্গিল তখন ভোর ৫টা । জানালা হইতে দেখিলাম—দুই পাশে শিশির-সিক্ত ধাতুক্ষেত্রগুলিতে কে যেন হীরকের মালা পরাইয়া দিয়াছে । নামের মাঝে অপরিচিত পক্ষীগুলি এক একবার ডাক দিয়া এদিক ওদিকে উড়িয়া বাইতেছে—তখনও সকল পক্ষী কুলার পরিত্যাগ করে নাই । হেমন্তের আবির্ভাবে প্রকৃতি যেন জড়তার আবরণে অঙ্গ ঢাকিয়াছেন । কি সুন্দর প্রভাত ! নিদ্রাভঙ্গেই আমি যেন নূতন দেশে—নূতন মামুল হইয়া পড়িলাম । প্রকৃতির নানাবিধ শোভা অতিক্রম করিয়া, বাষ্পীয় শকট মুজাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল ।

বিখ্যাতচলের বিন্দুবাসিনী দেবীকে দর্শন করিবার অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল, আমরা মেল হইতে অবতরণ করিলাম । দেবী দর্শনে যাইব কি ! এই প্রকার চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে শত শত দীর্ঘাকার বিশালবপু মুজাপুরি পাণ্ডাদের বড় বড় বংশদণ্ড



ভবরাম সাগরবালাকে ভ্রমণ কাহিনী শুনাইতেছেন । সাগরবালা
সানন্দচিত্তে স্বামীর মথের দিকে চাহিয়া আছেন । সাগর-

দেখিয়াই আমার অন্তরাগ্না শুকাইয়া গেল। ভারতভূমির
প্রত্যেক পবিত্র তীর্থগুলি এই প্রকার চরাচর অত্যাচারী
পাণ্ডাদের জন্ত ভয়াবহ স্থান হইয়া উঠিয়াছে। তীর্থক্ষেত্রের
পবিত্রতা ও গান্ধীর্ষ্য সত্য সত্যই নষ্ট হইতে বসিয়াছে। যখন সেই
সব পাণ্ডার দল বিপক্ষীয় শত্রুকে আক্রমণের ছায় আবাদিগকে
বাহের মত করিয়া বেঠেন করিল, তখন ভাবিলান এ ব্যাধ ভেদ করা
ও সহজ নহে। বাহা কিছু সঙ্গে আছে, ইহার কাড়িয়া লইবে।
এখন কাড়িয়া লইয়াও ছাড়িয়া দিলে বাচি। সেই ব্যাধ হইলে
খোলাগুলি চোঁড়ার মত আনাদের উপর প্রশ্নের উপর প্রশ্ন
বিস্তৃত হইতে লাগিল। কোথায় আনরা থাকি,—কোথায় হইতে
আসিতেছি, আমাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের নাম কি,
কতদিন থাকিব ইত্যাদি প্রশ্নবাহে আমরা জর্জরিত হইয়া পড়িলাম।
বন্ধুকে চুপি চুপি বলিলাম—আর কাজ নাই ভাই বিন্দুবাসিনী
শনে—এক্ষণে “যঃ পলার্যতি স জীবতি।” বন্ধু বলিলেন—“অয় কি
আমরা ত স্থালোক নই।” বন্ধুর কথায় আমার একটু ভরসা হইল।
“তাইত আনরা পুরুষ! আনাদের মত কাপুরুষের জগতই বাঙ্গা-
লার বদনাম হয়। বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে “ভীকু” অপবাদটা
চাইবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম।

বন্ধুর সহায়তায় আমি বঙ্গের ভিত্তি করিয়া বিপুলাকার পাণ্ডা
স্তীর আক্রমণ করিতে লাগিলাম। সেই লোভ-বাধান-ঘটিতানি

এক হাতে উঠাইতে পারে, একপ বাঙ্গালী বুঝি অন্নই আছে। বাহা হউক বাঙ্গালীর ইতিহাস হইতে “ভীকু” অপবাদ ঘুচাইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি ; সুতরাং সেই হট্টগোলের মাঝে দেহের সমস্ত শক্তি ও সাহস একত্র করিয়া আমি নিভাঁজ হিন্দিভাষায় বলিলাম—“তোমরা ডেরামেই হাম্ উঠেগা।”

পাণ্ডা অতিকষ্টে আমার মুখের ভাবগতিক দেখিয়া হিন্দিভাষাটা বুঝিয়া লইল। সেই ব্যূহ ভঙ্গ করিয়া দিয়া আমাদের দিকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল। এই সাহস প্রকাশের জন্য আমি নিজে নিজেই আনন্দে ফুলিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম—আমাদের জাতিটা কি ভীকু! আমাদের দিকে শীকার পাইয়া পাণ্ডা মহারাজ বুক ফুলাইয়া, আনন্দে এক একবার আমাদের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তীর্থক্ষেত্রের পাণ্ডাদের অত্যাচারকাহিনী বলিতে গেলে, একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে। তীর্থক্ষেত্রের কলঙ্ক মোচন ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য পাণ্ডাদের অত্যাচার দমন একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। পাণ্ডার নাম হীরলাল ঠাকুর। দীর্ঘাকার মূর্তি বাহ্য আভ্যন্তরীণ, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা। বক্ষে কপোলে শ্রবচন্দন লেপিত। দেখিলে প্রাণে ভয়ের উদ্রেক হয়। বাঙ্গালী বুঝি তাহার একটি চপটাঘাতের ভারও সহ করিতে পারে না। মৃজাপুরের গুণ্ডার অনেক গল্প শুনিয়াছি,—পুস্তকে ও সংবাদ পত্রে মৃজাপুরের গুণ্ডাদের অত্যাচারের কথা অনেকবার পড়িয়াছি,

সেইগুলি বার বার মনে উদয় হইতে লাগিল । যাহা হউক তিরাতাল পাণ্ডা আমাদের উপর কোন অত্যাচার করিল না—অধিকন্তু যাহা কিছু দক্ষিণা দিলাম, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট হইল ।

পর্বতের নিম্নে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী কলকলশব্দে বহিয়া যাইতেছে । উপরে বিন্দুবাসিনীর মন্দির । আমরা মাকে দর্শন করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম । বহুদিনের সাধ, বিদ্যাচল পর্বতে বিন্দুবাসিনী দর্শন করিব । আজ সে সাধ পূর্ণ হইল । মনে বড়ই আনন্দ হইল । আমি ভাবিতে লাগিলাম হায় ! হিন্দুর তীর্থভূমি ! কত যুগযুগান্তরের স্মৃতি তোমরা বুকে করিয়া রহিয়াছ । হিন্দু ! যদি প্রাণকে পবিত্র ও মহান্ করিতে যাও—তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া আইস ! কত সাধু কত মহাত্মাদের পদরেণু স্পর্শ করিতে পাইবে । শরীর পবিত্র ও জীবন ধন্য হইবে ।

বিদ্যাচল পর্বতে বিন্দুবাসিনীকে দর্শন করিয়া, অপরাহ্নে আমরা “বিরোহীতে” আসিলাম । এই বিরোহীর “ঝামেরিয়ার” কপাই সে দিন তোমাকে বলিতেছিলাম ।”

মাগরবালা একাগ্রচিত্তে স্থানীর “ভ্রমণ-কাহিনী” শুনিতেছিল । মাগরবালা প্রকৃতই আশ্চর্য্য । ‘এমন’ করিয়া ত ভবরাম কোন দিন সব কথা বলেন নাই !

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

“রাত্রে আমরা বিরোধীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । আমরা প্রয়াগে গঙ্গা বমুনা সঙ্গম দেখিয়াছি, নথুরা বৃন্দাবন ঘুরিয়াছি, আগ্রা গিয়াছি । আগ্রায় তাজমহল ইত্যাদি কত কি দেখিয়াছি ; কিন্তু “বিরোধী” আনাদের এতই ভাল লাগিয়াছিল যে, “বিরোধীর” বিরহ এখন হৃদয়ে আঘাত করিতেছে ।”

ভবরাম একটু থামিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন ।

“রাত্রে আমরা বিরোধীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । এরূপ গম্ভীর নিৰ্জন স্থান জীবনে আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না । রজনীর কেবল একটা সাঁ সাঁ শব্দ বাতীত আর কোন শব্দই শ্রুত হইল না । রজনীতে অজানিত পথে অজানিত দেশে গিয়া, প্রথমেই রজনী দেবীর এই একটা বিশেষত্ব দেখিলাম । বিরোধী একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশন । এখানে রেল কিংবা সকল গাড়ি ধরে না । সেই মিস্তক দেশের রজনীর আনন্দপূর্ণ সাঁ সাঁ শব্দ রেল গাড়ীর বিকট ভোঁষ-ভোঁষ পৌঁ-পৌঁ শব্দের মধ্যে এক এক বার যেন ডুবিয়া মাইতে লাগিল । ভাবিলাম প্রকৃতির এই বিরূপ

নিম্নরূপে এত দূর দেশে—নিভৃতপল্লীর মাঝেও রেল কোম্পানি বাধা দিতেছে । ধস্তা ইহাদের পুরুষকার ।

বিরোধীতে বন্ধুবরের ভ্রাতা দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া আত্মারদির পর শয্যাগ্রহণ করিলাম । বিরোধীর স্নিগ্ধ রজনীর সৌন্দর্য শব্দ শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ আমার নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলান ।

প্রভাতে উঠিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলাম । কি মনোরম স্থান ! বাঙ্গালী বায়ু পরিবর্তনের জন্য পশ্চিমের দিকে ছুটিতেছে, ভ্রমণের জন্য নানান স্থানে ঘাইতেছে ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তাহার স্তম্ভর “বিরোধী”কে দেখিয়া দেখে না । বাঙ্গালীর কি অকৃতজ্ঞতা ! তাহার বিরোধীর বুকের উপর দিয়া বায়ু, তব্রাচ ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া, তাহার একবার “বিরোধী” দেখে না । একরূপ সান্ত্বকর—একরূপ প্রকৃতির লীলাভূমি, একরূপ শাস্ত মনোমুগ্ধকর পার্বত্য পল্লী পশ্চিমের আর কোথাও আছে কি ? বিরোধীতে কত দেবদেবী মূর্তি, কত পূর্বকল্পিত, কত সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম ! দেখিলে প্রাণ মুগ্ধ হয়—হৃদয় বিমোহিত হয় । বিরোধী দেখিবার স্থান ! সাধু সন্ন্যাসী, ঘোড়া তোমরা বাইয়া দেখ, এমন পবিত্র, নির্জন তপস্কার স্থান আর বুঝি কোথাও নাই ! ভ্রমণকারী বাঙ্গালী ! তুমি একবার বাইয়া দেখ, কত নূতন জিনিষ তুমি দেখিতে পাইবে । কত সন্ন্যাসীর আশ্রম, কত দেব দেবী, কত

পূর্বের স্মৃতি, কত পৌরাণিক ব্যাপার, কত মহীকুহ, বৃক্ষ, লতা বাহ্য
কখন চক্ষেও দেখনা, এই প্রকার কত নূতন জিনিষ তোমার দৃষ্টিপথে
পতিত হইবে। রোগ জীর্ণবাক্সালী তুমিও একবার যাইয়া দেখ,—দিন
কয়েক “ভৈরব কুণ্ডের” স্বচ্ছ, পবিত্র, স্বাস্থ্যকর জল অঞ্জলি
গুরিয়া পান কর, রোগাতুর দেহ সবল হইয়া উঠিবে। দৃষ্টি
করিয়া বলিতে পারি—পশ্চিমে “বিরোহী” মত স্বাস্থ্যকর মনোরম
স্থান অতি অল্পই আছে! যাহারা সুখী ও বিলাসী বাবু, তাঁহাদের
এস্থান অবশ্য ভাল লাগিবে না। কারণ এখানে দোকান পশার
বাজার নাই, মধুপুর প্রভৃতি স্থানের জায় খাচ্ছদ্রব্য সহজে মিলে না
এবং বিদ্যাচল ও মুজাপুর হইতে জিনিষপত্র লইয়া যাইতে হয়
এখানে আছে উপাদেয় স্বাস্থ্যকর অগণ্য কূপ ও “ভৈরব কুণ্ডের”
জল—যে জল সহজে কোথাও মিলে না। আছে স্বাস্থ্যকর পবিত্র
বায়ুর স্বন স্বন শব্দ। আছে দেবদেবীর আশ্রম—পৰ্ব্বতোপরি
প্রাণারাম পবিত্র স্থান। আর মিলাইবার মত যদি শক্তি থাকে-
তবে মিলিবে মহাপুরুষ সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন! তাই বলিতে কষ্ট
হয়, যাহারা পশ্চিমে যায়,—যাহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া অজ্ঞাত
অর্থ ব্যয় করে—তাহারা এমন “বিরোহীকে” ত্যাগ করিয়া যার
কেন? এমন পুণ্য পবিত্র স্থান তাহারা একবার চক্ষেও দেখে না!
বাক্সালীর সত্য সত্যই দুর্ভাগ্য। “বিরোহীতে” আমাদের চুই রজনী
ও একটি দিন থাকিবার সুবিধা ঘটয়াছিল; কিন্তু এই অল্প সময়ের

যে স্মৃতি আমরা বৃকে ধারণ করিয়া আছি, তাহা বৃক্ষ জীবনে বিস্তৃত হইতে পারিব না।

“বিরোধী” সুন্দর প্রশস্ত পথে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কোথায় যাইব স্থির নাই, বন্ধুকেও কোন কথা বলি নাই। কেবল প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছি। হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে! মনে হইতেছে, যদি আমাদের উড়বার শক্তি থাকিত, তবে ঐ পর্বত হইতে পর্বতান্তরে ছুটিয়া গাইতাম। মুখে কথা নাই। আমাদের মনোভাব তখন বাক্যের অতীত!

কিয়দূরে গিয়া দেখিলাম কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ধরের স্ত্রীলোক তাঁহাদের অভিভাবকদের সহিত পর্বতে উঠিতেছেন। বন্ধু বলিলেন—“চল ঐ পথে যাই।” আমরা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমাদের পথ, ঘাট, দেশ, পাহাড়, জঙ্গল সমস্তই অজানা! কোথায় কি আছে, তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি নাই; সুতরাং বন্ধুর কথাতেই অগ্রসর হইলাম। ভদ্র-লোকগুলিও স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া বিদ্যাচল হইতে বিরোধী বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

পর্বতে উঠিয়া কিয়দূর গমন করিবার পরেই আমরা অষ্টভুজা যোগমায়া দেবীর দর্শন পাইলাম। পুরাণে লিখিত আছে যে, এই পর্বতে শঙ্কু ও নিগুস্তের সহিত ভগবতী বৃদ্ধ করিয়াছিলেন।

পাহাড়ের উপর প্রায় দুই ক্রোশ বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র পর্বতবাসী একটি সাধুরা নিকট গুনিলাম, ইহাই বুদ্ধন্তল পাহাড়ের উপর এতটা সমতল ভূমি কিরূপে হইল, চিত্র করিলে কত কথাই বলা যায়! কত যুগ-যুগান্তরের স্থিতি মনোমধ্যে উদ্ভিত হইয়া যেন একটা তুফান বহিরা চলিয়া যায়।

আমরা পাহাড়ের উপর দিয়া অতি সঙ্কীর্ণ পথে আবার বহুদূর অগ্রসর হইয়া আসিলাম। প্রকৃতই তখন আনন্দে জ্ঞানহার্য আবার—আবার হাঁটিয়া চলিলাম। কতদূর আসিলাম মনে নাই। আবার বহুদূর হাঁটিয়া চলিলাম। পাহাড়ের উপর অদূরে এবার একটি মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দির লক্ষ্য করিয়া সেহ দিকে চলিতে লাগিলাম। আরও কিয়দূর হাঁটিয়া আসিবার পর মহাকালীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পর্বতোপরি কি মহান্ পবিত্র এই স্থান! প্রকৃতই ইহা দেবতার আশ্রয় এক্ষণে নির্জন, পবিত্র স্থান জীবনে আর কখনও দেখি নাই। পাহাড়ের হ্রদও এখানে আসিলে ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া যায়। ভাষায় সে আনন্দ ব্যক্ত করিবার নয়। প্রাণ এক মহান্ ভাবে অধীর হইয়া বিশ্বপতির চরণে এই পাপতাপ পূর্ণ ক্ষয় লুটাইয়া পড়িল। গুনিয়াছিলাম স্থান মাহাত্ম্যের একটা বিশেষত্ব আছে। আজ সত্য সত্যই তাহার প্রমাণ পাইলাম। আমার ইচ্ছা ছিল না যে, সে স্থান হইতে আবার এই পাপতাপপূর্ণ সংসারে ফিরিয়া

মাই ; কিন্তু কন্ঠের বন্ধন ঘুচাইতে পারে, এমন সাধ্য কাহার ?
 হায় ! বিরোধীতে যে এত আনন্দ আছে, তাহা কে জামিত ? এই
 বিদ্যাচল পর্বতে দেবীর পদরেণু পড়িয়া আছে—কত মহাতপা
 যোগী সন্ন্যাসীর পদরেণু এই ধূলার সহিত মিশিয়া আছে, এখনও
 মিশিতেছে ;—যে সমস্ত মহাপুরুষকে শত জন্ম তপস্থা করিলেও
 আমরা সংসারতপ্ত জীব দেখিতে পাই না—আমাদের দৃষ্টির
 অন্তরালে এই পর্বতোপরি তাঁহারা নিত্য বিরাজ করিতেছেন ।
 একপা পবিত্র মহান স্থানে এস সংসারতাপদগ্ধ জীব—একবার
 আসিরা প্রাণ জুড়াইয়া যাও । এমন নির্জন, নিস্তব্ধ, পবিত্র,
 স্থান,—যে স্থানে কত যুগান্তরের কীর্তি—কত মহাপুরুষের
 স্মৃতি বিজড়িত,—না জগৎ জননীর লীলানিকেতন, এমন স্থান
 আর কোথাও আছে কি ?

দেখিলাম পর্বতোপরি মহাকালী মন্দিরের শতাধিক হস্ত দূরে
 একটি বিদ্যবৃক্ষ । কত শত বর্ষা, শীত, গ্রীষ্ম এই বৃক্ষ
 যে মাথায় করিয়া ধরিয়াছে, তাহা কে বলিবে ? শত শত বর্ষের
 স্মৃতি যেন এই মহাবৃক্ষের অস্থিপঞ্জরে জড়িত রহিয়াছে । কত
 যোগী,—কত মহাপুরুষ যে এই পবিত্র বৃক্ষমূলে বসিয়া সিদ্ধ
 হইয়াছেন তাহা কে বলিবে ? এই বিদ্যবৃক্ষতলে যে কত সিদ্ধ মহা-
 পুরুষের পদরেণু পড়িয়া আছে, তাহা কে বুঝিবে ? সেই বিদ্যবৃক্ষের
 পত্ররাজী যেন স্বন স্বন শব্দে বলিতেছে—আইস সংসার তাপদগ্ধ

জীব, আমার মূলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ কর। আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে; যে ক্ষুধায় তোমরা জর্জরিত,—যে ক্ষুধায় তোমাদের হৃৎকের বিরাম নাই, সে ক্ষুধা আর থাকিবে না। সংসার কীট আমরা—সেই বিশ্ববৃক্ষের ছায়ায় যাইয়া রুদয় যেন হি এক অনির্বচনীয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। আমরা কোন্ অজানা রাজ্যে কাহার প্রেরণায় যে আসিয়া পড়িলাম, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহার কি গীমাংসা করিব?

সেই বিশ্ববৃক্ষতলে দেখিলাম ধ্যানমগ্ন জটাজুটধারী, সর্বদা ভস্ম-বিলেপিত, এক সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন; তাঁহার বাহু আঁতাত্ত-লম্বিত—দেহ তপ্তকাঞ্চনের ছায়া,—প্রশস্ত ললাট, প্রশস্ত মুখ-মণ্ডল; —অঙ্গের পবিত্র জ্যোতি যেন সেই পর্বতোপরি বিকীর্ণ হইতেছে! সন্ন্যাসী মৃত না জীবিত? হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন জীবনের চিহ্নমাত্র সে দেখে নাই! নিশ্চল স্থানুবৎ মহাপুরুষ ধ্যাননিমগ্ন রহিয়াছেন। চক্ষুর পলক নাই, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের চিহ্নমাত্র নাই—পাশাণবৃষ্টির ছাত্র ষোগাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তাহালাই আমরা আমাদের সুপ্রভাত! একরূপ মহাপুরুষ দর্শন জীবনের আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু। ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মহাপুরুষকে প্রণাম করিলাম।

বহুক্ষণ মনে মনে মহাত্মাকে আরাধনা করিলাম। একদিনের যদি চক্ষুকল্লীলন করেন, তবে তাঁহার কথা শুনিয়া প্রাণের ব্যথা

জুড়াইব । বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেল—প্রাণের সাধ পূর্ণ হইল না ।
ভাবিলাম হয় ত এ অদৃষ্টে সে আশা পূর্ণ হইবে না ।

হৃদয়কে দূঢ় করিলাম । ভাবিলাম এমন পবিত্র স্থানে এই
মহাপুরুষের নিকটে ষতক্ষণ আছি, দেহে পাপবিন্দু স্পর্শ করিতে পারে
না । আমার প্রাণের বেদনা—অন্তর্যামী মহাপুরুষ ইনি কি বুঝিবেন
না ? আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যোগীবরকে আবার একমনে ধ্যান
করিতে আরম্ভ করিলাম । বিমল আনন্দে হৃদয় ভরিয়া গেল ! অজ্ঞ
কোন চিন্তাই আমার হৃদয়ে স্থান পাইল না ।

দয়ীর আধার, অন্তর্যামী, বাহ্যজ্ঞানহীন, যোগরত মহাপুরুষ আস
স্থির থাকিতে পারিলেন না ! চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আমার দিকে
চাহিলেন । সে সম্মোহন-দৃষ্টিতে যেন অরণ্যের হিংস্র জন্তুও পদানত
হইয়া পড়ে । তাঁহার চরণ-সঙ্গীপে নশ্তক অবনত করিলাম । তিনি
মৃদু হাসিয়া আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন । তখনকার আনন্দ
আমি তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব সাগরবালা ?

সাগরবালার তখন নয়নাশ্রিতে বক্ষঃস্থল প্রাপ্ত হইতেছে ।
স্বামীীর বচন-সুধা পান করিতে করিতে সাগরবালা তখন বাহ্য
জ্ঞান হারাইয়াছে । জীবনের মধ্যে এমন একদিনও ত সাগর-
বালার অদৃষ্টে আসে নাই ।

ভবরাম বলিতে লাগিলেন,—মহাপুরুষ আবার ধ্যানে মগ্ন
হইলেন । আমি চক্ষু মুদ্রিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে বলিলাম

“আমার জীবনে শুভমহর্ষিই যদি আসিল দেব, তবে কি পাপে তাহা নিষ্ফল হইয়া গেল।” বালকের আশ্রয় মস্তক লুপ্তিত করিয়া আমি রোদন করিতে লাগিলাম। এইভাবে কতকক্ষণ অতীত হইয়া গেল মনে নাই!

আবার সেই শুভমহর্ষির উদয় হইল। মহাপুরুষ চক্ষু চাছিলেন। প্রশান্ত, তেজঃব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাছিল। রহিলেন। সে দৃষ্টির দিকে আমি চাহিতে পারিলাম না। সভয়ে আমি মস্তক অবনত করিলাম।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে বলিলেন—“তোমার প্রপ্নের মীমাংসা এখন হইবার নয়। বাবা! কর্ম হইতেই কর্মের উৎপত্তি,—আবার কর্মেরই কর্মের বিনাশ হয়! কর্তব্যবোধে কর্ম করিয়া যাও। কর্মের ফলাকাজ্ঞা করিও না। কর্মের কর্তা যে তুমি,—ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কর্মে এ অহঙ্কার কখনও হৃদয়ে স্থান দিও না। সংসারে ধূলা কাদা অনেক মাখিতেছে—সময় হইলেই সমস্ত ক্লেদ শরীর হইতে দূর হইবে।”

সন্ন্যাসী কি সত্যসত্যই অন্তর্যামী? আমি ত প্রাণের কথা তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া বলি নাই। তবে কি করিয়া আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল-নিহিত প্রশ্ন তিনি বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলাম, হিন্দু যোগবল জগতে অদ্বিতীয়। এরূপ শক্তি, এরূপ তেজ জগতে আর কিছুই নাই। বুঝিলাম, কেন আমাদের দেশ সমস্ত ভাগ করিয়াও

এত বড় হইয়াছিল। জানিলাম, রাজমুকুট কেন তাঁহারা অকিঞ্চিৎকর ধূলিমুষ্টির স্থায় দেখিতেন। হায়! হিন্দুর একুপ কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া আমরা কাচের জন্ত ছুটাছুটি করিতেছি। যে জিনিষ উপলব্ধি করিতে পারিলে অগণিত রাজৈশ্বর্য্য তুচ্ছ বোধ হয়, সে জিনিষকে ভগ্নস্বরূপে প্রোথিত করিয়া, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, পার্থিব সামগ্রীর জন্ত লালায়িত হইতেছি। আমরা ‘সুখ সুখ’ করিয়া সুখের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছি—বিমল-সুখ কি এখানে মিলে? আমরা অশান্তি, দুঃখ বলিয়া চীৎকার করিতেছি—অশান্তি, দুঃখ কি পার্থিব বস্তুলাভে দূর হইবে! তাহা যে হইবার নয়। প্রাণের সহিত প্রাণের যোগ না হইলে যেমন প্রেম হয় না—প্রাণের সহিত অনাদি বস্তুর যোগ না ঘটিলে সেইরূপ অশান্তি ও দুঃখের নাশ হয় না। বৃথা চীৎকারে, বৃথা চেষ্টায়, আমাদের দুঃখ, দৈন্ত, অভাব, অশান্তি ঘুচিবে না। ভারত যদি আবার সেই অতীতের ভারত হয়, আমাদের পদতলে অগণিত রাজৈশ্বর্য্য নৃত্তিত হইবে—ভারতে আবার সুখ-শান্তির উৎস ছুটিবে। নচেৎ সহস্র চেষ্টাতেও ভারতবাসী প্রকৃত সুখৈশ্বর্য্য অর্জন করিতে পারিবে না। কত দেশ সুখসমৃদ্ধির জন্ত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত রহিয়াছে—তাহাতে কি তাহারা কখন প্রকৃত সুখ-শান্তির মুখ দেখিতে পাইতেছে? রাজ মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া, কেহ কি কখন দুঃখ, অশান্তি দূর করিতে পারিয়াছে? কিন্তু ভারত এক

দিন সত্য সত্যই সুখ-শান্তির মুখ দর্শন করিয়াছিল—যাহা এখনও জগতের আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু হইয়া রহিয়াছে।

মহাপুরুষ আর চক্ষুঃস্বীয় করিলেন না। সেই বিধবৃক্ষতল ছাড়িয়া, তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমার আর বিদ্যাচল পর্বত হইতে অবতরণ করিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু কষ্টের বন্ধন,—নায়াশুল ছিল করিতে পারি, আমার সে পুণ্যশক্তি কোথায়?

মনের আবেগে, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আমরা পর্বতোপরি সেই মনোরম স্থানে গিয়াছিলাম। আসিবার সময় কত কি হারা-ইয়া আবার কত অমূল্য নিধি লাভ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলাম। অবসাদে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পর্বতে পর্বতে আসিবার পর আমাদের জ্ঞান হইল যে বিরোধীর বাসা হইতে আমরা বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কেহ বলিল—দশ ক্রোশ। কেহ বলিল আরও অনেক বেশী। আমার সঙ্গী গীরালাল বলিল—“পর্বতের উপরেই আমরা দশ ক্রোশ আসিয়াছি। পর্বতের নিম্নদেশ হইতে বিরোধীর বাসা কত ক্রোশ কে জানে?”

ভবরামবাবু আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—আমরা অবসন্ন হৃদয়ে কত ক্রোশ হাঁটিয়া আসিয়া পর্বত হইতে অবতরণ করিবার বলিতে পারি না। যখন বিরোধীর বাসায় আসিলাম, তখন সন্ধ্যার অধিক বিলম্ব নাই। পরিশ্রান্ত-হৃদয়ে আমরা বহু সমীপে উপস্থিত হইলাম।

সমস্ত দিন পৰ্ব্বত-ভ্রমণে আমরাগিকে চিনিবার উপায় ছিল না । আনন্দে আমরা ক্ষুৎপিপাসাও বিস্মৃত হইয়াছিলাম ।

বিরোহীর বাসার সকলে আমাদের জীবনের আশা একরূপ ত্যাগ করিয়াছিলেন । সমস্ত দিন অনুসন্ধান করিয়া যখন আমাদের সংবাদ কেহ পাইলেন না, তখন ভাবিলেন পৰ্ব্বতে ব্যাঘ্র ভল্লকের উদরগত্বরে আমাদের জীবনলীলা সমাপ্ত হইয়াছে । একপ তঃসাহসিক কার্যের জন্ত আমরা তাহাদের নিকট যথেষ্ট তিরস্কৃত হইলাম ।

বিরোহীর বাসায় একটি পরিচারিকা—পঞ্চদশ বর্ষীয়া “কামে-রিয়া” চল চল নেত্রে হর্ষ-বিমাদে পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—“সেদিন বাবু ! ঐ পাহাড়ে তিনটা মানুষকে বাথে পরিয়াছে । কেন তোমরা এমন কাজ করলে ।” আত্ম সে স্বরে কি ব্যাকুলতা ! যেন সে আমাদের কত আপনার ! মুখখানি চর্ভাবনায় পূর্ণ । যদিও আমরাগিকে দেখিয়া তাহার হর্ষ হইয়াছে, তবু এখনও সে মুখমণ্ডল হঠতে আশঙ্কা, ব্যাকুলতা অন্তর্জত হয় নাই । শুনিলাম সে আমাদের জন্ত সমস্ত দিন চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়াছে,—এখন পর্য্যন্ত কিছু খায় নাই ! ভাবিলাম এই বিরোহীর জঙ্গলে,—ক্ষুদ্র বহু পল্লীর মধ্যে,—অসভ্য জাতির গৃহে লালিত পালিত কে এই মমতাময়ী কারুণ্যরূপিনী বালিকা ! অনাহার করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলাম—অন্ত চিন্তা আর সময়ে

স্থান পাইল না। কেবল আপন আপনি প্রশ্ন করিতে লাগিলাম—
কে এই বালিকা? একপ মেহ, দয়া, সহানুভূতি, সরলতা কি
বহু জাতিতে আছে? রাতে বন্ধুকে একবার জিজ্ঞাসা করিলাম—
আমেরিয়া খাইয়াছে কি না? বন্ধু বলিলেন “হাঁ।” আমি বন্ধুকে
আমেরিয়ার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলাম। বন্ধু শেষে আমার
প্রশ্নবাণে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল—“তোমার কি অল্প কথা
নাই, আমেরিয়ার এত খোঁজ কেন?” আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা
করিতে সাহস করিলাম না।

দেখিলাম আমেরিয়া সেই সন্ধ্যা হইতে রজনী দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত
আমার কাজ করিতে লাগিল। বাহ্যিক পশ্চিমে গিয়াছে,
আমাদের পশ্চিমের জলকণ্ঠের কথা অবিদিত নাই। ১০।৮০
হাত নিম্নস্থ কূপ হইতে জল তুলিতে হয়। একটি কলস কূপ
হইতে জল পূর্ণ করিয়া উত্তোলন করিতে কতটুকু সময় ও কতটুকু
পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা বোধ হয় বাঙ্গালা দেশের লোক কল্পনাতেও
আনিতে পারিবে না। আমেরিয়া সন্ধ্যায় দ্বীপ আলিয়া কূপ
হইতে পঞ্চাশ কলসী জল উঠাইল। আমরা সে দিন অতিথি
হওয়ায়, তাহার পরিশ্রমটা খুবই বাড়িয়াছিল। উচ্ছ্রিত তৈজসপত্রাদি
সেই কূপের জলে নার্কজনা করিল। পাকশালা পরিষ্কার হইলে
পর দিনের রন্ধন, মুখ-প্রক্ষালন ও শৌচাদির জল পৃথক পৃথক
পাত্রে রাখিয়া দিল। ইহা ব্যতীত সাংসারিক সমস্ত কার্য সে



বিরোধী কূপের দৃশ্য।

একটি স্থানীয় কূপ হইতে দল উত্তোলন করিতেছে।

সম্পন্ন করিল। বাসায় স্বীলোক নাই। পাচকঠাকুর সকলকে
 আহারাদি করাইয়া একপ নাসিকাস্থানি করিতে লাগিল যে,
 নিস্তরু প্রকৃতিদেবীও শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। কামেরিয়া বেন
 দশভুজা—যখন যেটি বাহার আবশ্যক, তখনই সেইটি গুছাইয়া
 রাখিতেছে। তাহার শয্যা-বিস্তারে পারিপাটা, সাংসারিক কার্যে
 পরিচ্ছন্নতা, রন্ধন কার্যে উত্তোষ, অতিথিকে যত্ন ও গুণগ্রহা, সকলের
 হৃৎথে সহানুভূতি প্রকাশ, সর্বোপরি তাহার পরিশ্রম শক্তি
 দেখিয়া, গৃহস্থের পাকা গৃহিণীকেও মস্তক অবনত করিতে হয়।
 বাস্তবিকই কামেরিয়া বেন সে গৃহের লক্ষ্মীরূপিণী। কামেরিয়া
 জাতীতে পাহাড়িয়া। তাহার এক বৃদ্ধা জননী ব্যতীত আর কেহ
 নাই। কামেরিয়ার উপার্জনের উপর তাহার মাতার জীবন
 নির্ভর করিতেছে। বড়ী কাজ কন্ম কিছুই করিতে পারে না।
 বাসা হইতে তাহার মাতার কুটির প্রায় এক মাইল দূরে এক
 পাহাড়ের ধারে অবস্থিত। কামেরিয়ার পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম
 হইলেও তাহার আচার ব্যবহার, কথাবার্তা সকলই সরলা বালিকার
 গায়। বালিকার গায় তাহার মুখখানিতে হাসি ও সরলতা
 ভরিয়া আছে। পাহাড়িয়ারা পরিশ্রমী হইলেও এই বালিকার
 গায় পরিশ্রমশীলা বালিকা আর কোথাও দেখি নাই।

পূর্ব্বরাত্রে কামেরিয়াকে রজনী দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত গৃহকার্যে নিযুক্ত
 দেখিয়াছি। প্রত্যুষে উঠিয়া দেখি—কামেরিয়া কূপ হইতে জল

উত্তোলন করিয়া ফুলগাছগুলিতে ঢালিতেছে। ফুলগাছগুলি
ঝামেলিয়ার প্রাণাপেক্ষাও শ্রিয়। ঝামেলিয়া কি রজনীতে নিদ্রা
বায় নাই?

সেই কনকনে শীতের প্রক্যমে ফুলগাছগুলিতে ঝামেলিয়া এক-
মনে জ্বল সেচন করিতেছে। আমি যাইয়া ডাকিলাম “ঝামেলিয়া।”

ঝামেলিয়া চমকিত হইয়া আমার দিকে চাহিল। পরে
বলিল—“কেন বাবু পানি চাই?”

বিরোধীর অরণ্যে, পর্বতে, ক্ষুদ্রপল্লী মধ্যস্থ বৃক্ষ-শিরে, সেই
পর্বতোপরি বিশ্ববৃক্ষে তখনও রজনীর একটু একটু অন্ধকার,
জমিয়া ছিল। বিরোধীর বিহঙ্গকুল তখনও কুলায় নিদ্রা
বাইতেছিল। পূর্বাগমন তখনও রজনীর ক্ষীণ অন্ধকারে আবৃত।
কেবল অদূরে বিরোধীর জঙ্গলে কি একটা বগা পক্ষী কুলায় হইতে
এক একবার সাড়া দিতেছিল। রজনীর শেষে উষার পূর্বাগমনে,
শিশির-সিক্ত শীতল বায়ু, পর্বত, অরণ্য ভেদ করিয়া স্বন স্বন শব্দে
দেশ-দেশান্তর বহিয়া চলিয়াছে। সে বায়ু মোটা গরম কাপড় ভেদ
করিয়া আমাকে কাঁপাইয়া তুলিল। ঝামেলিয়ার কিন্তু ক্রক্ষেপ
নাই। বালিকা কি নিদ্রা, শীত সমস্তই জয় করিয়াছে?

তখনও সমস্ত বিরোধী নিবৃত্ত—নিদ্রাভিভূত। আমার ডাকে
ঝামেলিয়া চমকিত স্বরে বলিল—“কেন বাবু?”

“তুমি কখন ঘুমাইতে গেলো?”

“সেই তখনই বাবু—কাজ কর্ম শেষ করিয়া ।”

“কখন আবার উঠিলে ?”

“এই একটু আগে ।”

“তুমি কি প্রত্যহ এইটুকু নিদ্রা যাও ?”

“হঁা বাবু ! আমি বেশীক্ষণ শুইয়া থাকিতে ভালবাসি না ।”

“তুমি এখানে কত বেতন পাও ?”

“ছই টাকা বাবু । আর মাকে, বৎসরে বাবু ছুইখানি করিয়া কাপড় দেন ।”

“তাতেই তোমাদের বেশ চলে ?”

“হঁা বাবু—মায়ের বেশ চলে ।”

“তোমাদের বাড়ী কত দূর ?”

ঝামেরিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তাহাদের বাটী দেখাইল ।

আমি বলিলাম—“চল না ঝামেরিয়া তোমাদের বাড়ী দেখিয়া আসি ।”

ঝামেরিয়া প্রথমতঃ একটু ইতস্ততঃ করিল । তাহার পর বলিল “একটি ক্ষুদ্র ভাঙ্গা পর্ণকুটার দেখিয়া আপনার কি লাভ হবে—আর সে অনেকটা দূর বাবু ।”

“জা হ’লেই বা ঝামেরিয়া—এখনও ত প্রভাতের বিলম্ব আছে, এখনই কিরিয়া আসিয়া আবার কাজ করিবে ।”

ঝামেরিয়া মন্তক মাড়িয়া সম্মতি জানাইল । তারপর সে

অগ্রে চলিতে লাগিল । কত কথা আমেরিয়াকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম । সরলা বালিকা এক এক করিয়া তাহার উত্তর দিতে লাগিল । তিলমাত্র কপটতা সেই ক্ষুদ্র স্বচ্ছ হৃদয়খানিতে নাই । তবে কি আমেরিয়া দেওয়ালিকা ? অনেক কথার আমেরিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“তোমার বাপ কত দিন গেছে আমেরিয়া ?”

আমেরিয়া স্নিগ্ধ সরল চক্ষু দুটিতে এক দৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল । সে ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না । ভাবিলাম অতি শিশুকালেই হয় ত আমেরিয়ার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে ।

আমেরিয়ার করুণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে কত দূরে আসিলাম সে দিকে লক্ষ্য ছিল না । হঠাৎ সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—“বাবু ঐ আমাদের কুটীর ।” কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া আমরা কুটীরের সম্মুখে আসিলাম ।

পূর্বভের সম্মুখে নিবিড় জঙ্গলের ধারে আমেরিয়ার বৃদ্ধ জননীর কুটীর । তাহার পার্শ্ব দিয়া করণার স্বচ্ছ জল বিকিরিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে । সেই শুভ্র জলরাশি দেখিতে মনে হয়, কে যেন বৃদ্ধার কুটীর-পার্শ্বে একখানি চাঁদি রূপার পা বিছাইয়া রাখিয়াছে । অদূরে জঙ্গলের ধারে কয়েক খিল কুটীর দেখা যাইবে । মাঝে মাঝে ছুই একখানি কুটীর । তখন প্রায় দুইখানি পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে । একটি বৃদ্ধ ছুইটি বৃদ্ধ লইয়া জঙ্গলে

জীবনের একমাত্র অবলম্বন। এই অশীতিপর বৃদ্ধার এইরূপ শক্তিসামর্থ্যের পরিচয় শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। সহরে বিদ্যুতালোক-উদ্ভাসিত স্রম্য কক্ষে আরামে বাস করিয়াও বঙ্গ-জলনা ত্রিশ বৎসর বয়সেই জরাগ্রস্থ হয়। হায়! কত পার্থক্য।

বৃদ্ধা অশ্রুসিক্ত মুখে বার বার কামেরিয়ার মন্তক চুষন করিয়া বলিল,—

“কামেরি! কামেরি! তুই ভাল আছিস ত না?”

কামেরিয়া প্রকুলমুখে বলিল,—“হাঁ না! ভাল আছি। এই বায়ু কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। ইনি আমাদের কুটীরে ঘুমিতে চাহিলেন, তাই সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি।”

বৃদ্ধা এতক্ষণ আমাকে লক্ষ্য করে নাই। অসময়ে কামেরিয়ার আগমনে সে আতঙ্কে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল। কামেরিয়ার এই কথায় তাহার দৃষ্টি আমার উপর পড়িল।

আমাকে দেখিয়া যেন সে একটু জড়লড় হইয়া পড়িল। কামেরিয়ার কাপের কাছে মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল। কামেরিয়া কি বলিল জানি না; কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া যেন একটু আশঙ্ক হইল। সে তাড়াতাড়ি একখানি সেমচর কুটীরাকান্তর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া আমাকে রসিকতার নিমিত্ত তৃণাচ্ছাদিত এক সমতল ক্ষেত্রের উপর বিছাইয়া দিল।

বৃদ্ধা শঙ্কিতা ও সঙ্কুচিতা হইয়া আমাকে কত কথার জিজ্ঞাসা করিল। মাঝে মাঝে তাহার শুষ্ক মুখখানি আরও শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। বোধ হয় ভাবিতেছিল, সে কি অন্টার কথা আমাকে বলিয়া ফেলিয়াছে। বৃদ্ধার সহিত কথা কহিতে কহিতে বড়ই আনন্দ পাইতেছিলাম। আমার আরও কিয়ৎক্ষণ বৃদ্ধার সহিত তাহার শান্তি-কুটারে ক্লান্ত করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু কামেরিয়ার অনেক কাজ আছে, সে বাস্তব হইতে লাগিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি কামেরিয়ার সঙ্গে বিরোধীরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

কামেরিয়া বাসায় আসিয়াই আমাদের আচারাদির উত্তোগ করিতে লাগিল। সেইদিনই আমাদেরকে এলাহাবাদ যাত্রা করিতে হইবে। আচারাদির পর এই কথা প্রকাশ করিতে কামেরিয়া আমাদের যাত্রার উত্তোগ করিতে লাগিল। সে যেন হিন্দু-গুরুদের পাক গৃহিনী! অসভ্য পাহাড়িয়া মেয়ে এমন গৃহিনীপণা কোথা হইতে শিক্ষা করিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। সে প্রত্যেক বিষয়টা ভগিনীর মত—জননীর মত যত্ন করিয়া আয়োজন করিতে লাগিল। আমাদের আবশ্যক দ্রব্যাদি সে সবজে শুদ্ধাইয়া দিল।

সেই দিন বিপ্রহরে এলাহাবাদ আসিবার দ্রষ্টব্য আনন্দের বিরোধীরা মিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলাম; কিন্তু সেই সন্ধ্যা বালিকা

ঝামেরিয়ার মধুর স্মৃতিটুকু আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া আসিতে
 চইল। ঝামেরিয়া ছল ছল নেত্রে সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া আমাদিগকে
 গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া গেল। বিদায়কালে সেই সরল বালিকার
 অশ্রুসিক্ত নয়ন দুইটি দেখিয়া আমিও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারি
 নাই। বিরোধী ত্যাগ করিলাম, কিন্তু সমস্ত পথ সরল বালিকার
 মুখখানি মনোমধ্যে উদ্ভিত হইয়া আমার হৃদয়কে আকুল করিতে
 লাগিল। মনে ভাবিলাম, এই অসভ্য, নগণ্য, ঝামেরিয়া পরি-
 চারিকা—না কুহকিনী ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

একটু থামিয়াই ভবরামবাবু আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন ।
সেই দিন এলাহাবাদ পৌছিয়াই আমরা গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম-
দেখিতে গেলাম ।

গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলকে প্রয়াগ বা ত্রিবেণী বলে । এই সঙ্গমস্থলে হিন্দু দান-ধ্যান করে এবং এই দৃশ্য অতি মনোহর । শত শত হিন্দু সরল বিশ্বাসের সহিত অক্ষয় কল লাভ করিবার জন্য অকাতরে যথাসর্বস্ব দান করিতে কুচিত্ব হরম । এই দানশীলতা ও ধর্মপ্রাণতা এখনও হিন্দুকে জীবিত রাখিয়াছে । রেলগাড়ী হইতে যমুনার পরপারে এলাহাবাদের দৃশ্য অতি মনোহর । সে প্রাণারাম নরনাথিরাম দৃশ্য অস্বীকৃত করিবার ক্ষমতা আমার নাই । অন্ধ যেমন অন্ধকে পথ দেখাইতে অসমর্থ, আমিও সেই প্রকার ইহা বর্ণনা করিতে অপারক । ভাষায় এমন শব্দ নাই, যাহা দ্বারা এই প্রাকৃতিক দিগ্ভাষ দৃশ্য অঙ্কিত করিতে পারা যায় ।

এলাহাবাদের দক্ষিণ অংশে সরস্বতীর প্রধান স্রোত "হামার চক" ।

এই স্থানের বসতি খুব ঘন—দেখিলেই বোধ হয় যেন ইহাই এলাহাবাদের পূর্ণ-ছবি। যতগুলি পল্লী আছে, তন্মধ্যে শাহাগঞ্জ, বাদসাহী-মণ্ডাই ও আতর সুইয়াতে বহু বঙ্গদেশবাসী দেখিতে পাওয়া যায়। এলাহাবাদে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব বেশী। বৃহৎপ্রদেশের রাজধানী বলিয়া এইস্থানে অফিস, আদালত, প্রভৃতি নমস্তই অধিষ্ঠিত। হিন্দী ও উর্দু ভাষা প্রাধান্য লাভ করিলেও, বাঙ্গালা ভাষার প্রচলনই খুব বেশী বলিয়া বোধ হয়।

সয়াট আকবরের সময় এই সহরের নাম ছিল ইলাহিনাস অর্থাৎ বেহেশ্ত। এক্ষণে ঐ নাম পরিবর্তিত হইয়া এলাহাবাদ হইয়াছে। প্রয়াগে প্রাতিশ্রবণীয় বুদ্ধদেব তাঁহার “অহিংসা পরম ধর্ম” প্রচার করিতে পশ্চাৎপদ হ’ন নাই। সেই সময়ে বৌদ্ধগণ হিন্দুর বেদবিধি মত যাগ-যজ্ঞাদি ও বর্ণাশ্রম বিনুস্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু এলাহাবাদের ব্রাহ্মণগণ দৃঢ়রূপে স্থিরপ্রতিজ্ঞার সহিত তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিতে আদৌ বিরত হ’ন নাই। ইতিহাস এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—পুণ্যভূমি এলাহাবাদ এখনও দণ্ডায়মান থাকিয়া এই কথা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

রাজা অশোক বৌদ্ধধর্মের জয়-পতাকা আসমুদ্র ভারতে প্রোথিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার জন্য

তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয়ও করিয়াছিলেন। ভারতের নানা স্থানে নানাপ্রকার অশোক স্তম্ভ সমূহ দণ্ডায়মান থাকিয়া এখনও তাঁহার কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। এলাহাবাদের চম্পককুঞ্জে একটি স্তূপ তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং বর্তমানে উহা এলাহাবাদ ফোর্টের ভিতর অবস্থিতি করিতেছে। এই স্তম্ভের সৌন্দর্য্য দেখিবার সামগ্রী। এলাহাবাদে আসিয়া ইহা না দেখিলে পর্য্যটকের সৌন্দর্য্য-দর্শন শেষ হইতে পারে না। বৌদ্ধযুগের কীর্ত্তি সমূহের মধ্যে এই “অশোক-স্তম্ভ” একটি প্রধান ঐতিহাসিক স্মরণ-চিহ্ন।

তারপর আমরা নৌকারোহণে যমুনার অকুরস্তু সৌন্দর্য্য দেখিতে চলিলাম।

যখন আমাদের নৌকা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইল—দেখিলাম শত শত ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী প্রয়াগে মস্তক মুগুন করিতেছেন। ইহাদের ধর্ম্মপ্রাণতা দেখিয়া হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। যমুনার নীল জল গঙ্গার সহিত কিছুতেই মিশিতেছে না। কি সুন্দর দৃশ্য! গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থলে যেন একটি হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গর, অমর, পবিত্র রেখা কে আঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। এই পবিত্র রেখা ও হিন্দু নরনারীর ধর্ম্মপ্রাণতা দেখিয়া আমার মনে হইল, পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম চিরদিন এইরূপ মস্তক উন্নত করিয়া অবনীমণ্ডলের উপর দণ্ডায়মান থাকিবে। শত

সভাতা, শত বক্তৃতা, শত স্বধর্মত্যাগীর প্রাণপণ চেষ্টা কোন কালে কোন যুগে ইহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না। যত দিন হিন্দুর তীর্থক্ষেত্র সমূহ বিরাজ করিবে, ততদিন হিন্দু নাম কেহ লোপ করিতে পারিবে না—হিন্দুধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

ইহার পর আমরা এলাহাবাদ ফোর্ট দেখিতে গেলাম, এই দুর্গ বহুশতাব্দী পূর্বে হিন্দুরাজগণ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। চর্ষবর্দ্ধনের সময়েও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর প্রাচীনগণীয় মোগল বাদশাহ সম্রাট আকবর শাহ ইহার পূর্ণ সংস্কার করেন। যিনি হিন্দুদিগকে সমান চক্ষে দেখিয়া জায় শাসন করিয়া গিয়াছেন, বাহার জন্ত বহুসংখ্যক হিন্দু তাঁহার সময়ে উচ্চ রাজকার্যে নিয়োজিত থাকিয়া হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য বন্ধিত করিয়া গিয়াছেন, সেই “দিল্লীস্থরো বা জগদীস্থরো বা” সম্রাটের মহিমা, এলাহাবাদ দুর্গ এখনও সগৌরবে মস্তকে বহন করিতেছে।

যিনি প্রতাপকে জয় করিয়াছিলেন, চর্ষ পাঠানদিগকে শাসন করিয়াছিলেন, সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বাদশাহ আজ কোথায় ? তাঁহার সেই দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ মহারাজ মানসিংহ, টোডরমল্ল, ভুগবান্দ দাস, বীরবল, প্রভৃতি হিন্দু-কুলতিলক মহাদ্বয় আজ কোথায় ? কেহ্না পরিভ্রমণ করিতে করিতে আমি আশ্চর্য্যে হইয়া পড়িলাম। কত পূর্বস্মৃতি প্রাণে জাগিয়া উঠিল। ভাবিলাম,

যিনি এই দুর্গের নির্মাণ কর্তা তিনি বা তাঁহার বংশধরগণ আট কোথায়? একদিন বাঁহারা এই অভেদ দুর্গে আরাম শয়নে নিদ্রা যাইতেন, বাঁহাদের অসীম শক্তি সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহারা আজ কোথায়? নয়নপল্লব দুঃখ-নীরে আর্দ্র করিয়া আমরা এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, কলেজ, স্কুল, পার্ক, খসকুবাগ ইত্যাদি দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম। খসকুবাগে হতভাগা সাহজাদা খসকুর সমাধিমন্দির দেখিয়া আমাদের মনে কত কথা উদ্ভিত হইতে লাগিল। আর্দ্র আঁখিমুগল হইতে আপনা আপনি অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। ভাবিলাম, কালের কি ভয়ঙ্কর পরিবর্তন! ইহার নিকট মানবের শক্তি স্থান পায় কি?

এলাহাবাদ হইতে আমরা টুডুলায় আসিলাম। টুডুলায় পানীয় জল অতি স্বেপ্ন। এখানকার প্রত্যেক কূপের গভীরতা আশি হাত। আমাদের বাঙ্গালা দেশের গৃহলক্ষ্মীগণকে যদি এইরূপ আশি হাত নিয়ম হইতে কূপের জল উত্তোলন করিয়া গৃহকাৰ্য্য সমাধা করিতে হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের কি দশা ঘটত কে জানে?

টুডুলা হইতে আমরা মথুরা যাত্রা করিলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়াই পাণ্ডাদিগের অপূর্ণ আহ্বানে আমরা কোথায় যাত্রা করি হইয়াছিলাম। তাহাদের সেই “চরগোবিন্দ চোকে বাঁহা চাই,” “নারায়ণপ্রসাদ চোবে” ইত্যাদি চীৎকারগুলি শুনিয়া আমরা প্রথমে

কিছুই বুঝিতে পারিলাম না যে, কেন ইহারা চীৎকার করিতেছে। অবশেষে বন্ধুবর যখন বলিলেন যে, ইহারা এই প্রকারে যাত্রী সংগ্রহ করিয়া থাকে, তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম। “সাড়ে আট ভাই” মানে বুঝিলাম যে, যাহাদের বিবাহ হইয়া নাই, তাহাদিগকে ইহারা অর্ধ বিবেচনা করিয়া থাকে। উহাদের ধারণা, হিন্দুগণ সমস্ত তীর্থদর্শন করিয়া পরিশেষে মথুরায় আগমন করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত উহারা প্রত্যেক ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া যাত্রীদিগকে তাহাদের নাম বার বার শুনাইয়া থাকে, যাত্রীরা সেই নাম শ্রবণে মথুরায় আসিয়া তাহাদিগকে পাণ্ডা নিযুক্ত করে।

মথুরা কালিন্দীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। এই কালিন্দীর কূলে পূর্ণব্রহ্ম বাসুদেব কত লীলাই করিয়াছেন। কালিন্দী কাল জল আজও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মথুরা একটি বিখ্যাত নগরী। এখানকার সহর ও রাজবস্ত্রগুলি দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। তারপর নানাপ্রকার যান বাহনাদি থাকায় পর্যটককে আর কোনও প্রকার ক্লেশভোগ করিতে হয় না।

এখানকার পাণ্ডারা সকলেই চতুর্বেদ পাঠ করিয়া থাকে—এই নিমিত্ত তাহাদিগকে “চৌবে” বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই পাণ্ডাগণের বিবরণ পর্যটকের জানিবার বিষয়।

মথুরা, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মঙ্গলপরাক্রমশালী কংসাস্বরের রাজধানী ছিল। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা সকল দেখিলে হিন্দুর প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে। সন্ধ্যার আলোকে যখন কালিন্দীর কাল জল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র নগরী তিমিরাচ্ছাদিত হয়, তখনকার সে দৃশ্য অতি মনোরম। যমুনাতীর হইতে সুনীল মুক্ত অম্বর-তলে শত সহস্র সুগন্ধি দীপালোকে শঙ্খ ঘণ্টা বাজা মুগ্ধরিত মন্দিরগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর হয়।

কাশীতে যেমন বরুণা ও অসি অন্ধ চন্দ্রাকারে সমগ্র নগরী বেষ্টিত করিয়া আছে, মথুরাতে সেই প্রকার একটা অন্ধচন্দ্রাকার স্থান আছে। পাণ্ডুরা বলিয়া থাকেন, যাহারা এই স্থানে রাস করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়, তাহারা গোলকে গমন করে। গোলক কেহ কখনও দেখে নাই বা দেখিয়া আসিয়া তাহার অনন্ত সৌন্দর্যের পরিচয় প্রদান করে নাই; কিন্তু এই স্থানে বাস করিলে যে মন ও প্রাণ পবিত্র হয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াও মোক্ষ কামনায় এই স্থানে বাস করিলে নিরানন্দ শোকগ্রস্ত হিন্দুর প্রাণেও শান্তি-মন্ডাকিনীর পূতধারা প্রবাহিত হইবেই হইবে।

মথুরা-মণ্ডলের দ্বাদশ-বনের মধ্যে প্রথমেই মধুবন বিখ্যাত। শ্রীহরি এইস্থানে মধুনামক দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন—পাণ্ডুরা এইরূপ বলিয়া থাকে। মধুবন বড়ই সুন্দর—বড়ই নরনারাজ্য।

যমুনার পূর্ব-তীরে মথুরা সহরে বিশ্রাম-ঘাট বলিয়া একটা ঘাট আছে। এই স্থানে যাত্রীগণ স্নানান্তে পিতৃ-পুরুষের গোলক কামনার তিল-তপণ করিয়া থাকেন। পিতৃ-পুরুষের গোলক-প্রাপ্তি হয় কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সংসার-ক্লিষ্ট মানবগণ যে এই ঘাটে বিশ্রাম করিলে প্রাণে বিমল শান্তি প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিশ্রাম-ঘাটের শোভা অতি মনো-মুগ্ধকর। মথুরায় যে বারটা ঘাট আছে, তন্মধ্যে এইটা সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিলে মনে অপূর্ব ভাবের উদয় হয়। সন্ধ্যার সময় যখন অসংখ্য দীপাবলী প্রজ্জ্বলিত করিয়া ব্রাহ্মণগণ মঙ্গল-আরতি করিয়া থাকেন, তখন ক্রাহার প্রাণে না সাময়িক ভীতির উদ্বেক হয়? তখন মানবপ্রাণে এক অপূর্ব ভাবাবেশে বাহুজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। “হিপনটিক” শাস্ত্র পাঠ্য অধ্যয়ন করে নাই বটে; কিন্তু সন্ধ্যাকালে এই মঙ্গলময়ের বিরট আবাহন আরতি প্রাণের ত্রিবিধ তাপ নিবারণ করিয়া যে মানবগণকে সম্মোহিত করে সে বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

মথুরা-তীর্থ হইয়া আমরা বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া, টেশন হইতে যে বাধান প্রশস্ত রাস্তা আছে আমরা তাহার মধ্য দিয়া, নানা দেবালয় দর্শন করিতে করিতে বৃন্দাবনের বড়বাজার চকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে শেঠজীর নিখ্যাত

দেবালয় আছে। এই দেবালয় দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম—
ভাবিলাম ইহারাই বথার্থ হিন্দু। যাহারা হিন্দু-ধর্মের রক্ষাকল্পে
সর্বস্ব দান করিতে পারে, তাহারা বথার্থই আদর্শ-পুরুষ। শেঠ-
জীর মন্দিরাভ্যন্তরে সুবর্ণনির্মিত বৃহৎ তালগাছ দেখিয়া
ভাবিলাম, এই প্রকার শোভনীয় বস্তু পৃথিবীতে আর কিছু
আছে কি?

আমরা সন্ধ্যাকালে পুনরায় এই সকল দেবালয় ও রাস্তাবাট
দেখিতে বহির্গত হইয়াছিলাম। সেই সময়ে সে কমনীয় শোভা
সন্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাতে এই মর্ত্যাই আমাদের নিকট স্বর্গ
বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। যদি কেহ বলে স্বর্গ মানবচক্ষুর
অন্তরালে আছে তাহা হইলে তাহাকে বলিতে ইচ্ছা হয়, তোমার
শাস্ত্র রাগিয়া দাও—তর্ক জলে নিক্ষেপ কর। যদি স্বর্গ বলিয়া
কিছু থাকে, তবে সে এই লীলাময়ের লীলাধান বৃন্দাবন।

তারপর বৃন্দাবনের কুণ্ডগুলি বাস্তবিকই অমৃতধারা পূর্ণ নির্মল
ও পরিষ্কার। শ্রাম-কুণ্ড রাধ-কুণ্ড প্রভৃতি দেখিলে প্রাণে বিমল
শান্তি আসে। মনে হয় একবার এই কুণ্ড-সলিলে স্নান করিলে
যুগ্ম শরীরের সর্ববিধ ব্যাধি ও আলা দূর হইয়া যাইবে।
ভোগবতীর সুস্বাদু নীর—বন্দাকিনীর পুতধারা—জাহ্নবীর নির্মল
সলিল—সব এই কুণ্ডে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। যদি হিন্দু হও
—যদি সর্ববিধ পাপ দূর করিতে চাও, তবে একবার এই কুণ্ডে

অবগাহন কর—দেহ ও মন পবিত্র হইবে—প্রাণে বিমল শক্তি লাভ করিবে ।

পূর্বেই বলিয়াছি নথুরা পরিভ্রমণ শেষ হইলে আমরা অশ্বখানে বৃন্দাবনে আসি । বৃন্দাবনে আসিয়া আমরা প্রাণ্ডায় হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলি হই । আমাদের আর স্বাধীন ইচ্ছা রহিল না—তাহারা দয়া করিয়া যাহা দেখাইতে লাগিলেন—তাহাই দেখিলাম । রাস্তায় বাহির হইলেই হরিনামের অবিরাম ধ্বনিতে বর্ণ করিয়া চইয়া যায় । কেহ গায়িতেছে :—

“শ্রামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন

মৃদু মৃদু বংশী বাজে এই সেই বৃন্দাবন ॥”

আবার কেহ বা গায়িতেছে :—

“ধূলা নয়, ধূলি নয়,—গোপীপদ রেণু ।

এই ধূলা মেথেছিল ননের বেটা কান্দু ॥”

কেহ বা ‘জয় রাধে শ্রীরাধে’ বলিয়া চীৎকার করিতেছে । কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে “জয় রাধা শ্রাম” বলিয়া ভিক্ষা করিতেছে । কেহ বা খোল করতাল লইয়া হরিনাম সঙ্গীত করিতেছে । আবার কেহ বা ধূল্যবলুষ্ঠিত হইয়া “হা কৃষ্ণ কৃষ্ণাঙ্গিছ ! আমায় কি দয়া করিবে না” বলিয়া অশ্রু-নীরে বক্ষ ভাসাইতেছে । বৃন্দাবনের ধূলি পর্যন্ত হিন্দুর নিকট পবিত্র—তাই যোগী, ভোগী সকলেই ইহা সর্বদা মাথিয়া থাকে । এই প্রথম চিত্র—এই ভক্তি-

উৎসের পবিত্র ধারা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না । যখনই শুনিলাম, ভক্তিরস পূর্ণ নানারস মধুর সঙ্গীত চতুর্দিকে হইতেছে, এমনই আমাদের প্রাণমন স্বর্গাশ্রিতাবে বিভোর হইয়া উঠিল ।

হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ শ্রীবন্দাবন । চৈতন্যদেবের প্রভাবে বন্দাবন ঝাঙ্গালী তীর্থ স্থানে পরিণত হইয়াছে । যে ভক্তিরসে কৃষ্ণ চৈতন্য সমগ্র বাঙ্গালা মাতাইয়াছিলেন, যে অনন্ত প্রেমের পুণ্য-প্রবাহে ঝাঙ্গালী, উৎকলবাসী ভাসিয়া গিয়াছিল—তাহার পূর্ণবিকাশ যদি দেখিতে ইচ্ছা হয় ; তবে বন্দাবন গমন কর । এমন তীর্থ আর নাই । তোমার নয়ন পরিতৃপ্ত হইবে—জীবনসার্থক হইবে । শ্রীবন্দাবন ও নীল-যমুনা শ্রীরাধামাধবের প্রিয় নীলাহল ছিল । এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায় না । যে দিকে চাহিবে সেই দিকেই দেখিতে পাইবে যে, ভগবানের লীলা প্রকাশিত হইতেছে । কদম্ববৃক্ষে ময়ূর ও ময়ূরীগণ অপূর্ণ চিত্রিত পাখা বিস্তার করিয়া সুমধুর কে-কা-রবে দিগ্বাণল প্রতিধ্বনিত করিতেছে । কোথাও বা ভ্রমর-ভ্রমরী মধুর গুঞ্জে ভগবানের পবিত্র গুণগান করিতেছে ।

যমুনা উজান বহিয়া চলিয়াছে । তাহার সেই নীল জলে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিয়া প্রেমনয়ের প্রেম-কাহিনী ব্যক্ত করিতেছে । এই নীল-যমুনার তীরে নীলাম্বর কলিয়ারন করিতেন । সেই বংশীরবে আকুল হইয়া ব্রজের বন ঘোষী

দিক্ভ্রান্ত হইয়া—প্রেমে গদগদ হইয়া, স্বীয় কর্তব্য তুলিয়া—সংসার
তাগ করিয়া উন্মাদিনীর স্থায় ধাবিত হইত। যাত্রকের মোহিনী
বংশী-রবে ব্রজাঙ্গনাগণ বাস্তবিকই উন্মাদিনী হইয়াছিল। তাই
বিদ্যালতারূপিনী বৃক-ভানুনন্দিনী শ্রীমতী অচেতন অবস্থায় ইহার
তীরে ছুটিয়া আসিতেন। গাভিগণ কৃষ্ণের বংশীরব শুনিয়া হাঙ্গা
রবে উল্কে পুচ্ছ তুলিয়া এই যমুনা-পুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইত।

আমি যেন স্বপ্নাবিষ্ট হইলাম। আমার নয়ন সমক্ষে কে
এই সকল চিত্র ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, “বৃন্দাবন
পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি” তাই কি বৃন্দাবনের এই
নয়নানন্দকর শোভা চিরনবীন রহিয়াছে !

ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইয়া উঠিলাম। সহসা শুনিলাম,
কে যেন মধুরকণ্ঠে গায়িতেছে :—

“আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেমু চরাব।”

আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। এই চির-পরিচিত বাক্যলা
সঙ্গীত কে গায়িতেছে। দেখিলাম, অদূরে কয়েকটা বালক কল-
কণ্ঠে এই মধুর সঙ্গীত করিতে করিতে আসিতেছে। আমি
তাহাদিগকে দেখিয়া সেইদিকে দৌড়াইয়া গেলাম। তথায় বহু
লোকের সমাগম হইয়াছে। বালকগণ মধুরস্বরে গায়িতেছে—
নাচিতেছে এবং চতুর্দিক হইতে নিকশিত পরস্পর কুড়াইতেছে।

বৃন্দাবনে অনেক “তুলসী বেদী” দেখিতে পাইলাম। কারণ

কি জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম যে, কথিত আছে, যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে এই বেদী প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি নিঃসন্দেহে বৈকুণ্ঠ লাভ করেন। দানবীরের অভাব নাই—ধার্মিকের অভাব নাই—অসংখ্য “তুলসী বেদী” এই প্রকারে স্থাপিত হইয়াছে।

তারপর শাওজির মন্দির, লালাবাবুর মন্দির, শেঠের মন্দির, গুপ্তেশ্বরীর মন্দির ইত্যাদি দেখিয়া প্রাণে বড়ই আনন্দ পাইলাম। ভাবিলাম, সার্থক ইহাদের জন্ম! ইহারাই অর্থের যথার্থ সদ্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আর সার্থক লালাবাবু ও শেঠজি! তোমাদের নাম,—তোমাদের অক্ষয়-কীর্তি ধরণীর পৃষ্ঠ হইতে কোন দিন বিলুপ্ত হইবে না।

বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির দেখিয়া, আমরা স্তম্ভিত হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম, হায়! হিন্দু-কুলতিলক মানসিংহ! আজ তুমি কোথায়? বিধর্মীর হস্তে তোমার কীর্তি-স্তম্ভের কি শোচনীয় পরিণাম ঘটয়াছে তাহা একবার আসিয়া দেখিয়া যাও! যাহার জন্ত তুমি প্রাণপাত করিয়াছিলে, তোমার সেই কীর্তি-মন্দিরের অবস্থা একবার অবলোকন কর।

এখন হইতে আমরা আগ্রা দেখিতে গেলাম। আগ্রার ভাস্কর্য (মমতাজ) ইত্যাদি দেখিয়া প্রাণে অসিদ্ধচরীর আশঙ্কায় উদ্ভয় হইল। তথায় আকবরের সমাধি দেখিয়া

দেখিয়া প্রাণ পুলকিত হইয়াছিল। এই সমাধি-ভবন সন্মুখ
আকবর স্বয়ং প্রস্তুত করাইয়াছিলেন ; পরে তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর
বাদসাহ ইহার কেবল মাত্র একটা তোরণ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।
সেকেন্দ্রা মসজিদের উপর হইতে প্রাস্তরের দিকে চাহিলে, প্রাক-
ৃতিক দৃশ্যে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে ! ইহার উপর হইতে বহু-
দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বানপার্শ্বে যমুনা, দক্ষিণে বহু-
দূর ব্যাপী বিস্তৃত প্রান্তর ! মসজিদের উপর উঠিলে আগ্রা সম্রাট
মুস্পষ্ট নয়ন-গোচর হয়। সেকেন্দ্রা মসজিদের উপর হইতে
প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি দেখিতে দেখিতে প্রাণ যেন কোন এক অজানা
রাজ্যে চলিয়া যায় ! উপর হইতে অবতরণ করিবার আবার আর
ইচ্ছা হইতেছিল না। এখান হইতে আগ্রার তাজমহলকে যেন
যমুনার উপর একখানি মনোহর চিত্রের নত দেখাটাইতেছিল।
তাজ দেখিতে দেখিতে আশ্চর্য হইয়া পড়িলাম। জগতে
সবই নব্বর। মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম সবই কাল-
নেমীর তর্জ্জনি হেলনে চলিয়া থাকে। কিছুই থাকে না—হর
মাটা—না হর ভস্মসূপে পরিণত হয়। সুন্দর দেহ—বাহার জল
এত পারিপাটা, এত বহু, এত পরিশ্রম সেই দেহ কেঁপায় চলিয়া
যায় ! কীষ্টি একমাত্র এই জগতে অবিনশ্বর, তার পর প্রেম।
বাক্য ধামিনী যায়, শব্দ থাকে। পূর্ণিমা চন্নিয়া যায়, তাহার সতি
ধরনী বাক্য অঙ্কিত করিয়া যায়। ফুল শুক হইয়া যায়, কিন্তু তাহার

গন্ধ লোপ পায় না। প্রেম অনন্ত, প্রেম অবিনশ্বর। এই শিক্ষা দিবার জন্তই যেন তাজ আক্কে ও সগর্বে মস্তকোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সম্রাট-মহিষী রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন—
জাহাঁপনা আপনি আমায় এত ভালবাসেন, কিন্তু এই মাটির শরীর যখন মাটিতে মিশাইয়া যাইবে, তখন আপনি কি করিবেন?”
সম্রাট সাজাহান তহত্তরে বলিয়াছিলেন, “প্রিয়তমে যদি তোমার মৃত্যু অগ্রে হয়, আমি তোমার সমাধির উপর এমন এক প্রেমের মন্দির নির্মাণ করিব যে জগতে তাহা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে।”
সম্রাটের এই বাণীর সার্থকতা হইয়াছে। যদি প্রেমের উজ্জল উদাহরণ দেখিতে ইচ্ছা হয়—আগ্রায় গমতাজ মহলে যে সমাধি-মন্দির দর্শন কর, তুমি ধত্তা হইবে এবং শাস্তিহান প্রাণে শাস্তি ফিরিয়া পাইবে।

সেইসকল মসজিদের উপর হইতে যখন আমরা চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া হৃদয় ও মন তৃপ্ত করিতেছি, তখন অদূরে কে গাঙ্গিয়া উঠিল—

“তোরা গণা দিন ফুরায়ে গেল

তবু ভাঙ্গিল না যুম।”

হি হৃদয় স্মৃতি ভাবস্পর্শী সুগভীর সঙ্গীতধ্বনি! কি ভক্তিপূর্ণ সুললিত স্বর! বোধ হইল যেন ভক্তি ও অশ্রু মাথিয়া গায়কের হৃদয় ভেদ করিয়া সে স্বর বহির্গত হইতেছে, যেন অনেক

শুনিয়াছি, কিন্তু এমন ভক্তিপূর্ণ স্বর কখনও শুনি নাই ! এমন স্মৃতিধ্বনি কখনও কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই । গায়ককে দেখিবার জন্ত দ্রুতপদে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নিম্নে অবতরণ করিলাম । চারিদিকে অল্পসন্ধান করিলাম, কিন্তু তাকে দেখিতে পাইলাম না ! মসজিদরক্ষক কয়েকজন মুসলমান ভৃত্য সেই স্থানে দাঁড়াইয়াছিল— তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, গায়ক একজন পাগল, সে কখন কখন এখানে আসিয়া এইরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া যায় ।

গায়ক পাগল ? ভৃত্যেরা বলিল গায়ক পাগল ? পাগলের এরূপ সঙ্গীতশক্তি কোথা হইতে আসিল ? আহা পাগলের স্বর কি সুধুমুখা ! যে দিক হইতে সঙ্গীতধ্বনি আসিয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিলাম । পাগলকে দেখিতে পাইলাম না । আবার দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলাম । দেখিলাম, যমুনার ধারে পাগল ভ্রমর হইয়া আপন মনে গায়িতেছে—

“তোর গণা দিন ফুরায়ে গেল

তবু ভাঙ্গিল না ঘুম ।”

পাগলের আকৃতি দীর্ঘ, মস্তকে রুম্ম জটাতার, দেহ ভার ও শূলাঙ্কুরবিশিষ্ট । কটদেশে একটু ছিন্ন কোপীন ব্যতীত আর কিছুই নাই । সেই কোপীন তার লজ্জা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট মতে ! মুখখানি, সদাই হাসি মাখা—প্রকৃত । কোনও অত্যন্ত স্থান

ও দৈতের চিহ্ন মাত্র তাহাতে নাই । বরষ জন্মান করা কঠিন ! কি সুগোল ভয়াচ্ছাদিত তপ্ত কাঞ্চনের স্রাব সেই বিরাট দেহ । সেই ছাই ভস্মের ভিত্তর হইতেও পাগলের কি যেন একটা সৌন্দর্য্য—কি যেন একটা মাধুরী ফুটিয়া বাহির হইতেছে— বাহা আমাদের মত প্রকৃতিস্থদিগের কখনই দৃষ্টিগোচর হয় না !

লোকটি কি সত্যই পাগল ! হউক না পাগল, তবু ইহার সহিত আলাপ করিব,—একটি গান শুনিব,—ইহার অঙ্গের ছাই, ভস্ম ও ধূলাগুলি মুছাইয়া দিব ! জগতে পাগল নয় কে ? কেহ অর্থের জন্য পাগল, কেহ স্বার্থের জন্য পাগল,—কেহ সম্মান-সম্মতি লইয়া পাগল,—কেহ বা ধর্মের জন্য পাগল, কেহ বা ধর্ম প্রদান করিবার জন্য পাগল । সংসারটা ত পাগলের হাট । যিনি পেটের জন্য ধড়া-চুড়া বাধিয়া ওকালতি করিতেছেন, তিনিও যেক্রপ পাগল—পেটের জালীয়,—স্বার্থের যন্ত্রণায় যে চীৎকার করিতেছে, সেও ভেদনই পাগল । নাম কিনিবার জন্য “দেশোদ্ধার” “দেশোদ্ধার” করিয়া যিনি গগন বিদীর্ণ করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন, তিনিও তক্রপ পাগল । দার্শনিক পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, কবি, গ্রন্থকার, ভাবুক, পর্য্যটক, সকলেই আপনার ভাবে আপনি বিভোয় । সকলেই আপনার ধ্যানে আপনি মগ্ন—বাহ্যজ্ঞান রহিত । বড় হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট পর্য্যন্ত সকলেই যখন একই প্রকারে ঘুরিতেছে, তখন জগতে পাগল নয় কে ?

চিকিৎসাশাস্ত্র বলেন, যাতার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, সেই পাগল; কিন্তু যে মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলিয়া ভাবে সে কি পাগল নহে? যে অনিত্যকে সত্য জ্ঞান করে, সেই ত পাগল। তবে আর কাহাকে পরিত্যাগ করিব?

সংসারে প্রকৃত সত্য বস্তুকে কে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে? কেহই নহে। সবাই ভাবিতেছে, আমরা এই ভবের হাটে চিরদিন বাস করিব! সবাই ভাবিতেছে, জীপুত্র-পরিবেষ্টিত এই সংসারটা আমাদের মোরসী স্বহ। চিরদিন পোষমেজাজে সুস্থভাবে অবিরত ভোগদখল করিতে থাকিব। কেহ কি ভাবিতেছে যে, এই ভবের হাটে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্রয় বিক্রয় করিতে আসিয়াছি, সময় হইলেই হাট হইতে আমাদেরকে পলাইতে হইবে? এ কথা কেহ কি একবারও চিন্তা করিয়া থাকেন? তবে কি করিয়া বলিব যে, তাহারা বিকৃত মস্তিষ্ক বা পাগল নয়? হাটে আসিয়া এই অল্প সময়ে কে কি কেনা-বেচা করিল, তাহার কি কেহ জমাখরচ করে? তাহারা নিজের লাভ-লোকসানের হিসাব রাখে না, তাহারা যদি পাগল না হয়, তবে পাগল কে? এই ভবের হাটে, পাপ ও পুণ্য, দম্ব ও অদম্ব, সত্য ও মিথ্যা, পরের অপকার, পরোপকার, নিঃস্বার্থতা, স্বার্থপরতা, দীনসেবা, দান, ধ্যান, হিংসা, দ্বेष, শঠতা ও চাতুরী সকলই বিক্রীত হইতেছে—তবে এই হাটে কাঞ্চন ফেলিয়া লোকে কাচ পরিদ করে কেন? তাহারা কি পাগল

নয়? পাগল হইয়া বাহারা অশরকে ঘৃণা করে, তাহারাও অদ্বুত পাগল! বাহারা ভবের হাটে পশিত উপাদেয় দেবভোগ্য জিনিষগুলিকে ফেলিয়া, হলহল ক্রয় করিতে ইতস্ততঃ করে না, তাহারা যে ভীষণ পাগল!

পাগল আবার গায়িল :—

“তোর গণা দিন ফুরায়ে গেল

তবু ভাঙ্গিল না ঘুম।”

আমি দৌড়িয়া গিয়া লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“পাগল তুমি কে?”

পাগল হো হো করিয়া অটুহাস্ত করিল। সেই হাস্তে সহসা বৃক্ষ, লতা, পাতা যেন কম্পিত হইয়া উঠিল। আনি সভয়ে একটু পশ্চাতে সরিয়া আসিলাম।

পরক্ষণেই অগ্রসর হইয়া আবার আমি প্রশ্ন করিলাম,—“তুমি কি সত্য সত্যই পাগল?”

আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া পাগল নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমিও পশ্চাৎদ্রাবন করিলাম। সেই জঙ্গল কয়েকটি ক্ষুদ্র, বৃহৎ, ঘন ও নিবিড় বৃক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত। কৈ? এখানে ত পাগল নাই! কোথায় গেল? তবে কি পাগল নাহয় নয়! চারিদিকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছি—আবার সেই প্রাণ-মাতোয়ারা সঙ্গীতধ্বনি অদূরে শ্রুত হইল।

দেখিলাম, জঙ্গলের এক পার্শ্বে যমুনার তীরে,—আকাশের দিকে চাহিয়া পাগল পুনরায় গায়িতেছে—

“তোমার গণা দিন ফুরায় গেলে !”

আমি স্তম্ভিত হইলাম ! চক্ষে ধূলা দিয়া নিমেষের মধ্যে কি করিয়া এত অল্প সময়ে পাগল যমুনার তীরে উপস্থিত হইল !

কৌতূহল বৃদ্ধি হইল ! ভাবিলাম, যেক্রমে পারি পাগলের পরিচয় লইব ! ছুটিলাম,—যমুনার দিকে সেই জঙ্গল লক্ষ্য করিয়া প্রাণপণে ছুটিলাম । পলে পলে আশঙ্কা হইতে লাগিল, পাগল আবার পাছে দূরে পলাইয়া যায় ।

অবশেষে তাহার সাক্ষাৎলাভ ঘটিল । আমি সম্মুখে বাইয়া মিনতি করিয়া বলিলাম—“তুমি যেই হও তোমার যথার্থ পরিচয় দাও । পরিচয় না পাইলে আমি কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়িব না ।”

আবার সেই “হো হো” অটুহাস্ত ! এবার পাগলের হাস্ত-রবে সত্য সত্যই আমার হৃদয় ছুঁ ছুঁ করিতে লাগিল । ভয়ে কি ভক্তিতে জানি না, আমি পাগলের পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলাম ! চীৎকার করিয়া বলিলাম—“আমাকে নারিতে হয় মার ! তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিব না ।”

“তবে সঙ্গে আস” বলিয়া সেইরূপ অটুহাসে গগন বিদীর্ণ করিয়া পাগল কোথায় চলিয়া গেল ! আর দেখিতে পাইলাম না ! আমি কাতরপ্রাণে আকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম, কিন্তু

কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। ভাবিলাম, আমার সাধ্য কি যে উহার সঙ্গে যাইতে পারি। তবে বড় ক্ষোভ রহিল যে, তাহাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পাইলাম না! পাগলের জন্ত সত্য সত্যই আমি বোদন করিতে লাগিলাম। জানি না—কি মন্তব্যে পাগল আমার মন প্রাণ কাড়িয়া লইল! সহসা কেন আগ্রার সেই যমুনা তীরে আমার এই ভাবান্তর ঘটিল।

তাহাকে পাতি পাতি করিয়া খুঁজিলাম,—খুঁজিলাম—সেই যমুনাতীরে,—সেই বৃক্ষলতাসমাকীর্ণ জঙ্গলে, সেই সুদূর প্রান্তরে,—ভগ্ন অট্টালিকায়,—প্রকাণ্ড মহীকুহের পশ্চাতে,—কিন্তু কই তাহার আর সাক্ষাৎ ত মিলিল না। চারিদিকে কতক্ষণ ছুটাছুটি করিয়া খুঁজিয়াছিলাম মনে নাই। যখন সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার আগ্রা নগরীকে বেষ্টিত করিল, তখন আমার জ্ঞান হইল! ভাবিলাম, অপরিচিত বিজন যমুনাতীরে যে রজনীর অন্ধকারে ক্রমশঃ ডুবিয়া যাইতেছি! শেষে কি আগ্রার দম্ভা তঙ্করের হস্তে—বহু জন্তুর কবলে প্রাণ হারাইব? হতাশ অন্তরে কত কি ভাবিতে ভাবিতে সহরে ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু সেই অন্ধকারে কে আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে? অতি কষ্টে ঘোর অন্ধকারে দ্বিপ্রহর রজনীতে আগ্রা-ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আর তিলান্বিত আমার আগ্রায় থাকিতে ইচ্ছা হইল না। ট্রেনের অপেক্ষায় রজনী ষ্টেশনে অতিবাহিত করিলাম।

পাগলের কথা আমার মনোমধ্যে উদ্ভিত হইতে লাগিল । পাগল কি সত্যই পাগল, না কোন অপূৰ্ণ সন্ন্যাসী ! হায় ! যদি সাধুজনের সাক্ষাৎ পাইলাম ; তবে তাঁহার চরণাশ্রয় ভিক্ষা করিলাম না কেন ! এ চিন্তাদাবানল বক্ষে ধারণ করিয়া শান্তির জ্ঞাত দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি ; আর সেই শান্তিরূপ বারি সম্মুখে পাইয়া পরিত্যাগ করিলাম কেন ? তারপর কতদিন অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সেই জ্যোতির্ময়মূর্তি এখনও হৃদিতে পারি নাই ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

আজ প্রত্যুষে তাঁহাকে ঘাপে দেখি, তারপর যে ঘটনা ঘটে, সে কথা পরে বলিতেছি ।

সাগরবালা সহসা চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল “তার পর ?”

“তার পর—সে আজ কতদিনের কথা ; কিন্তু সেই পাগলের জন্ত আমার অধীরতা এখনও দূর হয় নাই ! মুহূর্তের জন্তও তাঁহাকে বিন্মত হইতে পারি নাই ! এখন পাগলই আমার ধ্যান জ্ঞান হইয়াছে ! তাই সাগরবালা ! তুমি প্রাতঃকাল হইতে হয় ত আমার ভাবান্তর দেখিতেছ । আজ কাল ক’ দিন সংসার কোলাহলে পড়িয়া একবার তাঁহাকে বিন্মত হইয়াছিলাম । সংসারের তমঘোরে, অভাবের বৃষ্টিকদংশনে, মোহের অন্ধকারে,—স্বার্থের বিকট আক্রমণে, মানুষ ইহকাল পরকাল ভুলিয়া যায় ! জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছি,—পাপ পুণ্য জানি না, দয়াধর্ম জানি না, নিজের সুখের জন্তই পাগল । তাই আগ্রায় সেই পাগলের কথা কয়দিন বিন্মত হইয়াছিলাম । সংসার এমনই ভীষণ স্থান যে, মানুষ স্বর্গীয় পিতা-মাতাকে কিছুদিন পরে ভুলিয়া যায়,—মরণের আনন্দ আশ্রয়কে ভুলিয়া যায়, আর কিছুর জন্ত না হইক, তাঁহাদের স্মৃতির জন্ত কিছু করে না । অদ্বৈতবিশ্বের সত্যের ভিত্তি দিন

পরেই নবপ্রণয়িণীর সহিত প্রেমালাপ করে। স্বার্থের জন্ত মানুষ সহোদরকে ত্যাগ করে,—উপকারকেরই অপকার করিয়া হৃদয়ের ক্লান্ততার পরিচয় দেয়; স্বার্থের জন্ত বন্ধু—বন্ধুর সর্বনাশ করিয়া বন্ধুত্বের পবিত্র নামে কলঙ্ককালিমা অর্পণ করে। শিক্ষিত যাহারা,—দেশের নেতৃস্থানীয় যাহারা, তাহারা স্বার্থের জন্ত—স্ত্রী-পুত্রের জন্ত দেশকে, সমাজকে, স্বজাতিকে ভুলিয়া কি না করিতেছে? সুতরাং সেই স্ত্রীপুত্রের জন্ত, তোমাদের জন্ত পাগলের কথা কহকিন ভুলিয়া ছিলাম।

আজ আমি প্রত্যাষে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন সেই বিরোধীরা আমেরিয়া-জননীর কুটীরে সেই পাগল বসিয়া আছেন! বামেরিকার জননী রোগে জীর্ণ শীর্ণ! পাগল তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে! আমি যাইয়া তাহাকে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছি—“পাগল তুমি এখানে কি প্রকারে আসিলে—ইহারা তোমার কে?”

আমার প্রশ্নে তাহার আর সে অট্টহাসি, সে চাকলা নাই। হিব, গভীর দৃষ্টিতে কেবল একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

পরকণ্ঠে দেখিলাম, পাগল বৃদ্ধার সেই রোগশীর্ণ মস্তক নিজ ক্রোড়ে উঠাইয়া লইল। তাহাকে কত সাহস-বাক্যে স্তম্ভিত করিল। পাগলের স্নেহের বিরাম নাই—সে দিব্যরাত্র তাহাকে শুশ্রূষা করিতেছে। এমন কি বৃদ্ধার মল মূত্র পাগল ছই হস্তে পরিষ্কার করিতেছে।

প্রভাতে এই স্বপ্ন দেখিয়া আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। পাগলের সেই সৌম্য-মৃদি ধার আর আমার মনে পড়িতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, পাগলকে দেখিবার জন্য পৰ্কত-প্রান্তে বন্ধার কুটারে ছুটিয়া যাই। পরক্ষণে মনে হইল, ইহা মস্তিষ্কের বিকার; কারণ স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র; কিন্তু এতদিন পরে পাগলকে কেন যে স্বপ্নে দেখিলাম এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিলাম না।

স্বপ্ন দেখিয়া উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে প্রত্যাহ্নে ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। কতদূর চলিয়া গেলাম। আমার অগ্রে ও পশ্চাতে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে; কিন্তু আমার গমনের বিরাম নাই, দেহে ক্লান্তি নাই,— সন্তোষান কোথায় তাহারও নিশ্চয়তা নাই। তবুও চলিয়াছি। প্রান্তর শেষ হইয়া গেল, দেখিলাম অদূরে এক পৰ্কত! সেই জনমানবহীন নিস্তরঙ্গ স্থানে উপস্থিত হইয়া হঠাৎ আমি চমকিত হইলাম।

এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে ভ্রমণ করিতে-ছিলাম। সম্মুখে এক অভূতপূৰ্ব পৰ্কত আমার পথ রোধ করিল। প্রকৃতির ইহা বুঝিতে পারিলাম, আমি মধুপুর হইতে ৮ মাইল দূরে আছিরাছি। আমার সম্মুখে “পাথরডা” পাহাড়! বাহারা মধুপুরে আসিয়াছেন, তাঁহারা “পাথরডা” পাহাড়ের নাম শুনিয়াছেন। অনেকে কেবলমাত্র এই পাহাড় দেখিবার জন্য আসিয়া থাকেন। কত যেতান দূর দেশ হইতে এই পাহাড়ে সীকার করিতে আসেন।

বায়ু, ভল্লুক প্রভৃতি অগণিত হিংস্র জন্তু এই পাহাড়ে সদা বাস করে—গুলিয়াছি হুরিগশিঙুলিও পূর্বে পাহাড়ের ধারে ধারে জীড়া করিয়া বেড়াইত। জানি না কেন এখন আর তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

“পাথরডা” পাহাড়ে এখনও সন্ন্যাসিগণ কত দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া থাকেন। কিংবদন্তী যে, এই পর্বত শুক্ল ত্রিকালজ্ঞ, যোগিগণ এখনও তপস্তা করিয়া থাকেন ! এই পর্বত সিদ্ধ সন্ন্যাসিগণের পুণ্যাশ্রম বলিয়া বিখ্যাত। হিংস্র জন্তুর ভয়ে পাপকলুষিত সংসারাত্মিগণ কখন পর্বতারোহণ করিতে সাহস করে না ! মধুপুরে আসিয়া আগোদের লোভে দূর হইতে পর্বত দেখিয়া একটা মহৎ কার্য সাধন করিলাম ভাবিয়া কিরিয়া যায়।

আমি যখন পর্বতের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন মনে হইল, পর্বতের উপর হইতে যোগী ঋষিগণের মুখ-নিঃসৃত যেন পবিত্র ওঙ্কারধ্বনি উখিত হইতেছে—সাম গানে চতুর্দিক যেন সুখরিত হইতেছে। কি শান্তিপূর্ণ স্থান ! মনে হইল, এরূপ পবিত্র স্থান বৃদ্ধি জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও নাই !

“দিবা গেল, সন্ধ্যা এল,

প্রাণটা যেতে নাইকো দেহি।

এই ভেবে রে পাগল হ'লাম

পাগলা বেশে সুরেশ্বরী।”

পর্কত প্রতিধ্বনিত করিয়া,—বৃক্ষ, লতা, পাতা কম্পিত করিয়া
 ক্ষান্ত ভল্লুকাদি বস্তু জন্তকে ভীত এবং সম্ভ্রান্ত করিয়া, গম্ভীর রবে
 দিক্ দিগন্ত মুখরিত করিয়া—সকল সুর চড়াইয়া, পর্কতের শীর্ষ-
 দেশ হইতে অবতরণ করিতে করিতে কে গান্ধিতে লাগিল :—

“দিবা গেল, সন্ধ্যা এল,

প্রাণটা যেতে নাইকো দেরি।

এই ভেবে রে পাগল হ’লাম,

পাগলা বেশে ঘুরে মরি ॥”

এই বিজ্ঞান জনমানবহীন পর্কতে—প্রাণ মন, বিনোদিত করিয়া
 কাহার এই মধুর সঙ্গীত ধ্বনি উখিত হইতেছে ! এ স্বর যে পরিচিত
 বলিয়া বোধ হইতেছে ! যেন কত দিন পূর্বে এই স্বর একবার
 প্রবণের তিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছিল। হায় ! সে যেন
 কত অজীত দিনের কথা ! কোথা হইতে আবার সেই সঙ্গীত রব
 আসিয়া হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলিল।

আকুল নয়নে, ব্যাকুল হৃদয়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম !
 কি ? আমি স্বপ্ন দেখিতেছি ! না সত্যই আমি জাগ্রত ? আমার
 সেই পাগল দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

কি তবে সত্য হয় ? কতদিন কত আশার স্বপ্ন দেখিয়াছি
 আশা ত জীবনে সফল হইল না ! দিনে দিনে, পলে
 করিয়াছি, সেই সব চিন্তা এক হইয়া নব নব

মুষ্টিতে নিদ্রাবোধে দেখা দিয়াছে, কৈ তাহা ত কখন সফল হইল না ! পাগলকে যে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, তাহা কি তবে স্বপ্ন নয় ? পাগলের ইচ্ছা প্রভাবে তবে কি আমি বিরোধী পক্ষতপ্রাপ্তে বৃদ্ধার কুটীরে সমুপস্থিত হইয়াছিলাম ? এ প্রহেলিকা বুঝা আমার জ্ঞান সংসারদগ্ধ জীবের সাধ্যাতীত !

নিমেষের মধ্যে সেই পাগল আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল ! এবার পাগলের মুখে সেই “হো” হো” অটুহাস্ত নাই ! পাগলের মৃগশানি প্রশান্ত—ধীর—স্থির—গম্ভীর ।

পাগল আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—“ভূট দিন তোকে আমার কাছে ডাকিতেছি ! আজ তোরই জন্ত এই পর্বতের উপর অপেক্ষা করিতেছিলাম ।”

একি প্রহেলিকা, তবে কি আমি পাগলের শক্তি প্রভাবে—কোনও অজ্ঞাত শক্তিবলে—নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া—পাথরডা পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি । তবে কি এখানে আমার কোনও স্বাধীনবৃত্তি নাই ! পাগলের দ্বারা চালিত হইয়া অথবা পাগলের আকর্ষণেই আমি কি এখানে আসিয়াছি ! তবে ত ইনি পাগল নহেন ! ইনি কি মহাপুরুষ ! পাগল তাবিয়া কোতূহলের বশবর্তী হইয়া ইঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম ; এখন দেখিতেছি, মহাপুরুষ কৃপা-পরবশ হইয়া আমাকে দেখা দিয়াছেন ! ভক্তি, বিশ্বাস, আনন্দে আমার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না ।

মহাপুরুষের পদপ্রান্তে নত জাহ্নু হইয়া কত কথা বলিয়া
 মনে করিতেছি—শরীরের সমস্ত শক্তি এক করিয়া হৃদয়ের
 ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি ; কিন্তু তাহা পারিলাম না !
 কে যেন আমার বাকরোধ করিয়া দিল। অনিমেষ নয়নে
 মহাপুরুষের পদযুগল পানে চাহিয়া রহিলাম—অজস্র অশ্রুধারা
 আমার বক্ষঃস্থল প্রাবিত করিতে লাগিল। সুন্দর, মহান
 অকল্পনীয় মুহূর্ত্তগুলি চলিয়া যাইতে লাগিল ! সে স্মৃতি কি
 ভুলিবার ? মাহুধের সুসময় জীবনে একবার আসে। স্থায়ী হয়
 কয় জনের ? বাহার স্থায়ী হয়, সেই ভাগ্যবান !

মহাপুরুষ বলিলেন—“তোরা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিব। এতদিন
 তোরা আকাঙ্ক্ষা পূরণের সময় আসে নাই। সময় না হইলে
 কাহারও কিছু পূর্ণ হয় না। আজ হইতে চতুর্থ দিবসের মধ্যে
 বিরোধীর বৃদ্ধার কুটীরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যাঁই—
 বৃদ্ধা বৃত্তান্তখ্যায়—

সব কথা শেষ হইতে না হইতেই, দেখিতে দেখিতে মহাপুরুষ
 পর্কতের উপর উঠিলেন—একবার আবার একবার—এই অধর্মের
 দিকে চাহিলেন। আর দেখিতে পাইলাম না। চক্ষের নিম্নে
 কোথায় অদৃষ্ট হইয়া গেলেন ; হৃদয় অবসন্ন হইল ! হায় কি ভাগ্যা-
 বিকলনা ! এতদিন ধরিয়া যে অমূল্য নিধির অন্বেষণ করিতেছি,
 তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়াও একটি কথা কহিতে পারিলাম না !

সম্মুখে আসিয়া, মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়া, অন্তরালে লুকাইলেন ?
হৃদয়ের দুঃখ-বেদনা জানাইবার অবসর দিলেন না ?

জীবনের অপরাহ্নে আসিয়া উপনীত হইয়াছি । তপনদেব
অন্তমিত হইবার উপক্রম করিতেছেন,—কালনিশা আসিবার আর
বিলম্ব নাই ! এখন উপযুক্ত কাণ্ডারী ব্যতীত কালনিশায় আমাকে
আর রক্ষা করিবার কে আছে ! অথও মণ্ডলাকারে যিনি চরাচরে
দেখু হইয়া রহিয়াছেন, তাহার পাদপদ্ম-দর্শন ব্যতীত এই অপরাহ্ন
জলধি অতিক্রম হইবার আর কোনও উপায় নাই ! বাল্যকাল
ইহাতে কত স্থানে ঘুরিয়াছি—দেশ-বিদেশে গিয়া কত সাধু-সন্ন্যাসীর
চরণপ্রান্তে মস্তক নত করিয়া হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছি—সেই
অজানিত দেখে বাইবার পথ প্রদর্শক কাহাকেও তাইলাম না !
আজ কতদিন ধরিয়া যে মূর্তি অচিরেই হৃদয়ে ধ্যান করিতেছিলাম,
তাহাকে চক্ষুর সম্মুখে পাইয়াও প্রাণ ভরিয়া যে দেখিতে পাইলাম
না ! আর কি আমার অদৃষ্টে সেই মহাপুরুষের দর্শন ঘটিবে ?
“গুরুব্রহ্ম গুরুবিকৃ, গুরুদেব মহেশ্বর” বলিয়া আর কি আমি
তাহার চরণে মস্তক নুত্তিত করিতে পারিব ?

অজস্র দুঃখ ও ব্যথা লইয়া অবসন্নহৃদয়ে আজ পাথরভা পর্বত
ইহাতে কিরিয়াছি সাগরবালা ! কাল প্রত্যবে তুমি মুহূর্তে বিরোধী
পাত্র করিব । বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপতির কাছে প্রার্থনা কর—যেন আমার
অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় । সতীলক্ষ্মী তুমি, তোমার কাতর প্রার্থনা-কি

অপূর্ণ রাখিবেন না ! এতদিন কোন কথা তোমার কাছে বলি নাই ! আজ হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করিয়া সকল কথাই শুনাইলাম !”

অজস্র পরিত্র অশ্রুধারা দম্পতিযুগলের বক্ষঃস্থল প্রাবিত হইতে লাগিল ! বহুকণ উভয়েই নির্ঝাক ও নিষ্পন্দ !

দেখিতে দেখিতে মধুপুরের পশ্চিম গগনে শেষ লোহিতাভা মিশিয়া গেল । সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবার জন্ত ভবরাম গাত্রোত্থান করিলেন ।

তৎপরদিবস ভবরাম যৎকিঞ্চিৎ পাথের লইয়া সাগরবালার নিকট বিদায় লইলেন ।

“হামিন্ ! জীবনের উন্নতির পথান্বেষণের জন্ত বিদায় চাহিতে ছেম—আমি কি করিয়া বাধা দিব ! জানিবেন প্রাণ ভিন্ন কায়া অধিক দিন থাকে না ! বহু বিলম্বে জীবনহীন মাটির কায়া মাটিতে মিশিয়া যাইবে ।

সাগরবালার নয়নে দরবিগলিত ধারা ! তাহার কণ্ঠ বাষ্পপূর্ণ ।

“সাগরবালা ! আমি তোমাকে এতদিন চিনিতে পারি নাই ! এত ধর্মভাব এত মহত্ত্ব তোমার হৃদয়ে ? ভাবিয়াছিলাম, তুমিই আমার পথের কণ্টক ! কিন্তু আজ বুঝিলাম—প্রকৃত সহধর্মিনী ধর্মপথের প্রধান সেতু !

মধুপুরের জ্বলন্ত প্রান্তরে দিগ্ধ শীতল সমীরণ স্বয়ং স্বয়ং শব্দে

বহিতেছে । বিহগকুল উষার মঙ্গল-গীতি গায়িতেছে—সতী
নাগরবালার আঁখিধুগলে ভাবী বিরহ আশঙ্কায় পবিত্র অশ্রু ঝরঝর
করিয়া পড়িতেছে—ভবরামের সাধুদর্শনের প্রবল আকাজক্ষা
জন্মের বাধ ভাঙ্গিয়া ছুটিতেছে—এমন সময় ভবরাম মধুপুরের
বান্ধালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন । ভবরাম যে পথে গেলেন,
নাগরবালা বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মুছিতে মুছিতে প্রহরেক বেলা পর্য্যন্ত
সেই পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

বিরোধীর একটি বৃহৎ পর্বতের অধিত্যকার উপর এক ভীষণ
আশান! রজনী দ্বি-প্রহর। আশানে চিতার অগ্নি ধূ-ধূ করিয়া
জ্বলিতেছে। হতাশন তাহার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া
এক অশীতিপর বৃদ্ধার অস্থিরকালসার দেহ গ্রাস করিতেছে।
বৃদ্ধার এক তৃতীয়াংশ দেহ ভস্ম স্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে,
অবশিষ্ট অস্থি-পঞ্জরগুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।
আশানের চতুর্দিকে বিজন অরণ্য! পর্বতের উপর দীর্ঘাকার-
তরুরাজি এবং উত্তর-দক্ষিণে এক ক্ষুদ্রকায়া পার্বত্য প্রশ্রবণ।
আশানের বামদিকে ঘন সন্নিবেশিত ছোট বড় শাল বৃক্ষগুলি
বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া অরণ্যের মধ্যে বিরাট অন্ধকারের সৃষ্টি
করিয়াছে। বায়ু, ভল্লক, প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ এই সকল
ঘন শাল বৃক্ষের অন্তরালে নিজেদের আবাসভূমি করিয়া
লইয়াছে। আশানের পশ্চিম দিকে বড় বড় পাহাড় মন্তক
উন্নত করিয়া, শত শত বৎসর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার
নীচের নিম্পল-দেহে অবস্থিতি করিতেছে—বুঝি বা যোগী তপস্বি-
গণকে বন্ধে ধারণ করিয়া যুগ-যুগান্তর এইরূপ সগর্বে দণ্ডায়মান
থাকিবে।

শ্মশানের উত্তর-দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত সেই পার্শ্বতীয় ঝরণা আঁকিয়া
 দাকিয়া—কখন বড় বড় উপলব্ধের উপর দিয়া, কল্ কল্
 ঝির ঝির শব্দে, কখন দ্রুতগতিতে, কখনও ধীরে ধীরে, কখন বা
 পার্শ্বতীয় গুল্ম ও জলজের উপর দিয়া সঙ্গোপনে বহিয়া চলিয়াছে।
 কি সুমিষ্ট, সুপেয় বারি। শ্মশানের চতুঃপার্শ্বে ছয় মাইলের মধ্যে
 কোন লোকালয় নাই! ভীষণ স্থান বলিয়া এদিকে কেহ কখন
 ভুলিয়াও পদার্পণ করে না। অদূরে দুইটি বৃহদাকার বজ্র গাভী
 ব্যগ্র কর্তৃক নিহত হইয়াছে—তাহাদের অস্থি, চৰ্ম্ম, রক্ত —
 চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, ইহা অতি অল্প
 সময়ের ঘটনা!

স্থানটা যতই ভয়াবহ ও নিৰ্জন হউক না কেন, তবুও ইহা
 তপোবনের মত পবিত্র। অন্ধকার রজনীর দ্বিতীয় প্রহর প্রায়
 অতীত! পৰ্ব্বতে, কন্দরে, লতায়, পাতায় নিবিড় অন্ধকার
 জমাট বাধিয়া রহিয়াছে! কেবল চিতার আলোকে কিয়দূর
 মাত্র আলোকিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে শালবনাত্যন্তরস্থ হিংস্র
 জন্তুগণ এক একবার ভয়াবহ শব্দ করিয়া উঠিতেছে; যেন
 প্রেতভূমি!! ভয়ঙ্কর স্থান!! সেই ভীষণ স্থানের হিংস্র জন্তুদের
 গর্জন কি ভয়ঙ্কর!

প্রমলিত চিতার পার্শ্বে একজন সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।
 চিতার আলোকে সন্ন্যাসীর তপ্ত কাকনবৎ দেহখানি স্পষ্ট

উজ্জল, আরও জ্যোতির্ময় দেখাইতেছে। সম্মাসীর সর্বদা ভ্রম বিলেপিত, কটিদেশে ছিন্ন বস্ত্রের কোপীন জড়িত। উজ্জল স্নিগ্ধ চক্ষু দুটি হইতে কি যেন এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া চিতাগ্নির উজ্জলতা আরও বৃদ্ধি করিতেছে। প্রশান্ত ললাট,—আজামূলস্থিত বাহু, ক্ষুদ্রীর্ণ জটাবে মস্তক অবনত। বয়স্ক্রম অনুমান করা সুকঠিন! মুখের জ্যোতিঃ দেখিলে মনে হয়, শত শত বৎসরেও বান্ধক্য-রেখা বুঝি এ ললাটে স্থান পাইবে না! এই সংযমী, ব্রহ্মচর্যাপরায়ণ, যোগরত সম্মাসীকে দেখিলে কে না তাঁহার শতাধিকবর্ষ বয়স অনুমান করিবেন? শতাধিক বর্ষের শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, সম্মাসীর মস্তকের উপর দিয়া অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তবু মস্তকের এক গাছি কেশও শুষ্কবর্ণ ধারণ করে নাই। মুখখানি বালকের তায় স্নিগ্ধ, কোমল ও সরলতাপূর্ণ। সম্মাসীকে দেখিলে কখনও মনে হয় যেন, শঙ্করবর্ষীর অবোধ বালক চিতার পাশে বসিয়া আছেন। শোক, হুঃখ, হর্ষ, বিবাদে চিত্র মাত্রও সে মুখে নাই! আবার কখন মনে হয় যে শোক, চুঃখ, হর্ষ, বিবাদ প্রভৃতিকে তিনি উপেক্ষার হাসি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন,—এখন তাহার নিকটে আসিতেও ভয় পায়! কখন মনে হয়, সম্মাসীর হৃদয় ভীষণ বজ্র অপেক্ষাও কঠিন! পরকণে মনে হয় প্রক্ষুটিত সুগন্ধি কুসুমালেকাও বুঝি ইহা কোমল!

সন্ন্যাসীর সম্মুখে একটি যুবতী ধূলাবলুষ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার সুদীর্ঘ কেশগুলি শ্মশানের ধূলা মাখিয়া, নৈশ-সমীরণ কর্তৃক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে! ইহারই পার্শ্বে একজন রোগতাপদগ্ধ সংসারী ব্যক্তি। ইনি বোধ হয় সন্ন্যাসীর কোন ভক্ত বা সেবক! বার বার ভক্তি-পূর্ণ দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর পদযুগলের দিকে তিনি চাহিতেছেন! এই তিনজন এবং বৃদ্ধার অন্ধ-দগ্ধ দেহ ব্যতীত সে স্থলে আর কোনও জন-মানব নাই, যোগরত মহাপুরুষ ব্যতীত কাহার সাধা এই ভয়ঙ্কর স্থানে,—ভীষণ শ্মশানে, দ্বি-প্রহর অন্ধকার রজনীতে দ্বিধাশূন্য হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে?

মৃহ মৃহ হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—“শুন বৎস! এইবার তোমার জিজ্ঞাস্তা বিবয়ের উত্তর প্রদান করিব। এতদিন তোমাকে বলি নাই,—তাহার কারণ বলিবার সময় উপস্থিত হয় নাই! উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ-বপন না করিলে বীজ ধ্বংসের জন্য বপন-কর্ত্তাই অধিকতর দায়ী! আমি আজ শতাধিক বৎসর গুরুর আদেশে সংসারত্যাগী হইয়াও সংসারের ধারে ধারে বিচরণ করিতেছি! গুরুর আদেশ যে কিয়ৎপরিমাণে মন্থকে বহন করিতে পারিতেছি—ইহাতেই আমি আনন্দিত।”

“এখন ভারতে হিন্দু-ধর্মের ভীষণ বিপ্লবের সময়! ইহা ভগবানের অভিপ্রেত! এই বিপ্লবের মুখে আমাদের পবিত্র হিন্দু-ধর্মের

অস্তিত্ব বোধ হয় একবারে কুবিয়া যাইত ; কিন্তু মহাপুরুষদের তপঃপ্রভাব সে বিপ্লবকে বাধা দিতেছে ! কাহার প্রভাবে যে হিন্দু ধর্ম অজের, অমর হইয়া আছে, তাহা সংসারতপ্ত জীব কি করিয়া বুঝিবে ? হিন্দু হইয়া যিনি যতই স্বেচ্ছভাবাপন্ন হউন, তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে, হিন্দু-ধর্মের পবিত্র নিনাদ এক একবার উখিত হইবেই হইবে ।

যে হিন্দু হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে—শিক্ষা ও দীক্ষার দোহে সে যতই নষ্ট হউক না কেন—এক সময়ে না এক সময়ে তাহার হৃদয়ে দিবা জ্ঞানের উদ্যেক হইবেই হইবে ! মুখে সে যতই হিন্দু ধর্মের কুৎসা করুক, ইহার উচ্ছেদ সাধনে যতই চেষ্টা করুক—এক সময়ে তাহার হৃদয়ে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইবেই হইবে । হিন্দুর অস্থি, মাংস, মেদ ও মজ্জার ভিতর দিয়া ধর্মের বীজ প্রবেশ করিয়াছে—আজ সহস্র সহস্র বৎসর হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর বেদ, হিন্দুর সংহিতা, হিন্দুর তন্ত্র, হিন্দুর বিজ্ঞান, জগতে প্রচারিত হইয়া, উজ্জল জ্ঞানালোকে পৃথিবী উদ্ভাসিত করিতেছে । ইহার উচ্ছেদ সাধন করিতে যাওয়া পাগলের কল্পনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? যদিও আজ সেই সকল পবিত্র তপোবন নাই—যদিও আজ ভারতে আর সে সাম গানের মধুর স্বর উখিত হয় না—তবুও ভারত হিন্দুর কন্মভূমি—হিন্দু-ধর্মের আধার স্বরূপ—যদিও অত্যাচার হয় না । স্থল চক্ষে না দেখিতে পাইলেও মহাপুরুষগণের

তপঃপ্রভাব যে অহঃরহ ভারতের বায়ুর সঙ্গে মিশিতেছে, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। ভারতের বায়ু ভারতবাসীর একমাত্র উপযোগী। এই বায়ুর সঙ্গে ভারতবাসী হিন্দু ভারতের নিজস্ব প্রকৃতি লাভ করিতেছে। হিন্দু-ধর্ম ভারতবাসীর নিজস্ব সম্পত্তি। জগতে এরূপ শক্তি নাই, যে শক্তি এই সম্পত্তিকে জয় বা ইহার অপব্যয় ঘটাইতে পারে।

সনাতন হিন্দুধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর যে অবনতি ঘটিয়াছে, কে তাহা অস্বীকার করিবে? ভারতের প্রাচীন রীতি-নীতি সকল মহাতেজা স্বমিগণের শক্তিশালী মস্তিষ্ক প্রসূত। কাহার সাধ্য এই রীতি-নীতির মন্থানুধাবন করিতে পারে? সমস্ত রীতি-নীতিই বিজ্ঞানের সুক্ষ্ম নিয়মের উপর স্থাপিত। বিদেশীর কিস্কৃত-কিমাকার ছাঁচে বাহারা সেই শাস্ত্রত রীতি-নীতিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পুনরায় গড়িতে চায়, তাহারা হয় উন্মত্ত—না হয় একান্ত নাস্ত!

এই প্রাচীন রীতি-নীতিগুলির পরিবর্তনের জন্ত একদল লোক চেষ্টা করিতেছেন—তাহারা ভাবেন কেহই তাঁহাদের প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারিবে না। তাঁহাদের যুক্তি এই যে প্রাচীন রীতি-নীতি যেমনটি ছিল, তেমনটি রাখা উচিত নহে এবং থাকিতেই পারে না; কারণ কালের পরিবর্তনে রীতি-নীতির পরিবর্তনও অনিবার্য। যুগের পর যুগ আসিয়া, ক্রিয়া কন্দ,

আচার-ব্যবহার, শাসন সংস্কার, শিক্ষা দীক্ষা সাধনার পরিবর্তন
 গটাইতেছে ; সুতরাং রীতি-নীতির পরিবর্তনও অত্যাবশ্যকীয় ।
 হিন্দু-ধর্ম বড়ই সনাতন, তাই আজ বিপ্লববাদীদের শত চেষ্টাতেও
 ইহার কোনও ক্ষতি হইতেছে না । হিন্দু আজ আপনার এই
 পুরাতন—পূর্ণসমাজ ও পবিত্র ধর্মকে হারাইয়া পথের কাক্সাল হইয়া
 বসিয়াছে । ইহা কি বাস্তবিকই অধঃপতনের চিহ্ন নয় ? এই
 শতাব্দিক বংশরব্যাপী ঘোর রাজসিক শক্তির সংশ্রবে হিন্দুর এই
 অধঃপতন ঘটিয়াছে । মুসলমান বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতের
 কর্ণধার ছিল এবং তাহার হিন্দুধর্মের উচ্ছেদ সাধনার্থ অনেক
 শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল ; কিন্তু হিন্দুধর্ম যে সুদৃঢ় ভূর্গে প্রতিষ্ঠিত
 ছিল, তাহার প্রস্তরময় প্রাচীরে ইহাদের সমস্ত শক্তি বায়িত
 হইয়াছিল । তারপর সুদীর্ঘ কালের পরাধীনতায় ও পাশ্চাত্য
 জাতির ঐশ্বর্য্য দর্শনে আপনার আত্মমর্যাদা ও সরল-গম্ভব্য পথ
 হারাইল ।

হিন্দু-সমাজ আজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে । কেহ
 কতাকেও মানে না—সকলেই স্ব স্ব প্রধান । যে সমাজে গুণের
 আদর নাই, যে সমাজে গুণানুযায়ী কর্তৃত্বের ভারার্ণণ নাই—সে
 সমাজের এইরূপ চূর্ণদশা হইবে না কেন ?

এই বিপ্লববাদীর দল পাশ্চাত্য কল্প-শ্রোত-প্রবাহে আপনার
 ধর্মকর্ম হারাইয়া ফেলিয়াছে—সে আপনাকে ভুলিয়াছে—আপনার

যাহা কিছু ছিল সবই ভুলিয়াছে ; তাই ইহারা জানে না, হিন্দুধর্ম যে ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, সে ভিত্তি কখনও পরিবর্তিত হইবার নয়। যাহারা পরিবর্তনপ্রয়াসী অথবা যাহারা ভারতের প্রাচীন রীতি-নীতিগুলি একটু আধটু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতেছেন—কেবল তাঁহারাই হিন্দুধর্মের পবিত্র, শুদ্ধ সৌধ হইতে বহু লোজনের পথে পিছাইয়া পড়িতেছেন! ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহা-দিগকে আবার এই পথেই আসিতে হইবে!

আমাদের ধর্ম, সমাজ, রীতি-নীতি যে ভিত্তির উপর স্থাপিত ও গঠিত, তাহার পরিবর্তনের আবশ্যকতা নাই এবং পরিবর্তনও সম্ভবপর নহে। অতএব দেশ ও অতীত সমাজের রীতি-নীতি হইতে আমাদের ভারতের সমাজ ও রীতি-নীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এতটা প্রভেদ বলিয়াই ভারতবাসী হিন্দু আজিও উন্নত—ভগবৎ বিশ্বাসী এবং মুক্তিপ্রয়াসী। এই প্রভেদ আছে বলিয়াই হিন্দু ইহকালকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে না, তাহাদের লক্ষ্য অনেক উচ্চে। হিন্দুরা রাজাধিরাজ হইতে চাহে না—তাহারা ইহা অপেক্ষাও উচ্চ ধরনের সুখ-শান্তি কামনা করে। হিন্দুর যাহা লক্ষ্য—সে যদি তাহা লাভ করিতে পারে, তবে শত সহস্র রাজ মুকুটও তাহার নিকট তুচ্ছ। এই ভারতেই এককালে তাহা হইত। হিন্দুর সেই পুরাতন রীতি-নীতি কি ত্যাগ করিবার জিনিষ! যাহারা ইহা ভাঙ্গিয়াছে বা

ভাঙ্গিতে উদ্ধত, তাহারা হিন্দু সাধনা, সভ্যতা সন্মান সমস্তই লোপ করিতে বসিয়াছে; কিন্তু ইহা ঠিক পতঙ্গ হইয়া মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করার মত হইবে। যাহারা হিন্দুর পুরাতন নিয়ম, শৃঙ্খলা, রীতিনীতি আগ্রহ করিতেছে বা করিবে, এই চুক্কর্ণের ফলে তাহারাই নিরয়গামী হইবে। যাহারা বিজাতীয়ের ভাবে আপনার সমাজ গঠিত করিতে চায়—যাহারা বিধবা কন্যার ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা সহ্য করিতে না পারিয়া, পুনরায় তাহার বিবাহ দিতে চায়—যাহারা ঋষি-নির্দিষ্ট বিবাহের বয়স পরিবর্তন করিতে চায়—যাহারা শূদ্র হইয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে সাহসী হয়—তাহারা কখনও মনে মনে চিন্তা করে না যে, তাহার এই কল্লিত সংস্কারগুলি একদিন তাসের ঘরের মত সব পড়িয়া যাইবে। অজগর হিন্দু সমাজ কখনও নীরবে এ অত্যাচার সহ্য করিবে না—একদিন তাহার বিশাল দেহে সামান্য মাত্র চাক্ষুশ্য উপস্থিত হইলেই, এই বিপ্লববাদীর দল ফেরুপালের ছায়া দূরে পলায়ন করিবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন কখনও হইতে পারে না। হিন্দুসমাজে সত্যের আদর ছিল—হিন্দুধর্ম্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; সুতরাং সমাজে ও হিন্দুধর্ম্মে চিরকাল সত্যের আদর অক্ষুণ্ণ থাকিবে। মাতঙ্গের ছায়া শক্তিশালী হিন্দুধর্ম্মের কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। বিদেশীয় ভাব ও কুহকের বশবর্ত্তী হইয়া, যাহারা উহা অনুকরণ করিয়া আমাদের পূর্ব্ব রীতিনীতি-

গুলি ত্যাগ করে, তাহাদের অধঃপতনের নিমিত্ত পুণ্যাশ্রয়ণ হুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন ও তাহাদের উদ্ধারের জন্ত সত্য সত্যই তাহারা বিচলিত হ'ন। ইহাতে যে কেবল অনাচারীদেরই ক্ষতি হইতেছে, তাহা নহে, ইহাতে ভারতের ক্ষতি ও সর্বনাশ হইতেছে। এই অমঙ্গল নিবারণার্থ মহাপুরুষগণ সততই সচেষ্ট। বাবা! আজ এই নির্জন মহা শ্মশানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, যেন কখনও ভারতের প্রাচীন রীতি-নীতি ত্যাগ করিবার তোমার প্রবৃত্তি না হয়! সেগুলি অতি মহান! কোন দেশে,—কোন জাতির মধ্যে, কোন সমাজের মধ্যে, তাহা খুঁজিয়া পাইবে না।”

“তোমরা যে দেশের—যে সমাজের অনুকরণ করিতে চাও, সে দেশের সকলেরই মধ্যে রাজসিক ভাব প্রবল। তাহাদের দেশে ও সমাজে কেবল পার্থিব বস্তুর জন্ত মারামারি, কাটাকাটি,—যুদ্ধবিগ্রহ ও আত্মকলহ। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত কেবল অহংরহ সমর সজ্জা! কেবল পার্থিব বস্তু ‘অর্থ অর্থ’ করিয়া, কেবল বৃথা ঐতিক সুখের অন্বেষণে—জীবন-সংগ্রামে তাহারা নিম্পেষিত! অনেকেই আবার চির বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। এই জন্তই ভারতের মত সে-সব সমাজে একাদ্ব্যবর্তী পরিবার* প্রথা নাই—আছে পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি বাহ্যভূষণের বাহুল্যতা! ভারতের এক সম্প্রদায়ের লোক যে দেশের ও যে সমাজের অনুকরণ করিতে বাইতেছে,

সেই অনুকরণের ফলে তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদের বাহুল্যতা ঘটিতেছে, ভারতের পবিত্র একান্নবর্তী প্রথা ত্যাগ করিতেছে, হিন্দুর পবিত্রতা, সংযম ও সাধনা হারাইতেছে, বিদেশীয় সভ্যতার চাপে হিন্দুর বিশেষত্বকে তাহারা বাচাইয়া রাখিতে পারিতেছে না । হিন্দুর ধর্ম-কর্ম, চিন্তের ঔদার্য্য, চরিত্রের দৃঢ়তা নষ্ট হইতেছে ! একান্নবর্তী প্রথার গুণে যে ভারতবাসী সংসার-দুর্গে বসিয়া যুগ-যুগান্তর অবিরাম বুদ্ধ করিয়া উন্নতির দিকে উঠিতেছিল,—যে হৃর্ভেদে দুর্গে বসিয়া তাহারা দান, ধ্যান, পরোপকার, অতিথি-অভ্যাগতের সংকার, তপস্ব, দৈত্য, কুটুম্ব, আশ্রিত, দূর বা নিকট আত্মীয়গণের ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পূজা, হোম, ভগবৎ চিন্তা, প্রভৃতি সংসারাত্মকের কর্তব্যগুলি পালন করিয়া আসিতেছিল—সেই দেশ ও সমাজ আজ কোন্ দেশের বা সমাজের রীতি-নীতির অনুকরণ করিতে যাইয়া নষ্ট হইল ? ইহা অপেক্ষা সংসারাত্মকের উৎকৃষ্ট আদর্শ অবনীমণ্ডলে আর কোথায় কোন্ দেশে তাহারা পাইবে ? তবে কোন্ প্রলোভনে তাহারা ইহা ত্যাগ করিল । তাহারা যে দেশের রীতি-নীতি দূর হইতে চাকচিক্যবৎ দেখিয়া ধরিতে যাইতেছে, সে সমাজ দ্বঃস্ব, জরাজীর্ণ জনক-জননীকে ভরণ পোষণ করা কর্তব্য বলিয়া মনে করে না,—বিবাহ করিয়াই পিতামাতা ও আত্মীয়বর্গকে ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র গৃহে স্ত্রী-পুরুষে বাস করা অসুচিত বলিয়া বিবেচনা করে না—ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের

কি এই আদর্শ অনুকরণীয় ? ভাবিলে সত্য সত্যই হৃৎকম্প উপস্থিত হয় । বাহারা কেবল নিজ নিজ সুখ স্বচ্ছন্দতা ও পার্থিব নশ্বর দেহের ভোগ সাধনের জন্ত ইহকালকেই সর্বস্ব নানে করে, সেই দেশের আচার-ব্যবহার হিন্দু অনুকরণ করিবে ? আমাদের পূর্ব পিতৃপিতামহগণ যে আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি পালন করিয়া গিয়াছেন, সেই সব মহান্ আদর্শ ত্যাগ করিয়া, চাকচিক্যময় ভঙ্গপ্রবণ আদর্শ কেন ভারতবাসী গ্রহণ করিবে ?

বাবা ! আমাদের প্রাচীন রীতি-নীতি কি ত্যাগ করিবার জিনিষ ? হিন্দুগণ প্রাণ বিদর্জ্ঞন দিয়াছেন, তবু মিথ্যা কথা কখনও বলেন নাই, কিংবা আশ্রিতকে পরিত্যাগ করেন নাই । আমাদের এই ভারতেই পিতৃসত্য পালনের জন্ত রামচন্দ্র চতুর্দশ বৎসরের জন্ত বন গমন করিয়াছিলেন ! নারীধর্ম রক্ষার জন্ত অগণিত সতী, জলন্ত চিতায় হাঁসিতে হাঁসিতে তনু ত্যাগ করিয়াছেন । যদি সত্য ধর্ম থাকে ত ভারতেই আছে,—যদি সতী ধর্ম থাকে ত এই ভারতবর্ষেই আছে ! ভারতের রমণীগণ পতিকেই সর্বস্ব জ্ঞান করিয়া থাকেন । তাঁহাদের পতিই একমাত্র দেবতা—একমাত্র অঙ্গের ভূষণ—একমাত্র বন্ধু । তাঁহারা এই পতি দেবতাকেই কার্যমনোবাক্যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও যত্ন করিয়া থাকেন । তাঁহারা ভোগ, ঐশ্বর্য্য, ও সুখের স্পৃহা না করিয়া কেবল পতিকেই অভিলাষ করিয়া থাকেন । এমন নিকাম স্বামী-ভক্তি আর কোথাও

দেখিতে পাইবে কি? এই ভারতেই সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, শৈব্যা, ভদ্রা, চিত্তা, প্রভৃতি আকীরমণীগণ সতীকুল শিরোমণি বলিয়া আজিও হিন্দুদিগের নিকট অতীত হইয়া থাকেন। পৌরাণিক যুগের কথা ধরিলেও রাজপুত্রনা ও বঙ্গদেশের ইতিহাস পাঠ করিলে শত সহস্র আদর্শ সতীর জলন্ত উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কে অপর দেশের এরূপ একটি আদর্শ দেখাও দেখি। এই ভারতই কেবল জানে যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সব শেষ হয় না। মৃত্যুর পরেও আনাদের স্বতন্ত্র কর্ম থাকে। তাই হিন্দুরা ঐহিকটাকেই সর্বম্ব বলিয়া ভাবিতে পারে না। হিন্দুরা জানে, সংসারে তা'রা ছুদিনের অতিথি মাত্র। সকলেই নট ও নটীর স্থায় সংসার-রঙ্গভূমিতে ছুদিনের নিমিত্ত অভিনয় করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অভিনয় শেষ হইলেই, গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইয়া সকলেরই জীবনে বরনিকা পড়িবে। হিন্দু এই কথা জানে, হিন্দু এই কথা মানে, তাই সকলে সাংসারিক ধর্ম পালন করিয়াও আবার একটা কর্মের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। সকলেরই লক্ষ্য এক—সকলেরই কর্ম এক। তবে শিক্ষা-দীক্ষার দোষে কোথাও বা বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তাই এই সব আদর্শ ভারতেই সম্ভবে। যাক সে কথা। এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব; কিন্তু তোমার দ্বিজ্ঞাসা করি—“তুমি সংসারে বাইতে অধীকৃত কেন?”

সেই সংসার-ভয়ে ভীত ব্যক্তি কাতর বচনে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, ভক্তিগদগদচিত্তে নতজানু হইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিল :—

“গুরুদেব ! সংসার জ্বালায় প্রচণ্ড মার্ত্তগুতাপে তনু দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সংসারে যে সুখ, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আবার আমাকে কেন সেই স্বার্থের কোলাহলপূর্ণ ওষম সংসারে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিতেছেন। আর আমার সেই রোগ-শোকপূর্ণ, হাহাকারময় সংসারে যাইবার বাসনা নাই ! আপনার পদাশ্রয় লাভ করিয়া, আমি জীবনের গন্তব্যপথের সন্ধান পাইয়াছি। আমি আপনার অমৃতময় বাক্যে সেই আনন্দনয়, অমৃতময়ের সন্ধান পাইয়াছি। আমাকে আর পরিত্যাগ করিবেন না। আনার জীবনের এখন অপরাহ্নকাল উপস্থিত ! সংসারের সুখ হাড়ে হাড়ে ভোগ করিয়াছি ! এখনও কি আমার ভোগের,—কৰ্ম্মফলের অবসান হয় নাই গুরুদেব ?”

সন্ন্যাসী মুহু মুহু হাসিয়া বলিলেন :—

“বৎস ! কৰ্ম্মেরও অবসান নাই, কৰ্ম্মফলেরও ক্ষয় নাই। সে বহু দূরের কথা ! কত যুগ-যুগান্তরের পর যে, সে দিন আসিবে তাহা আমি হৃদয়ে এখনও ধারণা করিতে পারি না। তুমি আজই বাবা কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফলের শেষ দেখিতে চাও ! সংসার ত্যাগের সময় তোমার হয় নাই ! বাহারা প্রকৃত সংসারী, তাহাদের কাছে মার্ত্তগুতাপে দগ্ধ হইতে হয় না,—তাহারা কখনও স্বার্থের

কোলাহলে আত্মবিস্মৃত হয় বা,—রোগ-জ্বালা হাহাকার ধ্বনিও তাহারা কখন শ্রবণ করে না। জীবনের অপরাহ্ন সায়ান্ন নাই,—অনন্তকালের সহিত এই জীবন সংশ্লিষ্ট। বৎস! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি প্রকৃত সংসারী হও। যাহারা প্রকৃত গৃহী বা সংসারী, তাহারা কৰ্ত্তব্যবোধে কৰ্ম্ম করিবে; কিন্তু কৰ্ম্মকালের আকাজ্ঞা রাখিবে না। সুখে বা দুঃখে কখন মুহমান হইবে না! অচল, অটল মহীৰূহের ত্রায় গৃহীকে সংসার-প্রাস্তরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। শাখা, প্রশাখা পল্লব ও ঘন পত্র বিশিষ্ট মহীৰূহের বাহ্যাকৃতি দেখিয়া মানুষ যেরূপ তাহার দুঃখের চিহ্ন মাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না; গৃহীকেও তদ্রূপ হইতে হইবে। কখন প্রবল ঝড়াবাতে শাখা-প্রশাখা ভগ্ন হইবে,—কখন বজ্র পতনে ঝলসিয়া যাইবে,—কখন বা প্রচণ্ড মার্ত্তও তাপে পত্র শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িবে; কিন্তু মহীৰূহের ত্রায় অচল ও অটল হইয়া উদ্ধ মস্তকে, আকাশের দিকে, ভগবানের পানে গৃহীকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে। অজ্ঞদিকে সে কখন দৃকপাত করিবে না। বৎস! যোগ বিয়োগই সংসার! তাহাতে মুহমান হইলে চলিবে কেন? কঠোর হইয়াও বাহ্য কৰ্ত্তব্য, তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রচণ্ড মার্ত্তও-তাপে-তাপিত পথিক পিপাসু হৃদয়ে যেরূপ লোকালয়হীন মরু প্রাস্তরে বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রান্তি দূর করে, গৃহস্থাত্রনীও তদ্রূপ দীন, আতুর, বিপন্ন, অভাবগ্রস্তকে আশ্রয় প্রদান

করিবে। যদি প্রকৃত সংসারী হইতে চাও, তবে তোমার হৃদয়ে যেন কখন মিথ্যা বা কপটতা স্পর্শ না করে। গৃহীর পক্ষে “প্যাটোয়ারি” বুদ্ধি মহা পাপের কারণ! কথায় বলে, সহস্র ক্ষতি হইলেও হৃদয়ের ভাব, মুখে বাক্য করিবে! ‘মনকে কখন আঁধি ঠেরিও না!’ তাহা হইলে তোমার মনুষ্যত্ব একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে। সকলের অন্তরেই স্বয়ং ভগবান—নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন। অতএব বিবেকের বশবর্তী হইয়া চলিবে। প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমীর কাছে সন্ন্যাসদর্শ্যও লজ্জা পায়! সংসার হইতেই সন্ন্যাসীর জন্ম! তবে বিদেশী ভাব ও রীতি-নীতি অনুকরণ করিয়া, আজকাল যে সব সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে, সে সব সংসারে কখন সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করে না—বা করিবে না! সে সব সংসারে চশমাপরা বিলাসী বাবুর উৎপত্তি হইতেছে। তাহারা কয়েক বৎসরের পাশবিক লীলা সংসারে সীমাবদ্ধ রাখিয়া কাল-স্রোতে ভাসিয়া পড়িবে। জগৎ বিন্দুমাত্র তাহাদের দ্বারা উপকৃত হইবে না।”

সন্ন্যাসী কথা শেষ করিয়া, চিতায় ঢুই একটী গুড় কণ্ঠ প্রদান করিলেন। পরে সেই যুবতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—“হতভাগিনী! এখনও তোমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল না। তবে ঘুমাও, আরামে নিদ্রা যাও, এই অচৈতন্য অবস্থায় তোমার প্রাণে শান্তি ফিরিয়া আসিলেও, আসিতে পারে।”

সেইভক্ত পূর্ববৎ অশ্রুপূর্ণনয়নে করলোড়ে বলিল,—“দেব ! আমাকে পুনর্ব্বার সংসারে বাইতে আদেশ করিতেছেন সত্য, কিন্তু কি করিয়া প্রকৃত সংসার স্বৰ্ণ পালন করিব ? বিদেশী শিক্ষা-প্রভাবে ও বিজাতীয় ভাষামুগ্ধকরণে আপনার কথিত হিন্দুর সংসার এখন আর নাই। গোড়া হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খৃষ্টান এই চারি জাতির ভাব, রীতি, নীতি ও ধর্ম্মের সংমিশ্রনে হিন্দুর সংসার এখন খিচুড়ীর পাকে দাঁড়াইয়া, আঁকিয়া বাইবার ন্ত হইয়াছে। প্রাচীন রীতি-নীতি সম্পূর্ণভাবে পালন করিবার সুযোগ বা সুবিধা নাই। সংসার প্রতিপালন করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন; কিন্তু পূর্ব্বের রীতি-নীতি সংসারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, অধিক অর্থের প্রয়োজন হয় না এবং সে অর্থ সত্য, সততা ও জায়ধর্ম্মের দ্বারা লাভও হয়, ইহাও সত্য, কিন্তু এই সমস্ত লোকের সম্পর্শে বা সংশ্রবে না থাকিলে অথবা ইহাদের সহিত আদান-প্রদান না চলিলে আবার সংসার রক্ষা বা অর্থোপার্জন হইবে না ! বিশেষতঃ সংসর্গ একটি ভয়ঙ্কর জিনিস ! কুসংসর্গে নিজ চরিত্র রক্ষা করা কেবল যে কঠিন তাহা নয়, নিজ গন্তব্যপথে চলিতে পদে পদে তাহাদের কাছে অপদস্থ ও ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে। মনে করুন, সংসার রক্ষার জন্য কোন কারণে আমাকে হয় ত কোনও রাজকর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। আমি দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া

তাহার নিকট গমন করিলে, হয় ত তিনি স্বেচ্ছায় নাসিকা কুণ্ঠিত করিবেন। আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা দূরের কথা, একটি কথা শ্রবণ করিবেন না, অধিকন্তু তাহার দাববান-হস্তে অন্ধচক্র লাভ করিয়া আমাকে অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে।”

সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“বাবা! এতটুকু সত্যিকার, সত্য কথা। তাহা হইলে তুমি প্রকৃত সংসারী কি করিয়া হইবে? পূর্বেই ত বলিয়াছি যে, অচল, অটল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কৰ্ত্তব্যবোধে কার্যা করিয়া যাইবে। ফলাফলের দিকে দৃষ্টি রাখিবে না! নয়পদে যাইয়া যদি তোমাকে লাজিত, অপদস্থ ও বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়, তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই! প্রাচীন রীতি-নীতি ভারতের দরে দরে পুনঃপ্রচলিত হইবে, ইহা কব সত্য; কিন্তু বৎস! সকলেই যদি বলে, “বিদেশী ভাবস্রোতে তখন সকলেই ভাসিতেছে, তখন আমি একা স্রোতের বিপরীতে কি করিয়া সম্ভরণ দিব?” তাহা হইলে মহাস্বাদের চেষ্টা বে পণ্ড হইয়া যাইবে! একাই তুমি যদি বিপরীত-স্রোতে সাঁতার দিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে দলে দলে ভারতবাসী তোমার পুণ্যজীবন করিবে। লোকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেশভূষা দেখিয়া প্রথমে উপহাস করিয়াছিল; কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হ’ন নাই। এই পোষাকের জন্ত তিনি কতস্থানে, কত প্রকারে অপমানিত ও লাজিত হইয়াছেন, তবুও তিনি তাহার

সংকল্প এক দিনের জন্তও পরিত্যক্ত করেন নাই। ইহারই ফলে আজকাল “বিদ্যাসাগরী চাদর” ও “চটী জুতার” প্রচলন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সমাজের সংস্কার প্রভৃতি কিছু আবশ্যক হইলেই সকল সময়ে, সকল যুগে মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া লোক শিক্ষা দিয়া থাকেন। বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণ দেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কি সেই সময়ের জঘন্ত স্রোত কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্তিত করিতে পারেন নাই? অবশ্যই একথা তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না। তাই বলিতেছিলাম যে, সমাজের একটা পরিবর্তন ঘটিবেই যটিবে—সে দিনের আর বিলম্ব নাই।”

“আজকাল দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বিলাসিতার পক্ষিল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন, একথা সত্য এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই দেশের লোক সর্বনাশের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে! যাহারা বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত,—যাহারা বিদেশী শিক্ষায় দীক্ষিত,—যাহারা বিদেশী ভাবের ভাবুক,—পাখিব বস্ত্র লাভের জন্ত যাহাদের বুকে অহরহঃ চিতার আগুন জ্বলিতেছে,—ভারতের বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা যাহারা কখনও স্পর্শ করে না,—সংঘম আচার কাহাকে বলে যাহারা জানে না,—বিলাস ভোগেচ্ছা অহরহঃ যাহাদের হৃদয়ে জাগরুক,—স্বার্থত্যাগের মধুরতা যাহারা কখনো আনন্দ পায় নাই,—বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত

সাহারা দেবতার প্রসাদ জ্ঞানে গৃহে বাহিরে ত্যাগ করিতে পারে না, তাহারাই ত এখন দেশের নেতা ও পথ-প্রদর্শক । বিষবৎ ইহাদের সংসর্গ সর্বদা ত্যাগ করিবে ! ইহাদের কার্ণোর বা হাব-ভাব পোষাক-পরিচ্ছদের কেহ যেন কখন কল্পনাতেও অনুকরণ না করে ।”

“বৎস ! ভারতের প্রাচীন রীতি নীতি মানিয়া চলিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও । সেই প্রাচীনভাবে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিবার চেষ্টা কর—গৃহে গৃহে ভারতের সেই প্রাচীন রক্ষচর্যা ও সংঘম প্রতিষ্ঠিত হউক,—দেখিবে অচিরে নগ্নপদে, দীপ্তপাতঞ্জল, ও বেদ-বেদাঙ্গ হস্তে লইয়া ওঙ্কারধ্বনি ও দামগান করিতে করিতে পর্বতগুহা হইতে তোমাদের দেশ-নেতৃগণ আগমন করিবেন । আবার এই ভারতভূমি অতীতের যোগভূমি হইয়া উঠিবে—বরে বরে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে,—তৃপ্ত, দৈন্ত, হাহাকার ধ্বনি,—ভূভিক্ষ মহামারি অশাস্তি প্রভৃতি তিলাঙ্কের জন্তও এ দেশে স্থান পাইবে না । ধর্ম্মবলের নিকট কোনও বল দাঁড়াইতে পারে না ।”

উর্দ্ধে অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া ছুইখানি শুষ্ক কাষ্ঠ পুনরায় প্রজ্জ্বলিত চিতায় নিক্ষেপ করিয়া সম্মাসী বলিলেন—

“বৎস ! তোমার পিতা কি ভাবে সংসারে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি অবগত আছ ?”

ভক্ত অশ্রাসিক্ত নয়নে উক্ত করিল :—

“দেব ! আমি যখন বালক, তখন তিনি নিতাপানে গিয়াছেন তাঁহার চরণ-দর্শনের সুবিধা বা সুযোগ আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই।”

“তোমার পিতৃপিতামহের চরিত্র কখন কি জানিবার চেষ্টা করিয়াছ ?”

“না গুরুদেব।”

“বৎস ! কেবল তুমি বলিয়া নয়—আজকাল কেহই তাহা কহে না ! এই জগৎই দেশের এতদূর অধঃপতন ! পিতৃপিতামহ কি ভাবে জীবন-গাপন করিয়া গিয়াছেন, লোকে যদি তাহা জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিত,—পূর্বতন মহাদুঃখের অগাধ অনন্ত শাস্ত্রগ্রন্থ যদি একবার পাঠ করিত, তবে কি তাহার বিদেশী আচার-ব্যবহারের বাহ্যিক চাকচিকা দেখিয়া, এত শীঘ্র আকৃষ্ট হইত ? ঘরের দেবতাকে বাহারা কখন ভক্তি করিতে পারে না,—শালগ্রাম শিলাকে বাহারা ‘পাথর-ভুড়ি’ বলিয়া দ্রব্য করে,—পৌত্তলিক বলিয়া বাহারা স্বজাতী ও পিতৃ-পুরুষকে ঘণার চক্ষে দেখিয়া থাকে, তাহাদের দুর্দশায় শূণ্য কুকুর ক্রন্দন করিবে, ইহা কি বিচিত্র ? ভারতের অগাধ শাস্ত্রগ্রন্থ,—বাহার ভাব গ্রহণ করিতে অল্প জাতির যুগ-যুগান্তর কাটিয়া যাইবে, তাহারা স্বাদ গ্রহণ না করিয়া, অর্থোপার্জনীর জন্ত বাহারা পক্ষম বধ হইতে

বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে ধাবমান হয়, তাহাদের পরিণাম
 যে ভয়াবহ হইবে, ইহাও ত স্বাভাবিক ।

“বৎস ! তোমার পিতৃদেব আমার অপরিচিত ছিলেন না ।
 তাহার পুণ্য-কাহিনীর কিয়দংশ এই মহাশয়শানে বসিয়া আজ
 তোমাকে শুনাইব ।”



অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

সন্ন্যাসী আবার একখানি শুক কাষ্ঠ প্রজ্জ্বলিত চিতায় নিষ্ক্ষেপ করিলেন। একবার উজ্জ্বল আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন পরক্ষণেই ভক্তের মুখের দিকে একবার চাহিলেন। আবার কিয়ৎক্ষণ আকাশের দিকে উজ্জ্বল চক্ষু ছুটি স্থাপিত করিলেন। সেই বিশাল আঁখিদ্বয় জলভারাক্রান্ত হইল। বুঝি কত পূর্ব ঘটনা, কত পুরাতন স্মৃতি সন্ন্যাসীর মনে উদ্ভিত হইয়া তাঁহাকে উদ্বেলিত করিতেছে।

অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে ভক্তের দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন--

“শুন বৎস ! সে আজ কিঞ্চিৎদিক পঞ্চাশ বৎসরের কথা। এই সময়ের মধ্যে ভারতের এবং হিন্দুর যে সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে—আমার গুরুদেব বলেন, কোন দেশে কখন এরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে হিন্দুর যে ধর্মভাব ছিল, ব্রাহ্মণের যে ব্রহ্মত্ব ছিল, যে ব্রত, নিয়ম ও সংযম ছিল, এখন আর তাহা নাই। পুণিয়ার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীকে হটাৎ যেন অমানিশার অন্ধকার আসিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। আরও কত দিন যে ভারতের সেই ধর্মের স্মৃতি

ঢাকা থাকিবে, তাহা ভগবানই অবগত আছেন। আমাদের পিতৃপুরুষ সেই প্রাচীন ঋষিগণের ধর্মের মূলধন—বড় লোকের বিলাসী ছেলের মত পাপশ্রোতে গা ভাসাইয়া আমরা যেন এক-দাবুই কুংকারে উড়াইয়া দিয়া পথের কান্দাল হইতে বসিয়াছি।” বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী ভাবাবিষ্ট হইলেন, চক্ষু দিয়া প্রবলবেগে দৃশ্য বহির্গত হইতে লাগিল, কিরংকণপরে প্রকৃতিস্থ হইয়া সন্ন্যাসী পুনরায় বলিতে লাগিলেন :—

“আসিবে আবার ফিরিগা আসিবে! আমার গুরুদেবের বাণী মিথ্যা হইবার নয়। ভারতে আবার আৰ্য্যধর্মের বিমল জ্যোতি ফুটিয়া উঠিবে! বিসর্জনের বাস্তবের পর আবার আগমনীর বাস্তব-ধ্বনি হয়, ইহাই জগতের নিয়ম! নগ্নপদে নগ্নগাত্রে ব্রাহ্মণগণ আবার বেদগান করিবে। বিলাসিতা পরিবর্জন করিবে, পাশ্চাত্য মোহ দূর হইয়া যাইবে।”

হুগলি জেলার সারাটি গ্রামে তোমার মহাত্মা পিতা জনগণকে করেন। সারাটীর সুদীর্ঘ দশ ক্রোশব্যাপী প্রান্তব্য হরিদ্বর্গ শব্দে পরিপূর্ণ থাকিয়া “সুজলা সুকলা” নামের সার্থকতা সম্পাদন করিত। ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলপথের কল্যাণে সে মাঠ তখন বর্তমানের শ্মশানভূমিতে পরিণত হয় নাই। এখন যেমন মালেরিয়া-ব্রাহ্মসী করালবদনে সারাটিকে গ্রাস করিয়া ধ্বংসের পথে ভাসাইয়া দিয়াছে, তাহার তীব্র হলাহলে কলঙ্করিত

হঠাৎ মৃত্যুর ক্রোড়ে গ্রানবাসী ঢলিয়া পড়িয়াছে, তখন সে প্রকার হয় নাই। তখন স্কলেট নীরোগ দেহ ও অটুট স্বাস্থ্য লইয়া বীরদর্পে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হইত। স্কলেট জ্ঞানী অবস্থায়, স্বদেশে থাকিয়া, সহস্ত্র-রোপিত ধাত্রে সংসার দম্ব মর্কাত করিত! পূজা, হোন্ধু দান, ধ্যান, অতিথি সেবা, ব্যাং মাসে হিন্দুর তের পার্বণ প্রত্যেক গৃহেই অনুষ্ঠিত হইত! তখন কার হিন্দুর সংসার এখনকার মত স্নেহের সংসার ছিল না।”

“তখন ইংরাজী শিক্ষার বেশ প্রচলন হইয়াছে। তোমার পিতামহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি জীবিত থাকিতে বাংলা ভাষাকে ও ইংরাজী গুস্তক স্পর্শ করিতে দিবেন না। তিনি বলিতেন আনাদের হিন্দুর যে শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, তাহার শতাংশের এক অংশও সারাজীবনে যখন শেষ করিতে পারা যায় না, তখন আবার অপরের ভাষা শিক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? কেহ কেহ বলিতেন—“বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজী বিদ্যা যে অথকরী বিদ্যা, ইংরাজী শিক্ষা না করিলে সম্ভান-সম্ভতি কি প্রকারে জীবিক উপার্জন করিবে?” তোমার পিতামহ রোষকমায়িত নৈত্রে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেন—“অর্থই কি জীবনের সার বস্তু? আনাদের অয়ঃকাস্ত নগি স্বরূপ অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ ত্যক্তির রাখিয়া, অল্প অর্থের জন্য লালায়িত হইবার প্রয়োজন কি? অর্থই জীবনের মুখের জন্ত? কিন্তু অনন্ত মুখ, অনন্ত স্বাস্থ্য, অনন্ত জ্ঞান—এই জীবনের

ননি পুঁথির ভিতরেই আছে। যে সব কুলদ্বার অর্থকরী
 বিদ্যার দিকে ছুটিতেছে, দেখিবে ভবিষ্যতে তাহারা হা অথ হা অর্থ
 করিয়া আত্মসম্মান, প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি, কুলশীল সকলই জলাঞ্জলি
 দিবে। এক মুষ্টি অন্নের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ শুদ্রোচিত কার্য্য করিতেও
 বিরত হইবে না। উদরারের নিমিত্ত অস্পৃশ্য জাতিরও তোষামোদ
 করিবে; কিন্তু কিছুতেই তাহাদের সে আশা তৃপ্ত হইবে না।
 ঢাকরী, ভিক্ষা, ইত্যাদিতে কিছুতেই তাহাদের বায় সম্বলান হইবে
 না—তখন আবার ঋণি-প্রণোদিত হইয়া পুরাতন পথে ফিরিয়া
 আসিবে। লাঞ্ছনা, অবমাননা ও আশাভঙ্গে তাহাদের চৈতন্য
 আবার ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু সহজে ইহা বটাবে না। মানিক
 মৃত্যু স্ননিশ্চয় জানিয়াও পতঙ্গবৎ অগ্নিতে কম্প প্রদান করিবে—
 তাহারা বংশগৌরব, জাতির গৌরব, হিন্দুত্ব ঐ বিদ্যার স্রোতে
 তাসাইয়া দিয়া পিতৃপুরুষের জ্ঞান ও ধন্যে, কালিনা লেপন করিবে—
 তাহারা আয়ু স্বাস্থ্য, বল, সমস্তই বিসর্জন দিয়া জগতের নিকট ভিক্ষা
 প্রার্থী হইবে। কেহ বাক্ সর্ব্বস্ব হইবে, কেহ গিণ্যা কথার বিপণী
 খুলিয়া ইহকাল পরকাল বিসর্জন দিবে! কেহ বা অস্থিকঙ্কালসার
 হইয়া দাসত্ব বৃত্তি অবলম্বন করিবে। ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা পণ্ড
 কালের চিন্তা করিতে অবসর লাভ পাইবে না। নিজের অগাধ শাস্ত্র-
 গ্রন্থে কি আছে, তাহা না দেখিয়া যে পরভাষা শিক্ষা করিতে চাহে,
 তাহার পাপ অমার্জনীয়। সেই অমার্জনীয় পাপে কেবল তাহার

নিজে নয়, দেশ উৎসন্ন যাইবে ! ইহাতে “নিজের যা কিছু” তাহা ভুলিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক ! আর যদি কেবল অর্থের কথাই ধর—ব্রাহ্মণের অর্থের প্রয়োজন কি ? কত কোটি কোটি জন্মের পর অমুখ্য জন্ম লাভ হয় । আবার কত তপস্তার ফলে ব্রাহ্মণকুলে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এ জন্মটা কি বৃথা হারাইবার জন্ম ! ব্রাহ্মণ কি অর্থের জন্ত এমন জন্মটা হেলায় নষ্ট করিবে ? এমন পাপ কথা তোমরা কখনও মুখে আনিও না ; শুনিলেও পাপ হয় ।”

তোমার পিতা, জনকঋণিতুল্য তাঁহার জনকের কাছে বাল্যে শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছিলেন । মৃত্যু সময়ে তোমার পিতামহ তোমার পিতাকে পরোপকার ও দীন দুঃখীর সেবার জন্ত আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আদেশ করেন । তোমার পিতা রামমহা পিতার অন্তিম আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন । সে কি অদ্বুত শাস্ত্র-অধ্যয়ন ! সেরূপ একাগ্রতা, সেরূপ উত্তম, সেরূপ পরিশ্রম—অসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । ঋণিতুল্য পিতার অন্তিম-আদেশ তাঁহাকে যেন প্রবল জলশ্রোতের দ্বারা আয়ুর্বেদ শাস্ত্র-সিন্ধুর মধ্য দিয়া ওতঃপ্রোতভাবে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল ! তিনি ব্যাকরণ, বেদ, পাতঞ্জল, গীতা প্রভৃতি কত শাস্ত্র গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন ; কিন্তু এরূপ অভিনিবেশ সহকারে গ্রন্থ পাঠ করিতে কখন দেখি নাই ! বৎসরের পর বৎসর এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে

তিনি কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন ! তাঁহার অধাবসায় ও পরিশ্রম দেখিয়া ভাবিতাম, ব্রাহ্মণের অস্থিমজ্জা বাতীত এমন অসাধারণ শক্তি জগতে আর কার আছে ? পিতার আশীর্বাদে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় রানময় বন্দোপাধার হুগলি জেলায় কেবল বলি কেন, তৎসময়ে তাঁহার সমকক্ষ চিকিৎসক সে দেশে আর কেহ ছিল না । জ্ঞান, ধর্ম, পুণ্য, দান, পরোপকারিতা, সচিবুতা, বক্ষচর্যা, সংযম, বিজ্ঞা ও দৈহিক বলে তাঁহার সমকক্ষ হুগলি জেলায় তখন আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইত না ।

বৎস ! তোমার মহাত্মা পিতৃদেবের জীবনের সমস্ত ঘটনার পরিচয় দিবার আর সময় নাই ! রজনীর তৃতীয় যাম অতীত প্রায় ! একদিনকার একটি ঘটনার কথা বলিব । এই ঘটনাটি যদি তুমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পার তবে “তোমরা কি ছিলে কি হইয়াছ” বেশ বুঝিতে পারিবে ।

সে আজ অষ্ট শতাব্দীর অধিক কালের কথা নয়, গুরুদেবের সহিত আমরা হিমালয়ের গুহা হইতে তীর্থযাত্রীরূপে বহির্গত হইয়াছি । তৎপূর্বে ত্রিংশত বর্ষ তিনি লোকালয় দর্শন করেন নাই । ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে এই ত্রিংশত বর্ষ হিমালয়ের নিভৃত গুহাভ্যন্তরে নিশ্চল নিষ্পন্দরূপে তাঁহার অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে । বুঝি এই লোকালয় দর্শনের কোন উদ্দেশ্য ছিল । বহু তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া গুরুদেব লোকালয়ের পথ ধরিয়া সোভুবন্ধ গমন করিতেছেন ।

অমাবস্তার ভীষণ অন্ধকার তখন রজনীর দ্বিতীয় প্রহরকে আরও ঘনীভূত করিয়াছে।

আমরা বহু ক্রোশবাপী এক প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সহসা দেখিলাম অদূরে একটি ব্রাহ্মণ ও তৎপশ্চাতে আর একজন লোক দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে। পশ্চাতের লোকটি সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণের ভৃত্য হইবে—কারণ তাহার এক হস্তে একটি অশাল অপন্ন হস্তে বষ্টি ছিল। সেই বিরাট অন্ধকারে সেই মশালের উজ্জ্বল আলোক খদ্যোতের তায় দেখাইতেছিল। সময়টা গ্রীষ্মকাল—বৈশাখ মাস। ব্রাহ্মণের নগ্নপদ, নগ্নদেহ, বক্ষে শুষ্ক সজ্জাপবিতের গোছা। শান্ত, ম্লিষ্ট, দেহপানি হইতে যেন ব্রহ্মতেজ কুটিয়া বাহির হইতেছে। স্বন্ধে-সামান্য একখানি উত্তরীয় মাত্র। তাহারই যেন কি জড়ান রহিয়াছে। পরে জানিয়াছিলাম, সেটি ঐশ্বরের স্মৃতি। ভৃত্যের লম্বা কাল মেঘের তায় চুলগুলি স্বন্ধে পড়িয়া গ্রীষ্মের ম্লিষ্ট বাতাসে ফুর ফুর করিয়া উড়িতেছে। সে ব্যক্তি যে অদ্বিতীয় বলশালী, তাহার দেহ দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহার বর্ণ গাঢ় শ্রামবর্ণ, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, লৌহ মুন্দের তায় বাহুযুগল বলিষ্ঠ; কিন্তু তাহাকে দেখিলে ভয়ের উদ্বেক হয় না! মনে হয়, বাহু দুইখানি অপরিমেয় শক্তির আধার হইলেও যেন উহা দীনের সহায়,—আর্ন্তের বন্ধু,—অত্যাচারীর সমুদায়। তাহার ভূজও অপেক্ষা হস্তদ্বিত প্রকাণ্ড বংশ দণ্ড

দেখিলে মনে ভয়ের উদ্রেক হয় বটে । সে প্রভুর পশ্চাতে হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে ! কোনদিকে তাহার দৃকপাত নাই ! প্রভুর দ্বায় ভূতাটিও যেন ধর্ম্মবলে বলীয়ান ! তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া আমার গুরুদেব বলিলেন—“বাবা ! এই ব্রাহ্মণের শক্তি অদ্ভুত । তাহার ব্রহ্মতেজ দেখিয়া আজ আমি প্রাণে বড়ই আনন্দলাভ করিতেছি ।”

পরক্ষণে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—“হায় ! ভারতভূমি ! কালপক্ষে এই ব্রহ্মতেজ তোমার বক্ষ্যচ্যুত হইবে !”

গুরুদেব শেষ কথাটি একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন । জনহীন প্রান্তরে হঠাৎ নানবের স্বর শুনিতে পাইয়া ভূতা চমকিত হইয়া নাড়াইল । তাঁরপর আনাদের সৈন্যধ্বনি হইয়া বজ্রগস্তীরস্বরে বলিল—“কে তোমরা—এত রাতে এই বিজন প্রান্তরে কি করিতেছ ?”-

সেদিন ব্রহ্মতেজ দেখিয়া দিব্যানন্দে গুরুদেবের কক্ষ নৃত্য করিতেছিল । তাহার আরও কিছু বুঝি প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছা হইল !

তিনি বলিলেন—“তুমি কে বাবা ?”

“আমি কিছু সর্দার ! তোমরা কে এখনও যে বলছ না ?”

কি প্রভুব্রাহ্মণ গস্তীরস্বর ! সে স্বরে নরনাশী নির্মম দম্বাও সমকিত হয় । তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিলাম যে, সে আমাদিগকে

দক্ষ্য মনে করিয়াছে এবং তাহার প্রভুকে হত্যা করিবার
জন্তই যেন এই দ্বিপ্রহর রক্তনীতে আমরা মাঠে স্নেহে অন্বেষণ
করিতেছি !

গুরুদেব বলিলেন—“বাবা ! আমাদের আর কি পরিচয় দিব,
আমরা সন্ন্যাসী মাত্র ।”

কিছু সর্দার পূর্বের ছায় প্রতীরক্ষরে বলিল—“মিথ্যা কথা ।”

“বাবা ! সন্ন্যাসী কখনও মিথ্যা কথা কহে না ।”

ব্রাহ্মণ তাহার প্রভু কিছু বলেন নাই । এইবার প্রভু ও
ভৃত্যে কি বলাবলি করিয়া উভয়ে সম্মুখেরে বলিল—“সত্যই
আপনারা সন্ন্যাসী ?”

“হাঁ বাবা ।”

ব্রাহ্মণ । “আপনাদের সেবা হইয়াছে ?”

গুরুদেব বলিলেন—“না ।”

ব্রাহ্মণ । “তবে কি আপনারা অভুক্ত ?”

গুরুদেব । “হাঁ বাবা ! আমরা আজ তিন দিন অভুক্ত অবস্থায়
আছি ।”

ব্রাহ্মণ । “তবে দয়া করিয়া অল্প রক্তনীতে এই দীন ব্রাহ্মণের
পুণ্যসম্পাদন করিতে হইবে ।”

গুরুদেব । “বেশ বাবা চল ।”

আমরা তিন দিন জলম্পর্শ করি নাই ; লোকালয়ে আসিলেও

গৃহীর নিকট যাত্রা করিবার আদেশ গুরুদেবের নাই। ব্রাহ্মণের অমরোধ্য গুরুদেব উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। বুধি ত্রিশত্ববর্ষের পর একটি হিন্দু সংসার—নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পরিবার দেখিবার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। গৃহস্থের আশ্রমে গুরুদেবকে আমি এই প্রথম অতিথি হইতে দেখিলাম।

আমরা চারিজন সেই অনাবস্থার গাঢ় তিমিরাবৃত রজনীতে বহু ক্রোশবাপী ত্রিপাস্তুর মাঠ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। গুরুদেব তাঁহার গতি হ্রাস করিলেন! সন্ন্যাসীরা যে গতিতে পথ চলেন, সেইরূপ ভাবে চলিলে তোমার পিতার ভবনে পৌছিতে আমাদের এক দণ্ডের অধিক সময় লাগিত না! বুঝিলাম, ব্রাহ্মণ আজ কপাল লাভ করিয়াছেন। আজ বুঝিলাম, ব্রহ্মতেজের কাছে তপস্বী কেন মন্তক অবনত করিয়াছিলেন। হায়! ব্রাহ্মণ কোন দিকে তোমরা আজ সে তেজ হারাইতে বসিয়াছ!”

সন্ন্যাসীর আঁখি-যুগল আবার জলভস্মাক্রান্ত হইল।

প্রকৃতিস্থ হইয়া সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—“পথ চলিতে চলিতে আমি কিছু সন্ন্যাসীর সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলাম। কথোপকথনে বাহ্য বুঝিলাম, তাহাতে ব্রাহ্মণের প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি উদ্ভূত হইল। ব্রাহ্মণ রাজিকালে অনাথ অসুখের গৃহে গিয়া, তাহারিদের গুরুবার ও ঐশ্বর্য প্রদানের ব্যবস্থা করেন। দিবাভাগে অস্তিত্ব কর্তব্য ব্যাপ্ত প্রাকার, দীন সেবার ভীষণ

সুবিধা ঘটে না। এজন্য ব্রাহ্মণকে প্রায়ই বিনিময় রজনী অতি-
বাহিত করিতে হয়। ভৃত্য কেদারাম বাগ্দী ওরফে কিছু সর্দারই
ব্রাহ্মণের এই কার্যের একমাত্র সহায় ও অবলম্বন। হায়! পঞ্চাশ
বৎসরের মধ্যে সেরূপ প্রভুভক্ত ভৃত্যও ভারতভূমি হইতে চির-
বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

কিছু শরীর বলিল—“ঠাকুর! সাধে কি তোমাদের উপর আমার
রোগ হইয়াছিল। তিনমাস আগে এই মাঠেই আমার ঠাকুরকে
ডাকিতে ঘিরিয়াছিল। সেদিন আমাদের বাটীতে কয়জন অতিথি
আসিয়াছিল বলিয়া, ঠাকুর আমার উপর তাহাদের সেবার ভার দিয়া
রোগী দেখিতে বাহির হইয়াছিলেন। আমি বার বার বলিলাম—
“ঠাকুর তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি অতিথি-সেবার উদ্যোগ
করিয়া দিয়া, তোমার সঙ্গে যাইব; কিন্তু তিনি কিছুতেই আমার
কথা শুনিলেন না, বলিলেন—“না! তুমি আসিলে অতিথিদের কষ্ট
হইবে। তাহাদের কখন কি আবশ্যক হয়, তাহা ত বলা যায় না।”
ঠাকুর রোগী দেখিতে গেলেন; আমার বনটা কিন্তু খারাপ হইল।
কারণ, বাটীর উপর আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল। অতিথি-
দিগকে আহ্বাদি করাইয়া শয়ন করাইতে রজনী একপ্রহর অতীত
হইয়া গেল। মা বলিলেন—“বাবা কিছু! এইবার তুমি তোজন
কর।” আমি বলিলাম—“না মা! ঠাকুর মহাশয়ের আজ এক
মিয়াকুস; আমি তাঁহাকে বাটা না আনিয়া অন্ন গ্রহণ করিব না।

আমার কথা শুনিয়া মা জননীর মুখ শুখাইয়া গেল। মায়ের মুখের পানে চাহিয়া আমারও কান্না পাইল। কেনার চোখ দিয়া সহজে জল পড়ে না ঠাকুর! কিন্তু মায়ের মুখ দেখিয়া সে দিন সত্য সত্যই আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িল। মা আমার কেবল প্রভুপত্নী ন'ন! মা আমার সাক্ষাৎ গর্ভধারিণী তুল্য এবং গৃহের লক্ষ্মী ঠাকুরণ!

মাকে প্রণাম করিয়া এই লাঠিগাছটি ঘাড়ে করিয়া বের করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। “এই লাঠি গাছটিই আমার একমাত্র সম্বল ঠাকুর!” এই বলিয়া কিছু লাঠিগাছটিকে মস্তকে পর্ত্তন করাইল। তারপর আবার বলিতে লাগিল—“মনে করিলাম রূপা দুটো বার করি। আবার ভাবিলাম না থাক! দুই লাঠি পাঠ পার হইয়া যাইব।”

ঠাকুর সেদিন কোথায় গমন করিবেন, তাহা আমার জানা ছিল। নইগাঁ গ্রামে এক গোয়ালী বাস করিত—তাহার নাম শ্রীধর ঘোষ। বেচারীর বড়ই দুঃখের সংসার। ছদ্ম ও দধি বিক্রয় করিয়া কোন প্রকারে দুবেলা ছুটি অন্নের যোগাড় করে। তার ছেলেকে আজ কয়দিন কঠিন পীড়ায় শয্যাগত! ভুল বকিতেছে! বাতলেয়া না। ক ব্যায়ামারটোর নাম। বৈজ্ঞ দেখাইতে কোথায় বা পরসা পাইবে। ৩০ ঘরে একটা ঘড়া ছিল, সেইটা বেচিয়া একজন হাতুড়ে বৈজ্ঞকে দাইয়াছে। তারপর এখন তাহার বিজ্ঞের আর কুলাইল না।

এবং সে জবাব দিয়া চলিয়া গেল, তখন ঘোমের-পো সন্ধ্যাবেল
ছুটিয়া আসিয়া আমার ঠাকুরের কাছে পড়িল। তার কান
দেখিয়া আমার দয়াল ঠাকুরের চক্ষুও আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহা
হুটা কি শব্দ বড়ী দিয়া বলিলেন—“তুমি এখন বাটী বাইয়া তা
শিউলিপাতার রস দিয়া এই হুটা বড়ী সেবন করাও। আমি
বাবার শীতল দিয়া সন্ধ্যা-আত্মিক করিয়া, দেড় প্রহরের মধ্যে
তোমার গৃহে পৌছিৰ্।” ঘোম চলিয়া গেলে, আমি লাঠীগাছ
বাতির করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে রাখিয়া গুরুগুলিকে গোয়ালে তুলি
গেলাম। ঠাকুর একটু পরেই বিগ্রহের ধরে ঢুকিলেন। গরী
হুতীর অস্থখের কথা শুনিতেই আমার ঠাকুর সেদিন স্বত
জ্বায়ে উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই কথাগুলি
শুনিত্তে আমার বড়ই ভাল লাগে। ঠাকুর কি বলেন, শুনি
অন্ত আমি ঠাকুর-ঘরের জানালার নিকট গমন করিয়া নীর
দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ঠাকুর গৃহে প্রবেশ করিয়া, রামচন্দ্রের সিংহাসনের সম্মুখ
আসনের উপর বসিলেন। ক্রোশার জন লইয়া। প্রথমতঃ নৃ
চোখে দিলেন। তারপর পৈতৃক গোছাটি হাতে জড়াইয়া বসি
লাগিলেন—

“সেই : আপনি আমার কেবলমাত্র নিষ্ঠুর হায়েত ছিল। নতুন
আপনি যে আমার আশ্রিত অভীষ্ট দেবতা। সেই : গরীব গোরা”

পুত্রটার উপর কৃপাদৃষ্টি করুন। তাহার আর কেহ নাই। আমি আপনায় আমার স্মরণ করিয়া ঔষধ দিয়াছি—ঠাকুর! একবার তাহার বাটা ঘাইয়া ছেলেটির মস্তকে পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিন। প্রভো! আপনার পুত্র পবিত্র স্পর্শ ভিন্ন কিছুতেই সে রক্ষা পাইবে না। আমি গাইয়া যদি ছেলেটির মন অবস্থা দেখি, তবে কোন্ মুখ লইয়া দিবিব দেব! কি বলিয়া সেই পুত্র-শোকাতুর বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিব? আমি আপনার নাম স্মরণ করিয়া যখন ঔষধ দিই, সে ঔষধ ত কখন বিফল হয় না ঠাকুর! একবার গরীব গোয়ালার প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করুন। দরিদ্রের বন্ধু, অনাথের নাথ, আপনি ভিন্ন আর তাহার কে আছে?”

বলিতে বলিতে আমার ঠাকুরের নয়ন দিয়া ভক্তি-অঞ্জ অজস্র ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার সেই স্বর্গীয়ভাব দেখিয়া, আমার এই কঠিন প্রাণেও আঘাত লাগিল। আমি ঠাকুরের আন্তরিক রোদন দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, সে স্থান হইতে পলাইয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি, বাহিরে যজ্ঞস্থল অতিথি আসিয়াছেন। আমি তাঁহাদের স্ব্যবস্থা করিতেছি, এমন সময়ে প্রভু বাহিরে আসিলেন। তখনও তাঁহার কণ্ঠের গাঙ্গকক, আমি বড়ই কাতর হইলাম। আমি আমার পিতা-মাতার স্মরণ জল কখনও দেখিতে পারি না ঠাকুর!”

একটু থামিয়া কিছু সর্দার আবার বসিতে আরম্ভ করিল।

“রূপা মা লইয়া ছুটিত আরম্ভ করিলাম। মায়ের সেই মলিন মুখখানি দেখিয়া মনটা আরও খারাপ হইয়াছিল। ঠাকুরের জন্তও একটু ভাবনা হইয়াছিল। যেখানে তোমাদের সহিত দেখা হইল, তাহার ষোল্লদিকের মাঠে হঠাৎ ঘাইতে ঘাইতে একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম। তখন প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে বুঝিলাম, ইহা ডাকাইতদিগের সাক্ষেতিক শব্দ। লাঠিগাছটিকে আমি দৃঢ়রূপে ধরিয়া ক্রতপদে দৌড়াইতে লাগিলাম।”

“সাবধান নিরীহ ব্রাহ্মণের অঙ্গস্পর্শ করিও না। আমার কাছে এক কপর্দকও নাই, কেবলমাত্র অযথা নরহত্যার পাতকে নরকগামী হইতে হইবে।”

“বুক দূর-দূর করিতে লাগিল। এ যে আমার চিরপরিচিত জঙ্গল! ঠাকুরের কণ্ঠস্বর। আশঙ্কায় আমার পা আর উঠিল না। এক লহমা দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলাম। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, কোন্ দিক হইতে আওয়াজটা আসিল। জাবার তাঁহার স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল! তখন ক্রোধে আমার সর্বদেহ কাঁপিতে লাগিল! জৈশ্বর শপথ করিয়া বলিলাম, যদি আমার পিতৃচরণে ভক্তি থাকে, যদি আমার মা জননীর আশীর্বাদ থাকে, তবে দেখিব, কেনা সর্পদেবের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু থাকিতে কে আমার ঠাকুরের কেশ স্পর্শ করে। এত সাহস! এত স্পর্ধা! আমার ঠাকুরকে হত্যা করিবার

চেষ্টা ? স্বয়ং বস আলিলেও আজ কেনার হাতে কাহারও নিস্তার নাই ।”

“দোহাই তোমাদের ! সত্য বলিতেছি, আমার নিকট কিছুই নাই ! আমাকে মারিয়া তোমাদের কোনও লাভ হইবে না । আনাকে দয়া করিয়া পরিত্যাগ কর ।”

“ঠাকুরের কাতর চীৎকার কোন্ দিক হইতে আসিতেছে, এবার আর আমার বুঝিতে বাকী রহিল না । ক্রোধে জ্বালন্ত হইয়া শূন্তে হইবার লাঠি মারিলাম । আমার চক্ষু ছুটা যেন কাটিয়া বাহির হইবার মত হইল । চীৎকার করিয়া কান্নিতে ইচ্ছা হইল ! আমি বাচিয়া থাকিতে আমার ঠাকুরের এই লাঞ্ছনা ! মা শুনিলে আমার কি বলিবেন ! রাগে দাঁতগুলি কড়মড় করিতে লাগিল ! আমার মস্তকের কেশগুলি সোজা হইয়া উঠিল । কোন্ পথে ছুটিব, রাগে ভুলিয়া গেলাম । মা বলিয়াছিলেন—“বাবা কিছু ! রাগের বশীভূত কখন হইও না । ক্রোধ মানুষের বিষম শত্রু ।” সহসা মায়ের এই উপদেশ বাণী আমার মনে পড়িল । আমি স্থির হইয়া ক্রোধকে মন হইতে দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিলাম ।

আবার সেই কাতরস্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল—

“বাবা ! কেন আমার মারবি ! আমার নিকট ঔষধ ভিন্ন আর কিছুই নাই ।”

আর না ! সজোরে লাঠিটা ধরিয়া সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া

ছুটিতে লাগিলান। ছুটিতে ছুটিতে চুইবার পড়িয়া গেলাম, কতকগুলো বাবলা কাঁটা একস্থানে ছিল, আমার পৃষ্ঠে ফুটিয়া গেল। অসহ্য বঙ্গণা বোধ হইতে লাগিল, আমি ইহা গ্রাহ্য করিলাম না।

বাইয়া দেখি সর্বনাশ! আট জন ডাকাতে আমার অন্নদাতা পিতাকে বিরিয়াছে! ঠাকুর প্রথমটা অনুন্নয়-বিনয় করিয়া তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন ছুই জন ডাকাতির লাঠি তাঁর পৃষ্ঠে পড়িল, তখন তিনি আর উপায় নাই দেখিয়া, একটা ডাকাতির হস্ত হইতে তার লাঠিটা কাড়িয়া লইয়াছেন। সেই লাঠির সাহায্যে সাত জনের লাঠি ব্যর্থ করিয়া তিনি গিছনের দিকে হাঁটিয়া হাঁটিয়া আসিতেছেন! তাহাদের একটা লাঠিও আর ঠাকুরের গায়ে লাগিতেছে না; কিন্তু বুঝি ঠাকুর আর পারিয়া উঠিতেছেন না। ঘম্মাক্ত কলেবরে হাঁফাইতে হাঁফাই ৫ তিনি অতি কষ্টে পশ্চাতের দিকে আসিতেছেন।

দোষী আমার প্রাণ ফাটিয়া বাইবার মত হইল! আমি হস্তার কারিয়া বলিলাম—“হয় আমার মৃত্যু, না হয় তোদের মৃত্যু।” এই বলিয়া আট জনের মধ্যস্থলে কাঁপাইয়া পড়িলাম।

ঠাকুর ২০২ আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, ডাকাতগুলোও চমকিয়া গেল। আমি তাহা দেখিয়াও গ্রাহ্য না করিয়া বলিলাম—“তোদের যদি বাঁচবার সাধ থাকে, লাঠি ফেলিয়া এক জায়গায় বাঁড়া

হইয়া দাঁড়া।” তিন জন খতমত থাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। পাঁচ জন আমার সঙ্গে যুক্তিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আবার সেই তিন জন আসিয়া দলে যোগদান করিল। বুঝিলাম—এরা পুইনের ফেলা হাড়ির দলের লোক। বাড়িতে আরও লোক আছে।

যা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাই হইল। এক জন ছুটিয়া গিয়া নাস্তিক শব্দ করিল। দেখিতে দেখিতে আরও পাঁচ জন আসিয়া তাদের দলে মিশিয়া আমার উপর লাঠি চালাইতে লাগিল। তখন সেই ঘোর নিশিতে ভয়ঙ্কর স্থানে তেরজনের সঙ্গে আমার শক্তি পরীক্ষা হইতে লাগিল। আনন্দে আমার দেহে যেন শত হস্তীর বল আসিল। সহসা দেখিলাম, ডাকাইতদের মধ্যে হইতে এক জন ভীষণ জোয়ান হঠাৎ আসিয়া আমাকে তীব্রবেগে আক্রমণ করিল। তাহার ক্ষমতা দেখিয়া আমি বুঝিলাম, এই ব্যক্তিই দলের সর্দার ফেলা হাড়ি। ফেলা হাড়ি হগলি জেলার প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল। ইহার সমকক্ষ লাঠিয়াল এদেশে আর কেহ নাই।

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম—“সর্দার, অনেক ডাকাতি করিয়াছিস,—এই নাচে অনেক মানুষ মারিয়াছিস,—অনেক অত্যাচার করিয়াছিস,—অনেক লোকহরণ পাপ করিয়াছিস, কিন্তু আজ যখন তোমার দলের লোক আমার অন্তদাতা পিতার গায়ে হাত দিয়াছে, তখন আর তোমার আমার মধ্যে কিছুতেই নিষ্ঠুর নাই।”

আমার মুখে ফেলা সর্দারের নাম শুনিয়া, ঠাকুরের মুখ শুকাইয়া গেল। আমি তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলাম,—“ঠাকুর! তুমি আমার পশ্চাতে দাঁড়াও। তোমার আর আমার মা-জননীর আশীর্ব্বাদে, আজ আমি সর্দারের নাম পৃথিবী হইতে মুছিয়া দিব। আজ হইতে হুগলি জেলার লোক নির্ভয়ে নিদ্রা যাইবে। আর যদি মরি, মাকে বলিও, তিনি যেন আমার জন্ত না কঁাদেন। তাঁর চখের জল পড়িলে আমি মরিলেও শান্তি লাভ করিতে পারিব না।”

প্রায় আড়াই দণ্ড ধরিয়া, আমি তাহাদের সহিত যুঝিতে লাগিলাম। আমার জ্ঞান চৈতন্য যেন কোথায় চলিয়া গেল। আমি কে, কোথায় আমি, কি করিতেছি কিছুই মনে রহিল না। কেবল বৌ বৌ লাঠির শব্দ কাণে ঢুকিতে লাগিল। যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন দেখি, ফেলা সর্দারের বৃকে বসিয়া তার গলা টিপিয়া ধরিয়াছি, তার জিবটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তার দলের চারজন লোকের মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তারা বেহঁস হইয়া পড়িয়া আছে, ঠাকুর বলিতেছেন,—“কিন্তু ছেড়ে দে বাবা! ছেড়ে দে! এখনই লোকটা মারা যাবে।”

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলাম—“আর সব কোথায়?”

ঠাকুর বলিলেন,—“রক্তের স্রোত দেখিয়া লাঠি ফেলিয়া তাহার সম্মুখে প্রাণভরে পলাইয়াছে!”

চাহিয়া দেখি, রক্তের নদী বহিতেছে। ঠাকুর হাত ধরিয়া তখন ফেলা সর্দারের বুক হইতে আমাকে নামাইয়া লইয়াছেন। আমারও মাথা দিয়া রক্ত ঝরিতেছে।

ঠাকুর ছুটিয়া গিয়া মাঠের পুকুর হইতে জল আনিয়া, তাহাদের মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। আমারও তখন তাহাদের সেই অবস্থা দেখিয়া মনটা কেমন হইয়া গেল। মড়ার কলসী করিয়া জল আনিয়া, আমিও তাহাদের মাথায় ঢালিতে লাগিলাম।

ঠাকুর বলিলেন—“বাবা কিম্ব! আগে তোমার মাথাটা ধুইয়া ফেল, বড়ই রক্ত ঝরিতেছে।”

আমি হাসিয়া বলিলাম—“ঠাকুর, উহা রক্ত নয়, আমার বা-
জনীর আশীর্বাদ-চিহ্ন, উহা এখন মাথায় থাক।”

ঠাকুরের সেবা ও শুশ্রূষায় তাহারা শীঘ্রই উঠিয়া বসিল।

ঠাকুর বলিলেন—“বাবা কেন তোরা এমন অধর্মের কাজ করিস?—সৎপথে থাকিয়া পরিশ্রমের অর্থে তোদের কি পেট ভরে না?”

ঠাকুরের কথা শেষ হইতে না হইতে, তারা আমার দিকে চাহিয়া ছুটিয়া পলাইল। বোধ হয়, ভয় হইল, আবার যদি লাঠি চালাই।

যখন গৃহে আসিলাম, তখন ভোর হইয়া গিয়াছে। না ঘান করিয়া আসিয়া, বাবা ব্রাহ্মচর্যের পূজার উদ্যোগ করিতেছেন।

আমাকে দেখিয়াই মা চীৎকার করিয়া বলিলেন—“কি হয়েছে রে কিছু?”

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—“কিছুই হয় নাই মা! এই দেখ না, তোমার আশীর্বাদ-চিহ্ন মস্তকে রহিয়াছে।”

তারপর মা আমূল বৃত্তান্ত জিনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

কেনারামের কথা শেষ হইতে না হইতে, আমরা তোমাদের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনও চারি পাঁচ দণ্ড রাত্রি। রামনয় করযোড়ে গুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন—“বহাঘ্ন! যদি দয়া করিয়া পদধূলি দিলেন, তবে সেবার কি আয়োজন করিব আজ্ঞা করুন।” গুরুদেব বলিলেন,—“এখন কিছুই করিতে হইবে না বাবা! স্বর্ঘ্যোদয়ের পর সে ব্যবস্থা হইবে।”

আমরা মুগ্ধরী নদীতে স্নান করিতে গেলাম। তোমার পিতার আদেশের সঙ্গী হইলেন। কেনারামও সঙ্গে ছাড়িল না। স্নান করিয়া প্রত্যাগমন করিতে স্বর্ঘ্যোদয় হইল।

গুরুদেব বসাগমন—“মা! তোমার গৃহ-দেবতার পূজা হউক, আমার আনন্দ। আমার উদ্বেগ হইবে।” তখন রামনয় আমাদের বাড়ি দেবতা রামচন্দ্র শীলার পূজা করিতে বলিলেন; আমরা একটু দূরে বসিয়া তাহা দেখিতে লাগিলাম।

“কি অপূর্ব ভক্তি! কি একাগ্রতা! কি মনোভাষণ!

কি মধুর স্বব-পাঠ ! আমরা দেখিলাম, পূজায় বসিয়া তোমার পিতার চৈতন্য ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইল । কুন্তক গ্রাস, মাতৃকা গ্রাস, ভূতভুজি—বাক্, সে সব কথা তুমি এখন বুদ্ধিতে পারিবে না ; সে সময়ের বিলম্ব আছে ।”

তোমার পিতা যখন যোগাসনে বসিয়া, “সচন্দনং তুলসীপত্রং ননন্তে বহুরূপায় পরমায়ুর্নৈ বিষ্টবে স্বাহা” বলিয়া শালগ্রাম শিলার মস্তকে তুলসীপত্র অর্পণ করিতে লাগিলেন, তখন একদেহে চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল ! এই ভাবে পূজা করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলাম যে, তোমার পিতা আসন হইতে একহস্ত উঠিয়াছেন ।

দিবা দ্বিপ্রহরের সময় তোমার পিতার পূজা সমাপ্ত হইল । পূজার শেষ ঘণ্টাধ্বনি হইবামাত্র, তোমার জননীদেবী আসিয়া—গলগদ্যীকৃতবাসে বিগ্রহকে প্রণাম করিলেন । বহুরূপ তাঁহার মস্তক ভূমি হইতে উঠিল না । ভক্তির উন্মাদনায় তিনি বেন সংজ্ঞাহারা হইলেন । হায় ! হিন্দুর গৃহলক্ষীগণ, দেশের হৃদয় দেখিয়া তোমরাও অন্তর্হিত হইয়া গেলে ! হিন্দুর গৃহ এখন অনাচার ও পাপে পরিপূর্ণ । সে গৃহে এখন আর তোমরা থাকিতে পারিবে কেন না ! তোমরা যে স্থানে গৃহ-দেবতার ভোগ রাখিয়া গিয়াছ, সেই স্থান এখন অম্পৃক্ত জিনিষে পূর্ণ ! তোমরা কি সে গৃহে তিষ্ঠিতে পার । লক্ষ্মীরূপিণী মা ! আর কি তোমরা হিন্দুর

এ গৃহে আসিবে না? তোমরা আসিলে যে, তোমাদের পুণ্যপ্রভাবে, তোমাদের স্বামী-পুত্রেরা পুনরায় হিন্দুর ঘরের ছেলে হইবে! সেদিনের আর কণ্ঠ বিলম্ব না! আমরা কেবল তোমাদিগকে দেখিতে চাই। তোমরা আবিভূত হইলেই ধর্ম আপনি আসিবে। হিন্দুর হিন্দুত্ব আবার জাগিয়া উঠিবে। আমরা অর্থের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি না! আমরা যদি রাজ্যস্থ চাহিতাম, তাহা হইলে আমাদের পূর্বপুরুষ যেসকল ঋষিগণের চরণতলে সস্ত্রাটের হেম-মুকুট গড়াগড়ি দিত না! আমরা তোমাদের স্থাপিত তুলসী—তোমাদের প্রতিষ্ঠিত অশ্বথ আশ্রিত গৃহস্থের নিত্যাবশ্যকীয় বৃক্ষগুলি আজ জনাভাবে শুষ্ক হইয়া বাইতেছে। পুণ্যাহ বৈশাখে কেহ আর সেখানে জনধারা দেয় না। তোমাদের প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী ব্রহ্মডাকায় পরিণত হইয়াছে। তোমাদের পুত্র-পৌত্রবধূরা বিদেশী সাজে, বিদেশী ভাবে, বিদেশী ছাঁচে কিম্বতকিমাকার রূপ ধারণ করিয়াছে! তাহারা আর সে লজ্জাবনত স্নেহ-মমতাপূর্ণ পল্লীবধু নাই! প্রত্যয়ে গৃহস্থারে গোময় লেপন, সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চ দীপদান, পুত্র-কন্যার পাকায় দেব-দেবীর মানস-পূজা, এখন সমস্তই উঠিয়া গিয়াছে। গৃহ-দেবতার পূজা এখন উৎকলবাসী ব্রাহ্মণের হস্তে ব্রহ্ম! দেব-দেবীর ভোগ দেওয়া কাহাকে বলে, এখন গৃহলক্ষ্মীদিগকে ব্যাহার্য দিতে হয়! বিগ্রহসেবার পরিবর্তে সেখানে এখন কেবল কতীর ভক্ত সীতাতোষ মোহনভোগ শোভা পাইতেছে।

সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদ্রিয়া নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

“তোমার জননী বহুক্ষণ পরে যখন প্রণাম করিয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে অপূৰ্ণ সতীত্ব-তেজ ফুটিয়া উঠিল। মা আনন্দময়ী ভগবতী বোধে আমি তাঁহাকে মনে মনে বারংবার প্রণাম করিলাম।

তোমার জননী উঠিয়াই স্বামীকে প্রণাম করিলেন। সে বহুক্ষণ ধরিয়া! তাহার পর বিষ্ণুপুজার চরণামৃত তাম্রকুণ্ড হস্তে লইয়া, কেনারামকে ডাকিলেন। সে আসিয়া দ্বারে ভূমিষ্ঠ হইয়া একে একে সকলকে প্রণাম করিল! তোমার জননী তাহার হস্তে চরণামৃত ঢালিয়া দিলেন। কেনারাম ভক্তিভরে তাহা পান করিয়া হাতটি সর্কাসে মাখিল।

এইবার তোমার জননী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সন্ন্যাসীদের সেবার কিরূপ আয়োজন করিব! আপনি বলিয়াছেন যে, আজ চারিদিন উহার অভুক্ত!”

কথা শেষ হইতে না হইতে গুরুদেব উঠিয়া গিয়া বলিলেন,—“কেন মা চঞ্চলা হইতেছ? কমলালয়ে আসিয়া কুখা তুখা কি কাহারও থাকে!”

তোমার জননী গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া বলিলেন—“স্বামী! যদি

দয়া করিয়া পদধূলি দিয়াছেন, তবে কিরূপভাবে সেবার আয়োজন করিব, তাহা দয়া করিয়া আদেশ করুন।”

গুরুদেব বলিলেন—“মহা অগ্রে তোমার রামচন্দ্রশীলাকে দর্শন করিয়া নয়ন তৃপ্ত করি। তারপর ভোজনের বন্দোবস্ত হইবে।” গুরুদেব তোমাদের দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া, শীলাকে দর্শন করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন! আমাকেও দর্শনের আদেশ করিলেন! কি দেখিলাম, তাহা আর বলিব না! শরীর যেন পবিত্র হইয়া গেল! গুরুদেব বাহা দেখিলেন, আমি বুঝি তাহা দেখিতে পাইলাম না! তবু আমার ভাগ্যে বাহা দর্শন ঘটিল, জীবনে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না।”

গুরুদেব তোমার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—
“বাবা রামময়! এ যে তোমার সজীব শীলা! ধন্ত তুমি, সার্থক জন্ম তোমার যে, তুমি ইহার সেবা করিয়া ধন্ত হইতেছ।”

তোমার জননী পরিষ্কার অন্ন, নানাবিধ ব্যঞ্জন এবং পান্স-পিষ্ট-কাদি ভোগ আনিয়া দিলেন। বহুকণ ধরিয়া, করযোড়ে ভক্তি-গদগদ-চিন্তে তোমার পিতা, রামচন্দ্রশীলাকে তাহা নিবেদন করিয়া দিলেন।

ভোজ্য লব্ধা হইবার পর আবার বহুকণ ধরিয়া সকলে প্রণাম করিলেন। এবার দেখিলাম, গুরুদেবের চক্ষে জলধারা বহিতেছে।

তোমার জনকজননী করযোড়ে গুরুদেবের সমুখে দণ্ডায়মান হইয়া দেবার অল্প কাঙ্ক্ষিত-মিনতি করিতে লাগিলেন।

তোমার পিতার সেই শুভ্র যজ্ঞোপবীতধারী, শব্দ ও চন্দন-বিভূষিত দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, সাত্ত্বিক ভাবের পবিত্র জ্যোতির্মণ্ডিত মুখমণ্ডল, এখনও যেন আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। তোমার জনকজননী হরগৌরী মূর্তিতে যেন সে সময়ে শোভা পাইয়াছিলেন।

গুরুদেব বলিলেন,—“বাবা! আমাকে একটি সামান্য ফল দিলেই তোমাদের অতিথি সেবা সম্পন্ন হইবে। চারিদিনের উপবাসী অতিথির একটি ফলই যথেষ্ট।” এই কথা শুনিয়া তোমার জনকের মুখ দিয়া আর বাক্য নিঃসৃত হইল না—গুরুদেবের মুখের দিকে অনিবেশনরূপে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

এইবার তোমার জনক বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন, যাঁহাকে তিনি এতক্ষণ সন্ন্যাসী বলিয়া ভাবিতেছিলেন, আমার সেই গুরুদেব সাধারণ সন্ন্যাসী নহেন।

তারপর সে অনেক কথা বলিবার আর সময় নাই। রজনী প্রভাত হইয়া আসিতেছে। এদিকে বৃদ্ধার দেহও আর ভঙ্গীভূত হইবার বিলম্ব নাই। সে দিন তোমার পিতা গুরুদেবকে আর ছাড়িলেন না। তাঁহারও সেদিন তোমাদের আবাস ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না। সেইদিনই গুরুদেব তোমার জনকজননীকে দীক্ষা দান করিলেন। দীক্ষিত হইবার পর, সংসার ত্যাগ করিয়া তোমার পিতার গুরুদেবের সঙ্গী হইবার প্রবল রাসমা জন্মিল;

কিছু গুরুদেব নিষেধ করিয়া বলিলেন—“বাবা! ইহজন্মটা অপেক্ষা কর! সে সময়ের একটু মিলন্থ আছে, বিশেষতঃ তুমি ব্যতীত তোমার বংশের আর কাহারও দ্বারা রামচন্দ্রশীলার পূজা হইবে না।

“বাবা! এখন জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি সেই বংশের সন্তান? যদি পূর্বপুরুষগণের নীতি-নীতি বজায় রাখিতে, তবে তোমরা আজ এরূপ অপঃপতিত হইবে কেন? তোমরা বিদেশী শিক্ষা-প্রভাবে এখন নমন করিতেছ, হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা কেবল ‘মুড়ি ও গাছ-পাথরের পূজা’—এগুলি অশিক্ষিত হিন্দুর কার্য! তোমরা এখন ভাব যে, হিন্দুর বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, সংহিতা, দর্শন সবই কুসংস্কারপূর্ণ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় তোমরা এখন এমন বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়াছ যে, এই সকল ধর্মগ্রন্থগুলি আদৌ গ্রহণ করিতে চাও না। “গুরু”, “শিষ্য” এই সকল কথা শুনিতে নাসিক কুঞ্চিত কর। তোমাদের মধ্যে গুরু আবার কে? দীক্ষা আবার কি প্রকার? তোমাদের বিংশ শতাব্দীর উজ্জল বিজ্ঞানালোকোদ্ভাসিত নয়নযুগল অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারপূর্ণ বেদবিধান দেখিতে ইচ্ছা করে না। তোমরা ভাব যে, তোমাদের পিতৃপুরুষগণ মূর্খ, অশিক্ষিত ও বর্বর ছিল। বাহারা নয়নদেহে নয়নদেহে শিখা ও উত্তরীয় লইয়া, কৃষিকার্য বা যজন দ্বারা দ্বিগুণিত করিয়া গিয়াছে, তাহারা আবার কৃতবিদ্য কিসে?

হারা ভ্রাত্ত, সংকীর্ণ, কুসংস্কারপূর্ণ, শাস্ত্রাদেশে অন্ধবিশ্বাসের
শেখড়ী হইয়া সংসার পালন করিত ; তাহাদের আদর্শ কি গ্রহণ-
যোগ্য ?

হায় ! অধঃপতিত হিন্দু-সন্তান, তোমরা এখন কাচ ও কাঞ্চনকে
মূল্য জ্ঞান করিতেছ। বিজাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া
তোমাদের ধর্ম গেল, কর্ম গেল, ইহকাল গেল, পরকাল গেল—
কৃষ্ণপুরুষদিগের পবিত্র আরা-নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইতে চলিল।
তোমরা আবার কত দিনে তোমাদের পিতৃপিতামহের মত
শিক্ষিত কুসংস্কারাপন্ন হইবে ? কবে তোমরা হারাণ ধর্ম আবার
করিয়া পাইবে ?

হিন্দুর এখন পানভোজনই সর্বস্ব হইয়াছে। হিন্দু-সন্তান
এখন মাছুষ নয়, শিল্পোদর-পরায়ণ বিকৃত দানবের মত ভারত-
শ্রমিকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিতেছে। হিন্দু-সন্তান এখন
সত্য সত্যই ভারত-শ্রমিকের অস্তিত্বের প্রতীক হইতে তাড়ন
করিতেছে ! কবে যে উপযুক্ত নেতা আবার ভারতভূমি
স্বাধীন হইয়া, ভারতের বক্ষঃস্থলে প্রেত-তর্পণ করিয়া ইহা-
দিককে মুক্ত করিবেন, তাহা আমার অন্তর্ধামী গুরুদেবই
জানিতে পারেন। ভারতভূমে এখন আর শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের
প্রয়োজন নাই ! এখন দীনবেশী মূর্থ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইয়াছে।
এখন আর বিদ্বৎ, বৈভব, ধন ও বলপ্রার্থী-অধ্যাপকের আবশ্যক নাই।

নাই, এখন নির্লোভ ব্রহ্মচর্য্যাপরায়ণ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের জত কাতর প্রাণে সকলেরই প্রার্থনা করা উচিত । এখন পাশ্চাত্য জ্ঞানদীপ্ত প্রচারক ভণ্ড,—হিন্দু নামধারী সৌধীন নেতার অপ প্রয়োজন নাই, এখন চাই—সরল অন্ধ-বিশ্বাসী অতীতের সেই নিষ্ঠাবান হিন্দু সন্তান! পত্রের অনুকরণে দেহ সাজাইয়া, বাহার হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, তাঁহাদের সেই হিন্দুত্ব বিসর্জন দিয়া নগ্নপদ নগ্নদেহ হিন্দুর সেই চিরন্তন সহজ-সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে । বিদেশী শিক্ষা বর্জন করিয়া হিন্দুর প্রাচীন শিক্ষার সংসারে শাস্তি-দীপ জালিতে হইবে । কোট-পেন্টুলেনধারী বাবু না হইয়া এখন নগ্নদেহ মলিন বসন-পরিহিত পুরাতন হিন্দু হইতে হইবে । বিদেশীর অনুকরণে গলাবাজী করিয়া মনুষ্ট্বকারের অভিনয় করিলে ভারতের স্মৃতির দিন ফিরিয়া আসিবে না ; ভারতের যে উপায়ে উন্নতি হইয়াছিল, এখন সেইরূপ প্রাণহীনবৎ নিশ্চলভাবে যোগাসনে বসিতে হইবে । এখন হিন্দু হাসে বটে, কিন্তু সেটা হাসি নয় । সে হাসি হৃদয়ের অশান্তি ও হৃৎকের আবরণ মাত্র । যোগাসনে বসিয়া প্রেমানন্দে মৃদু মৃদু হাসিতে হইবে । হিন্দুর ঐ হাসি—কেবল হৃৎপদে, রোগ জ্বালা বিলাস ব্যাধিজনিত অভাবের বৃত্তিক দংশনের জ্বালা নিবারণার্থ এ হাসি হৃদয়ের আনন্দের অভিব্যক্তি নয় ! সেই প্রাচীনকালের আনন্দের হাসি ভারতবর্ষে এখন আর নাই ।

এই ভারতবাসী একদিন পুণ্য-প্রভাবে মৃতের রাজ্য হইতে প্রাণকে ফিরাইয়া আনিয়াছে,—এই ভারতবাসীর পুণ্য-প্রভাবে বৃহন্নন্দ সমীরণ নবোল্লাসে স্পন্দিত হইয়াছে । যাহারা ভারতবাসীর মত বহুমূল্য রত্ন এখনও পায় নাই, তাহারা হুভাগ্য বটে ; কিন্তু আমাদের মত হতভাগ্য আর কাহারো ? আমরা পূর্ব-পুরুষের পৈতৃক সম্পত্তি, পৈতৃক ধন-রত্ন ছেলায় হারাইতেছি ! গুপ্তগৃহে কি আছে, তাহা কেহ দেখিবারও চেষ্টা করিতেছে না । পরের চাকচিক্য বিলাস-ব্যাধিতেই তাহারা জর্জরিত হইয়াছে ! দেখিবার শক্তি তাহাদের নাই ।”

সন্ন্যাসীর কথা শেষ হইবার পূর্বেই বিরোধীর পূর্ব গগন পরিষ্কার হইয়া আসিল । এদিকে বৃদ্ধার অস্থিপঙ্করগুলিও ভস্মাকারে পরিণত হইল ।

সন্ন্যাসী ভক্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—“বাবা ! আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে । এখন আমি চলিলাম । আমার শেষ ছুটি কথা আছে । আজ হৃদয়ের আবেগে অনেক কথা তোমায় বলিলাম—তুমি বেশ জানিও, আবার এই ভারতে ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিবে, আবার ব্রাহ্মণ সেই ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, সংসার-চিন্তা দূরে ফেলিয়া, দিবানিশি অর্থকরী-বিজ্ঞার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া, আবার হিন্দু সেই পরমার্থদায়িনী চরমশান্তিবিধায়িনী মহাবিজ্ঞার আরাধনা আরম্ভ করিবে—

অবিদ্যার শত সহস্র প্রলোভন তখন তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া
পারিবে না।

আবার ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ইষ্টরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ধর্ম
জাগরিত করিবে। আবার সেই সবল অকপট শূদ্র আদি
বর্ণব্রাহ্মণের সেবায় নিযুক্ত ইষ্টরা আপনার আত্মোন্নতি করিবে।
আবার গ্রামে গ্রামে দয়ালু, নিষ্ঠাবান, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী
নিরহঙ্কারী ব্রাহ্মণ চতুষ্পাঠী শুলিয়া সমাজের হিতকর অধ্যাপকের
অধিকার লাভ করিবে। তাহাদের তখন আর কোন স্পৃহা
থাকিবে না—কামনা থাকিবে না—বাসনা থাকিবে না—
কোনও প্রকার লক্ষ্য থাকিবে না—থাকিবে কেবল
সমাজের ইষ্ট চিন্তা—দয়ালু গ্রামপরায়ণ শাসনকর্ত্তা ইন্রাজরাজের
মঙ্গলানুষ্ঠানে মততই নিযুক্ত থাকিবে। ব্রাহ্মণ চিরকালই রাজার
পক্ষিণ হস্ত—সেই ব্রাহ্মণই আবার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বিজাতীয়
শাসনকর্ত্তার নিকট খ্যাতি ও প্রভুত্ব লাভ করিবে। আর একটি
কথা, এই অসভ্য গৃহপালিতা বালিকা কামেরিয়্যার ভার তোমার
উপর দিয়া যাইতেছি ! সংসারে কামেরিয়্যার অনেক কাণ্ড অবশিষ্ট
আছে। বৃদ্ধার কুটীরের পূর্বদিকে পর্বতগাত্রে একখানি বৃহৎ লোহিত
বর্ণের প্রস্তর আছে। সেই প্রস্তরখানি অপসারিত করিয়া মৃত্তিক
নিম্নে একটা লোহ-পেটিকা দেখিতে পাইবে। তন্মধ্যে যে কাগজ
পত্র আছে, তাহা দেখিয়া ইহার সম্বন্ধে কতব্য নিদ্ধারণ করিও।”

সন্ন্যাসী একবার উর্ধ্বে আকাশের পানে চাহিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন ।

ভক্ত রোদন করিতে করিতে বলিলেন—“গুরুদেব ! সতাই কি আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিলেন ! বলুন, কবে আবার শ্রীচরণ-দর্শনে পুণ্য অর্জন করিব !”

সন্ন্যাসী ভক্তের নস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন । সে স্পর্শে ভক্ত যেন নবজীবন লাভ করিল । কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—“আবার একবার সাফাৎ হইবে । তুমি সংসারে ফিরিয়া যাও । না তোমার ভক্ত ভাবিতেছেন, সতীর নয়নাশ্রুর বিরাম নাই ; কিন্তু বাবা ! বিস্মৃত হইও না যে তোমরা হিন্দুর সন্তান ; ভুলিয়া যাইও না যে তোমরা তেত্রিশ কোটি দেবতার সেবক । নব রাধিও, সকল কার্য্যই তোমাদের ধর্ম্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । প্রভাত হইতে সূর্যাস্ত—আবার সূর্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত হিন্দুর প্রত্যেক কার্য্যই ধর্ম্মের সহিত গ্রথিত । আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে ও মৃত্যুতে ধর্ম্মকে দূরে রাখিয়া হিন্দুর কোন কার্য্যই হইতে পারে না । সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব নাই । গুরুদেবের আহ্বান পৌছিয়াছে । আর বিলম্ব করিবার শক্তি নাই ।” এই বলিয়া সন্ন্যাসী সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন । বোধ হইল যেন কঠিন বক্ষ পর্ত্তরাশি তাঁহাকে হঠাৎ গ্রাস করিল । চক্ষের নিমেষে সন্ন্যাসীকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না ।

ভক্ত তন্ময় হইয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। বাক্য থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু পর্কত-কন্দরে তখনও তাহার প্রতিধ্বনি হইতেছে—
মন্ত্রমুগ্ধের ত্রায় সেই বাক্তি বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে উত্থান করিল।

নবম পরিচ্ছেদ ।

পূর্ব পরিচ্ছেদ বর্ণিত ভক্ত, যিনি বিরোধীর গুশানে বসিয়া সন্ন্যাসীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, তিনি যে ভবরাম, আর সন্ন্যাসী যে সেই আগ্রার পাগল, তাহা বোধ হয় পাঠক-গণকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। ভবরাম সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইয়া ধন্ত হইয়াছেন।

ভবরাম গুরুর অদর্শনজনিত বেদনায় গুশানে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ রোদনের পর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—গুরুদেব ঝামেরিয়ার ভার আমার উপর প্রদান করিলেন কেন? পুনরায় ভাবিলেন “ঝামেরিয়ার অনেক কার্য অবশিষ্ট আছে। মৃত্তিকা নিম্নে লৌহপেটিকার মধ্যে কাগজপত্র দেখিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে হইবে।” জানি না, গুরুদেব কি কার্যের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া গেলেন! ইহা কি তাঁহার ছিলনা? আমাকে কি তিনি এই কঠিন কার্যের ভার দিয়া পরীক্ষা করিবেন? এই প্রকার কত কি চিন্তা ভবরামের মন অধিকার করিল।

এই ভীষণ স্থানে ঝামেরিয়াকে লইয়া চিন্তা করিলে ফলোদয়

হইবে না বুঝিয়া, ভবরাম তাহাকে উঠাইয়া বরণার জলে স্নানাদি করাইল। বৃদ্ধা জননী বাতীত কামেরিয়ার ত্রিসংসারে আর কেহ ছিল না! স্মরণ্য তাহার মনেব অবস্থা কিরূপ, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। কামেরিয়ার নয়নদ্বয় ক্রমাগত ক্রন্দনে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহার ক্রন্দনের বিরাম নাই। বৃদ্ধা জননীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া, কামেরিয় নিদ্রা যাইত, একমাত্র জননীই তাহার আশ্রয়স্থল ছিল। এখন কামেরিয়া কোথায় দাঁড়াইবে, কোথায় যাইবে? কামেরিয়া সপ্তদশবর্ষীয় হইলেও পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা অপেক্ষা অধিক সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার নাই। কামেরিয়া অপরের গৃহে কিছুদিন কার্য করিয়াছিল বটে; কিন্তু একদিন একটা লোক কামেরিয়াকে কু-অভিসন্ধিতে কিছু কথা বলিয়াছিল। অরণ্য কুটারে-প্রতিপালিত সরলা কামেরিয়া—সে কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া রজনী দ্বিপ্রহরের সময় ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধা জননীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া অশ্রু রোদন করিয়াছিল। সেই হইতে বৃদ্ধা সরলতা ও পবিত্রতার আধার কামেরিয়াকে মুহূর্তের জন্তও কোথাও যাইতে দিত না। বৃদ্ধা যখন কাষ্ঠাদি আহরণার্থ কুটার ত্যাগ করিয়া পর্বতে যাইত, কামেরিয়াও তাহার সঙ্গিনী হইত। কামেরিয়া জানিত, জগতে তাহার একমাত্র অবলম্বন সেই বৃদ্ধা জননী—আর তাহাদের ক্ষুদ্র কুটারখানি! বিরোহীর প্রত্যেক পর্বত ও অরণ্য তাহার নিকট পরিচিত ছিল।

সে কুরঙ্গিণীর আশ্রয় প্রকৃতির এই উলঙ্গ প্রদেশে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত ।

ভবরাম কামেরিয়াকে যে সব প্রশ্ন করিতে লাগিল, তাহার একটিরও সে উত্তর দিতে পারিল না । বোধ হয় তাহার এক বর্গও সে বুঝিল না ?

ভবরাম কামেরিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি এখন কোথায় বাইবে ? আমার সঙ্গে বাইবে কি ? আমার স্ত্রী তোমাকে দেখিলে কত আজ্ঞাদ করিবে, কত ভালবাসিবে ।” কামেরিয়া জলভরা চক্ষু দুটি লইয়া ভবরামের নুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল । তাহার কাতর দৃষ্টি যেন বলিতেছিল—“আমাদের কুটীর ও বিরোধীরা অরণ্য পৰ্ব্বত ছাড়া আর কি কোথাও কোন স্বতন্ত্র স্থান আছে না কি ? বাবুর স্ত্রী আমাদের রুইয়া ছাগলের মত কোন জিনিস নাকি ? আহা ! রুইয়া আমাকে কতই ভালবাসে ! কয়দিন তাহাকে আদর করি নাই ! সে আমাকে না দেখিয়া কতই চীৎকার করিতেছে ।” কামেরিয়ার জলভরা চক্ষু দুটি হঠাৎ টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল । ভবরাম কামেরিয়াকে লইয়া বড়ই বিপন্ন হইল । আহা ! সে যে সংসারের কিছুই জানে না ! বিরোধী পাহাড়ের নৃগশিশুগুলিরও আশ্রয়স্থান চেষ্টা আছে, তাহারাও অরণ্যের ভিতর আত্মগোপন করিতে জানে, কিন্তু কামেরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও সংসারে অনভিজ্ঞ ! কামেরিয়াকে ক্ষুধার সময় বুঝা না

থাওয়াইলে, সে কোনদিন থাইত না ! ভবরাম ভাবিল, কামেরিয়ার নতুনত গ্রহণ বা তাহাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা অরণো রোদন মাত্র।

ভবরাম সিন্ধুবসনে কামেরিয়ার হস্ত ধারণ করিয়া, তাহাকে বৃদ্ধার কুটীরে আনয়ন করিল। প্রথমতঃ বস্ত্রফল সংগ্রহ করিয়া কামেরিয়াকে বহুকষ্টে কিস্তিৎ আহার করাইল। কুটীর পার্শ্বে বৃক্ষতলে কামেরিয়াকে শয়ন করিতে বারবার অনুরোধ করিল। আজ মাসাধিককাল বৃদ্ধাকে লইয়া কামেরিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছে—মুহূর্তের জন্তও সে চক্ষু মুদ্রিত করে নাই। শোকে, দুঃখে, চিন্তা, আশঙ্কা ও রাত্রি জাগরণের অবসাদে কামেরিয়া শয়ন করিবামাত্র বৃক্ষতলে ঘুমাইয়া পড়িল।

যুমন্ত কামেরিয়ার মুখখানি যেন আমাদের প্রাচীন ভারতের ঋষিবালিকাদের মত ! কি সুন্দর সরলতাপূর্ণ মুখ ! লোভ, অহঙ্কার, কুটীলতা, হিংসা, ঘেঁষ, চাঞ্চল্য, ক্রোধ, প্রভৃতির চিহ্ন-মাত্রও সে মুখখানিতে নাই ! তাহার বর্ণ শ্রামবর্ণ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগোল। রক্ত অযত্নে-রক্তিত লবিত কেশগুলি স্নিগ্ধ সমীরণে ধুলার উপরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। যেন প্রকৃতি সুন্দরী তাহার সৌন্দর্য্য-কল্পার সিন্ধুকেশগুলি স্নিগ্ধ কোমল হস্তে স্পর্শ করিয়া অতি আদরে গুণ্ণ করিয়া দিতেছেন ! জননী ব্যতীত একমাত্র করিবার প্রবৃত্তি আর কাহার আছে ? অসংরহ শীতল

বাক্যে প্রকৃতি জননী নিদ্রিতা কন্ঠকে আরও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত করিতেছেন ।

ভবরাম ঝামেরিয়াকে এই অবস্থায় শায়িতা ও নিদ্রিতা দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল । গুরুদেব ! একি গুরুভার আমার উপর অর্পণ করিলেন । প্রভো ! এই সরলা, সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা ঝামেরিয়াকে লইয়া আমি কোথায় যাইব ?

আহা ! মা আমার শ্রামাঙ্গিনী, আলুলায়িতকুস্তলা, দিগ্বসনায় ত্রায়, ধরণীর বুকে শ্রামাঞ্চল পাতিয়া শয়ন করিয়া আছেন ! জগদ্ধাত্রী প্রতিমার ত্রায় সুগোল—কোমল মায়ের হাত দুইখানি,—করালবদনার ত্রায় লম্বিত কেশরাশি ! লক্ষী ঠাকুরাণীর ত্রায় সুন্দর হস্ত-পদের কোমল অঙ্গুলিগুলি ! দেবীর মতই স্বচ্ছ, নির্মল, আপনার ভেদজ্ঞানহীন হৃদয়খানি ! মাগো ! আজ কি মুহূর্ত্তে আমাকে দেখাইলি মা ! ভবরাম মস্তক অবনত করিয়া ধরংবার কাহার উদ্দেশে প্রণাম করিল । তাহার চক্ষে অজস্র দরবিগলিত ধারা ! ধারার পর ধারা আসিয়া ভবরামের বক্ষ ভাসাইয়া দিল । ভবরাম করযোড়ে বলিতে লাগিল—“মাগো ! তুই উপায় বলিয়া দে মা ! ঝামেরিয়াকে কোথায় লইয়া যাইব ?”

গুরুর আদেশ ভবরামের শ্রবণ হইল । প্রকৃতিস্থ হইয়া ভবরাম বৃদ্ধার কুটীরে প্রবেশ করি প্রস্তরের অম্লসন্ধান করিতে লাগিলেন । পূর্বদিকে পামাণ গাত্রে একস্থানে স্তূপাকার শুক কাঠ

সুসজ্জিত ছিল! কাষ্ঠরাশি অপসারিত করিবার সময় মনে হইল প্রস্তরখণ্ডকে গোপনে আবৃত রাগিবার জন্তই বৃদ্ধা এই স্থানে কাষ্ঠগুলি সুসজ্জিত করিয়া রাখিত।

বহুক্ষণ চেষ্টা করিবার পর ভবরাম অতি কষ্টে প্রস্তর-খণ্ডকে দূরে সরাইতে সমর্থ হইল। একটি গহ্বর দৃষ্ট হইল। গহ্বরে বহু অনুসন্ধানের পর একটি লৌহপেটিকা চক্ষে পড়িল। ভবরাম অতি কষ্টে লৌহপেটিকা উন্মোচন করিয়া তাহা ভগ্ন করিলেন। ভগ্নাংশে রাশি রাশি কাগজপত্র। সে সমস্ত কাগজপত্র বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। উহা পাঠ করিয়া শুনাইতে গেলে, পাঠকগণের ষোধ্যচ্যুতি ঘটিতে পারে। আমরা উহার সার মর্ম্ম পর পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিতেছি। পাঠক! দৈর্ঘ্য সংবরণ করুন—উহা পাঠ করিলে ষাণ্ঠবিক্রই বিশ্বাস্য হইবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

বাকুড়া জেলার অন্তর্গত সীতাপুর একখানি গওগ্রাম । এই গ্রামে রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় নামক একঘর মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাস করিতেন । তিনি একজন পরম হিন্দু এবং ধার্মিক ছিলেন । পুজা এবং সন্ধ্যাহিকেই তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইত । ব্রাহ্মণের বিংশতি বিধা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর এবং কিছু জমার জমিও ছিল । গ্রামেই তাঁহার সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ হইত । হিন্দুর বার মাসে তের পার্বণ কিছুই তাঁহার গৃহে বাদ বাইত না । তখন জুতা, জামা, ছাতা ইত্যাদির প্রচলন ছিল না—বস্ত্র মনের ভায় বিলাসিতা-শ্রোত বান্ধালীর ধরে ধরে প্রবেশ করে নাই । ততরাং ব্রাহ্মণকে একটি কপর্দকও বৃথা ব্যয় করিতে হইত না । পরিবারের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী, দুইটি লাক্ষলবাহী বলাদ, তিনটি পুত্রবতী গাভী ও ভৃত্য রামচূর্ণত ছিল ।

ব্রাহ্মণ চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যাভ্যাগ করিয়া শৌচাদি ক্রিয়া সমাপন করিতেন । বস্ত্র পরিভ্যাগ করিয়া একখানি রিকার কাপড় পরিধান করিতেন । তারপর সাজি হস্ত

গৃহদেবতা জনার্দনশিলার জন্ত পুষ্পচয়নে বহির্গত হইতেন।
 সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই পুষ্পচয়ন সমাধা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন
 করিয়া গামছাখানি স্বন্ধে ফেলিয়া প্রাতঃস্নানে বহির্গত হইতেন।
 স্নান করিয়া আসিয়াই জনার্দনের ঘরে প্রবেশ করিতেন।
 দ্বিপ্রহরের পূর্বে তাঁহার পূজা ও সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ হইত না।
 তারপর সহধর্ম্মিণী ভোগ আনিয়া দিতেন, ভোগাদির পর উভয়ে
 প্রসাদ পাইতেন। মৎস্য বা মাংস ব্রাহ্মণের গৃহে কখনও প্রবেশ
 করিতে পাইত না। আতব অন্ন, নিরামিষ ব্যঞ্জন, গৃহজাত-দুগ্ধের
 বিস্তৃত গব্যায়ত ও দুগ্ধে জনার্দনের ভোগ হইত। ঠাকুরের
 মিবেন্দিত দ্রব্য ব্যতীত ব্রাহ্মণ-দম্পতি কোনদিন কোন জিনিস
 আহার করিতেন না। আহাৰাদির পর ব্রাহ্মণ শাস্ত্র-গ্রন্থাদি
 লইয়া একটু বসিতেন। অপরাহ্নে চাষবাসের তত্ত্বাবধানের জন্ত
 একবার ভগবানের নাম গান করিতে করিতে ক্ষেত্রে গমন করি-
 তেন। অন্নকণ্ঠ রামচূর্ণভের সঙ্গে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে কথাবার্তা
 করিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিয়া আসিতেন। পুনরায় সন্ধ্যা-স্নান
 করিয়া জনার্দনের গৃহে প্রবেশ করিতেন। সন্ধ্যারতি ও আত্মিকাদি
 কার্য্য সম্পন্ন করিতে কোন কোন দিন রজনী দ্বিপ্রহর অতীত
 হইয়া যাইত। তারপর গৃহিণীর সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতে
 করিতে নিদ্রা যাইতেন। সাত আট দণ্ডের অধিক ব্রাহ্মণ-
 দম্পতি কখন নিদ্রা যাইতেন না। তখন ডাক্তারি চিকিৎসার

প্রচলন ছিল না এবং দম্পতি-দুগল কখনও জীবনে ঔষধ সেবন করেন নাই। ব্রাহ্মণ, জীবনের মধ্যে একবার তুলসী পত্রের রস ও ব্রাহ্মণী একবার বিষ পত্রের রস ঔষধরূপে সেবন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের তপ্তকাঞ্চনের ত্রায় দেহখানি দেখিলেই তাঁহার মটুট স্বাস্থ্যের পরিচয় পাওয়া যাইত। চাম্বাসের জন্ত ব্রাহ্মণ এখন চিন্তিত হইতেন না। তিনি বলিতেন, জনাঙ্গিনের ভোগের প্রবৃত্তি উনি নিজেই করিবেন। ব্রাহ্মণের এই বিশ্বাসে জনাঙ্গিন নিজ হস্তে কৃষিকাৰ্য্য না করিলেও রামহর্লভই সমস্ত সম্পন্ন করিত। ভগবদ্‌চিন্তা ব্যতীত অত্র কোন চিন্তাই ব্রাহ্মণের হৃদয়ে এখন স্থান পাইত না। পোষ মাঘ মাসে রামহর্লভ একাশিত রামহর্লভের বল ধারণ করিত। এ সময় তাহার আহার নিম্নলিখিত মত থাকিত না, দিবাভাগে কাষ্ঠের তক্তার উপর ধাত্রা আত্রে বিচালীগুলি শুছাইয়া ফেলিত। তার পর দুই দুপাকার খড়ের উপরেই স্বহস্তে প্রস্তুত এক মনছা পাতিয়া ঘুমাইয়া লইত। এইরূপে ধান-কাণ্ড, সরু ধাত্রাগুলি জনাঙ্গিনের ভোগের জন্ত করিত। তারপর অতিথি, লক্ষীপূজা, রাস প্রভৃতি পৃথক পৃথক গোলায় রাখিয়া দিত। ব্রাহ্মণীর প্রসাদ যে দিন না পাইত, সে দিন করিত না। জনাঙ্গিনের ভোগের অন্ন আনিয়া দিত।

বিড় বিড় করিয়া বলিত। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কাছে বসিয়া তাহাকে নানাপ্রকারে শাস্ত না করিলে রামহর্লভ মুখে অন্ন তুলিত না।

ব্রাহ্মণ-দম্পতির সন্তানটির আশা ছিল না, কিন্তু অনেক বয়সে জনার্দন মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ব্রাহ্মণের একটি সন্তান হইল। রামহর্লভের জীব আর আনন্দের সীমা নাই। ‘আট কড়াইয়ে’র দিনে রামহর্লভ পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। রামহর্লভ চট্টোপাধ্যায় সন্তানের নাম রাখিলেন জনার্দন।

পাঁচ বৎসর পাঁচ মাসে শুভদিনে জনার্দনের হাতে-খড়ি হইল। ব্রাহ্মণ সেদিন খুব ঘট করিয়া জনার্দনের ভোগ দিয়া অনেক দীন-ক যত্ন করিয়া ভোজন করাইলেন। দিবাভাগে সে দিন পতি আর জল গ্রহণ করিলেন না।

১২সর বয়স পর্য্যন্ত জনার্দন গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় রিল। তখন ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে।

৫ এক মাইল দূরে বাবুন-হাট নামক একখানি গ্রামে ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া একজন ন। তিনি রামহর্লভকে বড়ই ভক্তি করিতেন। পাধ্যায় কলিকাতায় দালালী ব্যবসায় করিতেন। বেশ ছপক্সা সঞ্চয়ও করিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন—“রামহর্লভের দাদ।

জনার্দনকে আমার সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিন। ছেলেটি যেমন স্ত্রী, তেমনই বুদ্ধিমান। ইংরাজী না শিখিলে আজকাল পরসা হয় না। এই দেখ না, আমি যদি ইংরাজী জানিতাম, তবে সাহেব-স্ববাকে হাতের মুঠায় রাখিতাম। জনার্দনকে আমি কলিকাতায় রাখিয়া ইংরাজী স্কুলে ভর্তি করিয়া দিব।”

ইংরাজী শিক্ষার নামে রামসুন্দর চমকাইয়া উঠিলেন; কিন্তু কিছু প্রকাশ না করিয়া বলিলেন—“আচ্ছা ভাই, গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তোমাকে পরে বলিব।” কিন্তু গৃহিণীর সঙ্গে ঠাহার পরামর্শ করিতে হইল না। ভৈরব-গৃহিণী আসিয়া নানা বক্তিতর্কে চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণীকে রাজী করিয়া ফেলিলেন।

ভৈরব-গৃহিণী বলিলেন—“এই দেখনা ভাই, উনি যদি চাষ লইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতেন, তবে কি সোণাদানার মুখ দেখিতে পাইতাম। পাড়ারগেয়ে হইয়া চাষবাস করিয়াই জীবন মাইত। একটু ইংরাজী শিখিলে জনার্দন কত টাকা উপায় করিতে পারিবে, কলিকাতায় কত বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ হইবে, সাহেবের চাকুরী করিয়া দশ জনের একজন হইবে ইত্যাদি।”

পুত্রের ভাবী সুখেছা কোন্ জননী না কামনা করেন? তিনি সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে ভৈরব-দম্পতির হস্তে সমর্পণ করিলেন। সীতা-পুত্রের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পরম ধার্মিক এবং নিষ্ঠাবান হিন্দু রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র জনার্দন চট্টোপাধ্যায় পিতৃপিতামহের নামে

কলঙ্ক লেপন করিয়া, কলিকাতায় ইংরাজী শিখিতে গেল। পুত্রবে
বিদায় দিয়া রামসুন্দর জনার্দনের ঘরে প্রবেশ করিয়া আকুল প্রাণে
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দন করিতে করিতে তিনি বলিতে
লাগিলেন—“জানি না প্রভে! তোমার কি ইচ্ছা! বংশের
অবনতির পথ বুঝি আমিই প্রশস্ত করিয়া দিলাম।” বলিতে বলিতে
ব্রাহ্মণ বসিয়া পড়িল। সমস্ত দিন ব্রাহ্মণ আর, জন্মস্মরণ
করিল না।

ভৈরব ও ভৈরব-গৃহিণীর এই কার্যের মধ্যে “নিঃস্বার্থতা” কিছু
মাত্র ছিল না। তাঁহারা বলিষ্ঠ ও সুস্থ জনার্দনের রূপ, গুণ ও বিজ্ঞা
বুদ্ধি দেখিয়া, একমাত্র কণ্ঠা বিজলীর সঙ্গে জনার্দনের বিবাহ
দিবার সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। ভৈরবের অল্প সন্তানদি
গণের মধ্যে, একমাত্র কণ্ঠা বিজলীই তাহাদের জীবনসর্বস্ব ছিল।
অধিক সচ্ছলতা হেতু এই বালিকা পিতামাতার নিকট যৎপরোনাস্তি
স্বর্গে পালিতা হইয়াছিল। সাহেব-সুবার সঙ্গে ঘুরিয়া ও জুড়ীগাড়ী
ওয়ালা অর্ধ-ক্রিস্টান বড়লোকগণের সঙ্গে মিশিয়া, পল্লীগ্রামবাসী
ভৈরব বন্দোপাধ্যায় কলিকাতায় ভৈরববাবু হইয়াছিলেন
সংসর্গদ্বায়ে ধীরে ধীরে ভৈরববাবুর পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল।
তিনি প্রায়ই গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিতেন—“যদি বিজলী আমাদের
সন্তান হইত, তবে উহাকে ইংরাজী শিখাইয়া একজন মাস্টার করিয়া
রাইতাম।” স্বামীর ইচ্ছা ভৈরব-গৃহিণী কিছুতেই পূরণ করিতে

পারিলেন না । তাঁহার আর পুত্রসন্তান হইল না । তাহার পর জনার্দনের উপর ইহাদের দৃষ্টি পড়িল । তাহাকে জামাতারূপে বরণ করিয়া, ইংরাজী লেখা-পড়া শিখাইলে পুত্রের ক্ষোভ কতকটা মিটিবে—এই আশায় দম্পতি-যুগল কতকটা আশ্বস্ত হইল । এতদিনে সেই চিরঈশ্বরিত সঙ্কল্প, কার্য্যে পরিণত হওয়ায় স্বামী-স্ত্রীর আর আনন্দের সীমা রহিল না ।

বাঁকুড়া জেলার বামুনহাট গ্রামের ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়—ওরফে কলিকাতার দালাল ভৈরববাবু, জনার্দনকে শাস্ত্র শিক্ষা মধুর পল্লীভবন হইতে, তাহার ধর্ম্মপ্রাণ জনকজননীর ক্রোড় গৃহ করিয়া, কলিকাতায় লইয়া গেলেন এবং তথায় তাহাকে ইংরাজী শুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন । ক্রমে ক্রমে ইংরাজী জুতা ও ইংরাজী ধরণের কোট প্রভৃতিতে সেই পল্লী-বালকের দেহ শোভিত হইল ।

বিজলীর বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন দশ বৎসর বয়সে জনার্দনকে ভৈরববাবু কলিকাতায় আনিয়াছিলেন । এখন বিজলীর বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে, জনার্দনের বয়স সপ্তদশবর্ষ উত্তীর্ণপ্রায় । এই সাত বৎসরের মধ্যে বিজলী ও জনার্দনের অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে ।

কয়েকবৎসর পূর্বে বিজলী ও জনার্দন একত্রে ভ্রমণ করিত, একসঙ্গে ভোজন করিত, গল্প করিত, কিন্তু এখন আর সে প্রকার করে না । সঙ্কোচ ও হাজ্জার আবরণ উভয়ের মধ্যে

একটা ব্যবধানের রেখা অলক্ষ্যে টানিয়া দিয়াছে। কৈশোরের এই মধুর গভীর ভিতরে হঠাৎ আসিয়া বালকবালিকা যেন একটা নূতন জীবনের স্বাদ পাইয়াছে। বিজলী সাধামত জনার্দনের সহিত সাক্ষাৎ করে না; তবে একত্রে বাস করায়, ইহা সে সব সময়ে রক্ষা করিতে পারিত না। জনার্দন প্রথম প্রথম বৎসরে দুই তিনবার তাহার পিতামাতার কাছে যাইত। জনার্দনের প্রসাদ থাইয়া কত আনন্দলাভ করিত,—মাতার ক্রোড়ে বসিয়া কলিকাতার কত গল্প বলিত,—রামভূষণ দাদার স্বপ্নে উঠিয়া, বক্ষে মুখ রাখিয়া বালা-স্বৃতিকে সজীব করিয়া তুলিত। ক্রমশঃ জনার্দন বৎসরে একবার গ্রীষ্মকালে বাটা যাইতে আরম্ভ করিল। তারপর দুই বৎসর আর স্বগ্রামে গমন করিল না। একবার দেশে হইতে আসিয়া জনার্দনের খুব জ্বর হইল, ডাক্তারের কঠোর নিষিদ্ধি থাইয়া সে জ্বর আরোগ্য হইল বটে; কিন্তু সেই অবধি জনার্দনের ভাবী শত্রুর মহাশয় আর তাহাকে দেশে যাইতে দেন নাই। জনার্দন দেশে যাইবার কথা বলিলেই ভৈরববাবু বলিতেন—“বাবা! আবার দেশের নাম করিতেছ? দেশে যাঁহর জ্বর লইয়া আসিলে। দেশের জল হাওয়া কি আর পূর্বের নত আছে? তোমার পিতামাতা তৃতীয় প্রহর না হইলে অন্নগ্রহণ করেন না; দশটার সময় তোমার খাওয়া অভ্যাস; জনার্দনের ভোঁন না হইলে তোমার ঔষধ খাইতে দেন না। সেই সারেক

বন্দোবস্ত তোমাদের ঘরে এখনও বর্তমান ! এখন দিন দিন লোক সভা হইতেছে, কিন্তু তোমার পিতামাতা “যে তিমিরে সেই তিমিরে।” জনার্দনও আর এখন সীতাপুরের সেই পাড়াগেয়ে জনার্দন নাই ! সে এখন কলিকাতার জনার্দনবাবু হইয়াছে । বিশেষতঃ বিজলীকে ছাড়িয়া তাহার কোথাও গাইবার ইচ্ছা ছিল না, সূতরাং ভাবী-শুভর মহাশয়ের কথাগুলি যুক্তিবৃত্ত বলিয়া তাহার মনে হইত ।

সেই বৎসরে বৈশাখ মাসে গৌরাবকাশে বিজলীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল । রামসুন্দরের অন্তেই প্রায় এই কার্য্য সমাধা হইল । পিতা রামসুন্দর বুঝিলেন, আমি “না” বলিলেও পুত্র জনার্দন সে কথা শুনিবে না । বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের নিকট অপমানিত হওয়া তিনি কষ্টবান মনে করিলেন না । সূতরাং শুভকার্য্য নিৰ্ব্বিয়েই সম্পন্ন হইয়া গেল ।

বিবাহের পর দেখিতে দেখিতে সুদীর্ঘ তিনটী বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে । জনার্দন ইহার ভিতর আর দেশে আসে নাই । ইহাতে তাহার জনকজননী বহু দুঃখিত—ততোধিক দুঃখিত জনার্দনের রামহর্ষভ দাদা ! পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখিবার জন্য বৃদ্ধ রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় কলিকাতার আসিবেন ভাবিলেন ; কিন্তু গৃহ-দেবতা জনার্দনের সেবার বাধ্যতাই হইবে ভাবিয়া, তিনি আসিতে পারিলেন না । সূতরাং তৃত্য রামহর্ষভকে পুত্র ও পুত্রবধূ আনিবার জন্য কলিকাতার পাঠাইলেন ।

একটি দীর্ঘাকার বংশ-মণ্ডি ঝগলে করিয়া ও কটিদেশে ক্ষুদ্র বুচকি বাঁধিয়া রামচন্দ্রভ কলিকাতায় ভৈরববাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। তখন বেলা চারিটা বাজিয়াছে। জনার্দনবাব ও ভৈরববাবু তখনও কর্মস্থল হইতে বাটা ফিরেন নাই।

বলিতে ভুলিয়াছি। জনার্দনবাব বিবাহের পরেই ইংরাজী বিদ্যা সমাপন করিয়া, শ্বশুর ভৈরববাবুর সুপারিশে একটি বড় সওদাগিরি আফিসে চাকুরী করিতেছেন। যেদিন প্রথম ভৈরববাবু জামাতাকে সাহেবের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা কহিতে স্বকর্ণে শুনিলেন, সেদিন উহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। জামাতা একটা পাশ করিতে পারিলে ভৈরববাবু আরও খুসি হইতেন; কিন্তু শ্বশুরের ছরদৃষ্টে তাহা ঘটে নাই, এজ্ঞা ভৈরববাবুও হুঃখিত নহেন। গৃহিনীকে প্রায়ই বলিতেন—“জনার্দন আমাদের পাশ করে নাই বটে; কিন্তু ইংরাজীতে খুব পারদর্শী হইয়াছে। সাহেবের সহিত যদি তাহার ইংরাজী কথাবার্তা শ্রবণ কর, তাহা হইলে তুমি অবাক হইয়া যাইবে।” ভৈরব-গৃহিনী মৃদু হাসিয়া বলিতেন—“আহা! উহার দীর্ঘজীবী হউক—আমি যেন উহাদের কোলে মরিতে পারি।”

রামচন্দ্রভ ভৈরববাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া ডাকিল “বাড়ুজ্যোমশায় কোথা গো? ও বাড়ুজ্যোমশায়?”

একজন হিন্দুস্থানী বেহারা বাহিরে আসিয়া কক্ষদ্বারে বলিল, “কুদ্ কোন্ হায়—কাহে চিন্তাতা?”

রামচূর্ণভের হাঁটুর উপরে কাপড় ! এক পা ধূলা, ধাত্তের ধূলা মস্তকের দীর্ঘ কেশে পূৰ্ণ হইতেই সঞ্চিত ছিল, তাহার উপর কলিকাতার রাজপথের ধূলা জমিয়া তাহার মস্তকটাকে পূর্ণ করিয়াছে ।

রামচূর্ণভ বলিল—“বাঁড়ুজ্যে মশায় কোথা ? আমাদের জনার্দন কোথায় ?”

বেহারাটা তাহার এই ধৃষ্টতাপূর্ণ উত্তরে রাগে কি বলিতে বাইতেছিল ! তাহার বাবুকে ও জামাইবাবুকে অপমানসূচক বাক্যে সম্বোধন ! এমন সময় গৃহিণী আসিয়া বলিলেন—“কে রে রামচূর্ণভ ? আয় বাড়ীর মধ্যে আয় ।”

গিন্নি রামচূর্ণভকে ছুটি রসগোল্লা জল খাইতে দিলেন । রামচূর্ণভ মনে মনে হাসিয়া বলিল মা ঠাকরুণ কি আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছেন । এই প্রকার শাদা গোল্লা যে দশ গণ্ডা পাইলেও আমার উদর পূর্ণ হয় না । ইহাই কি কলিকাতার জলযোগের নমুনা ! জঠরাগ্নিতে তখন তাহার পেট পুড়িয়া বাইতেছিল ।

রামচূর্ণভ গৃহিণীকে কণ্ঠার ও জনার্দনের কথা আবার জিজ্ঞাসা করিল । গৃহিণী বলিলেন—“আজ তাঁহাদের নিমন্ত্রণ আছে । আফিসের পর নিমন্ত্রণে যাইবেন । আসিতে সক্ষ্য হইবে ।”

একটু পরেই গৃহিণী রামচূর্ণভকে আহ্বান করিতে ডাকিলেন । সন্ধ্যা বালাম চাউলের অন্ন প্রথমে যাহা দিয়াছিল, তাহা তিন

গ্রাসেই শেষ হইল । বামুন ঠাকুর তিনবার অন্ন পরিবেশন করিল । চতুর্থবারে রামহর্লভের কর্ণে হস্তরব প্রবেশ করিল । রামহর্লভ আর অন্ন লইল না । বেচারীর ক্ষুধার অর্দ্ধেকও তখন উপশম হয় নাই ।

আচমন করিতে করিতে বেচারী দুইবার চক্ষু মুছিল । তাহার প্রভুপত্নী কাছে বসিয়া কত বস্ত্রে তাহাকে ভোজন করান, আর আজ তাঁহার বধুনাতা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, বিজ্ঞপূর্ণ হাসি হাসিল ; রামহর্লভের চক্ষুহুটি ক্ষোভে অভিমান জলে ভরিয়া আসিল ।

পরক্ষণেই রামহর্লভের মনে পড়িল, ইহারা ত নিরামিষ ভোজন করে না । যদিও মাছ আমার পাতে দেয় নাই, তথাপি মাছের সংস্পর্শেই ত রান্না হইয়াছে ! রামহর্লভ নর্দমার ধারে গিয়া বসি করিয়া ফেলিল । একটি অন্নও তাহার উদরে রহিল না । পরে সে চুপ করিয়া বহির্কান্টার এক পার্শ্বে শয়ন করিল ।

সন্ধ্যার পর ভৈরববাবু ও জনার্দন গৃহে আসিলেন । পথশ্রমে রামহর্লভ তখন ঘুনাইয়া পড়িয়াছে । ভৈরববাবু উপরে চলিয়া গেলেন । জনার্দনবাবু বৈঠকখানা আসিয়া বসিলেন । বেহার গড়গড়াহ ভামাক দিয়া গেল । ক্রমে ক্রমে জনার্দনবাবুর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আসিয়া উপস্থিত হইল । তাহাদের গল্প ও উচ্চ হাস্যরবে গৃহখানি মুখরিত হইয়া উঠিল ।

জনার্দনবাবুর বন্ধুবর্গের কৌতুকহাস্তের শব্দে রামহর্লভের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে নেত্র মার্জনা করিয়া ইতস্ততঃ চাহিল, প্রথমতঃ জনার্দনবাবুকে রামহর্লভ চিনিতেই পারিল না ! সুন্দর টেরি, গাত্রে শুভ্র ধোপদস্ত সুন্দর কামিজ, তত্পরি সোণার বোতাম। মুহুমুহু রুমালে মুখ মুছিতেছেন ! রামহর্লভ ভাবিতে লাগিল, ইনিই কি আমাদের সেই জনার্দন ! বাহাকে বুকে করিয়া গালুষ করিয়াছি ! আমি ঘোড়া হইয়াছি, সে পিঠে চাপিয়াছে, বুকে শুইয়া কত মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছে, আমি ডানহাতে তাহা মুছিয়াছি, খাবার জিনিষ নষ্ট করিয়াছে, আমি তাহা খাইতেও বিধা করি নাই। এই কি আমাদের সেই জনার্দন ? রামহর্লভ ভাবিল, তাহার ঘুমের ঘোর এখনও বুঝি কাটে নাই।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে স্থির করিল, সত্যি যে জাগ্রত। নিদ্রা তাহার অনেকক্ষণ দূর হইয়া গিয়াছে।

রামহর্লভ উঠিয়া আসিয়া জনার্দনের সম্মুখে দাঁড়াইল। বাবুদের দেখিয়া একটু সঙ্কচিতভাবে বলিল—“কি ভাই জনার্দন ! ভাল আছ ত ? বাপ-মাকে ও তোমার এই রামহর্লভ দাদাকে একেবারে ভুলে গেছ ! কতদিন বাড়ী যাওনি বল দেখি ? কলিকাতার থাকিলেই কি এমন বিষ্টানের মত হ’য়ে যেতে হয় ! বউনাকে নিয়ে ঘরে চল ! কর্ত্তা, মাঠাকরুণ, তোমাদিগকে নিতে আসিয়াছেন।”

মন্মথাতনায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বপ্নে রামহর্লভ একবারেই কথাগুলি বলিয়া ফেলিল। বন্ধুবর্গ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঘরে অনেককণ: পর্য্যন্ত বিকট হাস্তের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল! কেহ বলিল—“এটা কেহে?” কেহ বলিল “পাগলটাকে কোথা থেকে ধরে আনলে হে?” কেহ বলিল—“পাড়াগাঁয়ে জানোয়ার স্বচক্ষে দেখা গেল।” কেহ ইংরাজীতে বলিলেন—“লোকটা কি কাল ভাই! রাত্রে দেখিলে ভূত ভিন্ন অণ্ড কিছু মনে হয় না।” বন্ধুবর্গের মন্তব্যের আর বিরাম হইতেছে না।

জনর্দনবাবু লজ্জায় জড়সড় হইলেন! অসভ্যতা আর একটু অপেক্ষা করিতে পারিল না! তারপর ক্রোধ হইল—বাটীর বেহারার উপর। সে বেটা উহাকে এখানে আসিতে দিল কেন! প্রকাশে বলিল—“ও আমাদের দেশের চাকর হে! অনেকদিন আছে কি না, তাই আপনার লোকের মত ব্যবহার করে।” রামহর্লভের দিকে চাহিয়া বলিল—“কাল সকালে কথা হবে এখন যা।” এই বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন “বেহারা”। বেহারা ছুটিয়া আসিয়া বলিল “হজুর”।

“এই লোকটাকে তোর ঘরে নিয়ে যা।” বাবু এই হুকুম দিয়া আবার আমোদ-কৌতুকে মত্ত হইলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য রামহর্লভ আসিয়া রস ভজ করায় তিনি বন্ধুগণের সিকট কমা প্রার্থনা করিতে জট করিলেন না।

রামহর্লভের রাত্রে নিদ্রা হইল না। যাতনায় সে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কত কথাই তার মনে হইতে লাগিল। ক্রিষ্টানী লেখাপড়ার উপর তার ঘৃণা হইতে লাগিল।

ক্রোধে, ঘৃণায়, লজ্জায় সে মাথার চুল ধরিয়া টানিতে লাগিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও নাঠাকুরাণীর জন্ত তার কান্না পাইতে লাগিল। তার মনে হইতেছিল, একবার গঙ্গার পবিত্র সলিলে জনার্দনকে স্নান করাইয়া দেশে লইয়া যাইতে পারিলে হয়; কিন্তু তাহা ত হইবে না। ঐ ডাকিনী বুঝি আমার সোণার জনার্দনের মাথা পাইয়াছে! কলিকাতার হাওয়া লাগিলেই কি মানুষের এমন মাথা বিগড়াইয়া যায়? আহা! ভাইটী আমাদের একবারেই হাতছাড়া হইয়া গেল। বাবা জনার্দন! তুমি একি করিলে? ছোকরাগুলি সব জনার্দনকে বিদ্রিয়া বসিয়া কি করিতেছিল? সকলেরই মস্তকে টেরিকাটা! কোঁচান কিন্‌কিনে ধুতি পরা। এইগুলাই বুঝি ব্যারাম! বাবা জনার্দন! ভাইটির আমার ব্যারাম আরোগ্য করিয়া দিও! আমি ঘরে লইয়া গিয়া চরণামৃত খাওয়াইয়া তাহাকে পবিত্র করিব! আমার জীবন থাকিতে আর কখন কলিকাতার হাওয়া উহার গায়ে লাগিতে দিব না। নয়নাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া অস্থিরচিত্তে রামহর্লভ সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিল।

প্রভাতে জনার্দনের সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া, রামহর্লভ আরও তবুদ্বি হইল! কত সাধ্য, সাধনা, উপরোধ, অনুরোধ করিল।

একটি দিনের জ্ঞান বউমাকে লইয়া গৃহে যাইতে বলিল। উপেক্ষার হাসি হাসিয়া শিক্ষিত জনার্দনবাবু অশিক্ষিত রামচন্দ্রভৈরব কথায় উড়াইয়া দিলেন। শেষে ইংরাজী কায়দায় বলিলেন—
 “আমার পিতামাতাকে বলিও, তাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারায় আমি দুঃখিত হইলাম। যদি আফিসের ছুটির সুবিধা করিতে পারি, তবে একবার দেশে যাইবার চেষ্টা করিব।”

রামচন্দ্রভৈরব চক্ষের তপ্ত অশ্রু মুছিতে মুছিতে বিদায় হইল।
 বাটী আসিয়া রামচন্দ্রভৈরব ও তাঁহার গৃহিণীর সঙ্গে কথা কহিতে তাঁহার লাইস হইল না।

রামচন্দ্রভৈরব কাছে কর্তা-গৃহিণী যখন পুত্রের উন্নতির কথা শুনিলেন, তখন আর তাঁহাদের দুঃখের সীমা রহিল না। জনার্দনের গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ-দম্পতি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

পূর্বোক্ত ঘটনার পর বিংশতি বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে ।
এই সময়ের মধ্যে যে ছ'একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা
এই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব ।

পুত্রের আচরণ ও অধোগতি দেখিয়া, রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়
গৃহিণীকে লইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন । যাইবার সময় গৃহ-
দেবতা জনার্দনকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা গৃহত্যাগ করেন । বিশ্বস্ত
ভ্রাতা রামচন্দ্রকে জমিজমা তৈজসপত্র যাহা কিছু ছিল, সমস্তই দানপত্র
লিখিয়া দিয়া যান । দানপত্রে লিখিত ছিল, রামচন্দ্র তাঁহার
সন্তান অপেক্ষা প্রিয় ও স্নেহের সামগ্রী । সে যতদিন জীবিত
থাকিবে, ততদিন এই বিষয়ের আয় হইতে তাঁহার অস্বস্তিত
ক্রিয়া-কলাপ, অতিথি-সেবা ও ব্রাহ্মণভোজনাদি বজায় রাখিবে ।
জনার্দনের ঘরে দিবারাত্র একটি ঘরের প্রদীপ জলিবে । তাহার
শেষ সময়ে এই কার্যগুলি বজায় রাখিতে সে বিষয়ের বন্দোবস্ত
করা যেক্রম কর্তব্য বুঝিবে, তাহাই করিবে । আমার বিষয়াদির
উপর ভবিষ্যতে আমার পুত্রের কোন দাবী থাকিবে না । অতঃ
সময়ে জনার্দন চট্টোপাধ্যায় আমার ত্যক্ত-পুত্র ।

বিংশতিবর্ষের মধ্যে রামজুলভ বিষয়াদি অনেক বাড়িইয়াছে। ব্রাহ্মণের ধর্ম ক্রিয়াগুলি সমস্তই বজায় আছে, এখন দলে দলে অতিথি-সন্ন্যাসীর ভজন-সঙ্গীত ও বোম্ বোম্ হর হর শব্দে সেস্থান অহরহঃ মুখরিত হয়। রামজুলভ বৃদ্ধ হইয়াছে। পরিধানে কৌপীন, সর্কাস ভাঙ্গাছাদিত—একবেলা ছুটি আতপ অন্ন গ্রহণ করে—আর মুখে কেবল “জনর্দ্দন” “জনর্দ্দন।”

রামজুলভ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সহধর্মিণীকে লইয়া কোথায় গিয়াছেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যান। কেহ কেহ বলে, সেই সন্ন্যাসীই ইহাদের গুরু। জনপ্রবাদ নানা প্রকার—শুনিতে পাওয়া যায় না কি তাঁহারা কুরুক্ষেত্রের একটি অরণ্যে সন্ন্যাসীর আশ্রমে বাস করিতেছেন। আবার কেহ বলেন, কাশীধামে তাঁহাদের নশ্বর দেহের অবসান হইয়াছে। কেহ বা বলেন, এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহারা হিমালয়ের দিকে চলিয়া গিয়াছেন।

এদিকে ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর এক বৎসর পরেই তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি জানাতা ও কল্যাণ নামে বিষয়াদি উইল করিয়া যান। দালালি করিয়া ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন। চৌরঙ্গীর দুইখানি ত্রিতল অট্টালিকা, বিডন্ ট্রাটের তিনখানি বাড়ী, একজন টিকার কোম্পানীর কাগজ এবং তাঁহাদের বাসভবন চিংপুরের

বৃহৎ অট্টালিকা এখন জামাতা জনার্দন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তি । ইহা ব্যতীত ভৈরববাবুর দ্বীর সমস্ত অলঙ্কার ও নগদ লক্ষাধিক টাকা জনার্দনবাবু পাইয়াছেন । ভৈরববাবুর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে, জনার্দনবাবু নিলামে কতকগুলি নূতন জমিদারী খরিদ করিয়াছেন । এই জমিদারীর বাৎসরিক আয় অনান লক্ষ টাকা । জনার্দনবাবু এখন সহরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ; তাঁহার নাম-ডাক যথেষ্ট—সাহেব-স্বার কাছে তাঁহার খাতির ও সম্মানের সীমা নাই ।

বিজলীর দুইটা সন্তান হইয়াছে । জ্যেষ্ঠ হরপ্রসাদের বয়স দার বৎসর এবং কনিষ্ঠ রামপ্রসাদের বয়স দশ বৎসর । একজন সাহেব-শিক্ষক আসিয়া ছেলে দুইটাকে দুই বেলা পড়াইয়া যান । জনার্দনবাবু এখন সাহেবী পরণে জীবন যাপন করেন, সাহেবী-যানায় তাঁহার গৃহাদি সজ্জিত । মাঝে মাঝে তাঁহার বরানগরের বাগানে নাচের মজলিস্ হয় এবং বড় বড় সাহেব-বিরি ইহাতে নিমন্ত্রিত হ'ন ।

কয়েক বৎসরের মধ্যে জনার্দনবাবু আরও সভ্য হইলেন । কলিকাতার সমস্ত বড় বড় লোক তাঁহার বন্ধু হইল । রাত্রিতে প্রায়ই গৃহবাস ঘটিত না । তরুণি বাক্সবন্দী হইয়া কত রকমের বৈলাতী বৈতল নিত্য গৃহে শোভাবর্ধন করিতে লাগিল । কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল এবং নানাবিধ ছুরারোগ্য

রোগ তাঁহার দেহ অধিকার করিয়া বসিল । আরও কিছুদিন গত হইবার পর তাঁহার লিভার বিকৃত হইল । সহরের বড় বড় ইংরাজ ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করিলেন । বাটীতে মেডিক্যাল কলেজ বসিল ; কিন্তু কিছুক্টেই কিছু হইল না । শীতপ্রধান দেশবাসী, মধ্যমাংসভোজীদের জ্বররূপে কু-খাণ্ড উদ্ভব করিলে, শাকাম্রভোজী বাঙ্গালীর যাতা যাটে, এক্ষণে জনার্দনবাবুরও তাহাই হইল । দিন দিন তাঁহার পরমাণু হাস হইয়া আসিতেছিল—একদিন হঠাৎ হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার জীবন-প্রদীপ নিবিসা গেল ।

শ্রদ্ধান্তে জ্যেষ্ঠ হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পিতার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইলেন । হরপ্রসাদের বয়স তখন বিংশতি বর্ষ এবং কনিষ্ঠ রামপ্রসাদের বয়স অষ্টাদশ বর্ষ । উভয় ভ্রাতাই বিদেশীভাবে শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়াছেন । পিতার জীবদ্দশায় হরপ্রসাদের কিবাহ হইয়া গিয়াছিল—কনিষ্ঠ রামপ্রসাদের এখনও বিবাহ হয় নাই । জ্যেষ্ঠ পিতার প্রকৃতি মোল আনা পাইয়াছিল । সাহেবী আদব-কায়দা, তাহার পিতা অপেক্ষাও অধিক ছিল । এমন কি হিন্দুর অনব্যঞ্জন তাহার পছন্দ হইত না । মুসলমান বাবুর্জি হরপ্রসাদের আহারাদি প্রস্তুত করিত । কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ বিদেশীভাবাপন্ন হইলেও, বাল্যকাল হইতে হিন্দুরানী প্রিয় ছিলেন । মাংসাদিতে তাঁহার ক্রটি

ছিল না ; তিনি মাঝে মাঝে গীতা ও হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন ।

শাস্ত্র-গ্রন্থাদি পাঠে ক্রমশঃ রামপ্রসাদের মন অনেক পবিত্র হইয়া উঠিল । হৃদয়ের তারে কত রকমের সুর উঠিল । সেই সুর রামপ্রসাদ নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিল, ক্রমে উন্মাদনা আসিল । এই সুরের যে একবার মধুর আশ্বাদন পাইয়াছে, সে কি আর ভুলিতে পারে ? এ সুর যে হিন্দুর রক্ত, মাংস এবং অস্ত্রিমজ্জায় বাধা । বাহাদেব হিন্দুশাস্ত্র জীবনস্বরূপ ছিল, বাহাদেব হিন্দু রীতি-নীতি জীবনের অবলম্বন ছিল, তাহাদেরই রক্তমাংসে আমাদের জন্ম । হিন্দু-মাত্রেই এই সুর হৃদয়ের মাঝে গুণ-গুণ করিয়া সদাই বাজিতেছে । বিদেশীয় হাবভাব ও কোলাহলে আমরা তাহা শুনিতে পাই না । পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদে ও পুণ্যবলে যে একবার সে সুরমধুর সুর শুনিলে, সেই পাগল হইবে ।

রামপ্রসাদ কাজেই পাগল হইল । কোট-পেন্টুলেন ছাড়িল । হবিষ্যন্ত তাহার সম্বল হইল । বাহিরের একখানিমাত্র কুত্র বর তাহার পবিত্র আশ্রমে পরিণত হইল । সত্যসত্যই সে রামপ্রসাদের চট্টোপাধ্যায়ের বংশধর হইল । জ্যেষ্ঠ হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তখন হিন্দু নামের অযোগ্য হইয়াছেন । বাহাদেব অস্বীকার করিতেছেন, তাহাদের বাহা অখ্যাত, হরপ্রসাদ এখন তাহাই আহ্বার করেন । বিদেশীয়দের বাহা কিছু মন্দ, হরপ্রসাদ সে সমস্তই গ্রহণ করিয়া-

ছেন। তাঁহাদের যেগুলি গুণ অর্থাৎ—সাহস, উদ্যম, একতা, উদারতা, বাবসাবুদ্দি, উপার্জন-শক্তি, সেগুলিকে হরপ্রসাদ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ প্রতিজ্ঞা করিল—জ্যেষ্ঠকে হয় স্বপক্ষে 'স্বধর্ম্মে' টানিয়া আনিবে, না হয় এ সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

একদিন জ্যেষ্ঠ হরপ্রসাদকে একটু প্রকৃতিস্থ দেখিয়া, রামপ্রসাদ অবনত মস্তকে শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বরে বলিল, “দাদা !”

রুদ্ধস্বরে হরপ্রসাদ কনিষ্ঠের পানে চাহিয়া বলিল—“কি রে কি বল্ছিঁস্ ?”

রামপ্রসাদ। আজ আপনাকে একটা অমুরোধ করিব।

হরপ্রসাদ। কি অমুরোধ ?

রামপ্রসাদ। আমরা স্বর্গীয় রামশুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র। আমরা হিন্দু ব্রাহ্মণ; কিন্তু আজ আমরা স্নেহেরও অধম হইয়াছি। বলুন দেখি দাদা! আমরা ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া কত নিরে অসিয়া পড়িয়াছি। অমূল্য শাস্ত্র-গ্রন্থরাজি আমরা অবজ্ঞা-ভরে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি। কত বর তাহাতে লুক্কায়িত আছে, তাহার কিছুমাত্র সন্ধান আমরা রাখি না—তাই হিন্দুধর্ম্মের মহিমাও উপলব্ধি করিতে পারি না।

হরপ্রসাদ। তুই যে একেবারে হিন্দুর পাদ্দীসাহেব হলি!

বক্তৃতা রাখ! অনুরোধটা কি শীঘ্র বল, আমার অনেক কাজ আছে ।

রামপ্রসাদ । আপনার ত এখন বাগানবাড়ী যাইবার সময় !
অল্প কাজ এখন—

হরপ্রসাদ বাধা দিয়া বলিল, “কি কাজ, তোকে হিসাব দিতে হবে না কি ?”

রামপ্রসাদ । একি কথা বলছেন দাদা ! জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে কি হিসাব দিবে ! এ কথা বলাতেও যে আমার পাপ হয় দাদা !

হরপ্রসাদ । তবে তুমি বাগানবাড়ীর কথা বলছিলি কেন ?

রামপ্রসাদ । দাদা ! আপনি আমার পিতৃতুলা ; কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রে, পিতৃতুলা সম্মানের পাত্র জ্যেষ্ঠকেও পাপপথ হইতে দিরাইবার কনিষ্ঠের অধিকার আছে ।

হরপ্রসাদ । বাগানবাড়ীতে বন্ধুবান্ধব লইয়া বেড়াইতে যাওয়াটা হিন্দুশাস্ত্র মতে পাপ না কি ?

রামপ্রসাদ । কনিষ্ঠের কাছে আপনার মিথ্যা কপটতার আশ্রয় লওয়া কর্তব্য নহে ! সত্যি কি আপনি বাগানবাড়ীতে বেড়াইতে যান ?

হরপ্রসাদ । তবে কি করিতে যাই ?

রামপ্রসাদ । আপনিই তাহার উত্তর দিতে পারেন ।

হরপ্রসাদ। আমি তোকে উত্তর দিতে বাধ্য নই। তোর হুকুম লইয়া কি আমাকে কার্য্য করিতে হইবে ?

রামপ্রসাদ। আমার কেন হুকুম লইবেন ? কেন আমার পাপের ভাগী করিতেছেন ! চিরদিন যেন আমি আপনার আদেশ মস্তকে বহন করিয়া মরিতে পারি ; কিন্তু আর আমি আপনাকে স্নেহে হইয়া অনাচার ও পাপশ্রোতে ভাসিতে দিব না, ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাহাই ঘটে ঘটুক।

হরপ্রসাদ। ‘অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক !’ বটে, তোর যে বড়ই লম্বা লম্বা কথা দেখছি ! পিতার অর্থ, পিতার গৃহ ! আমি এখানে বসিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব। তোর বলিবার কোনই অধিকার নাই !

রামপ্রসাদ। বলিবার অধিকার নাই ? জ্যেষ্ঠ নরকের পঙ্কিল শ্রোতে ভাসিয়া যাইবে—কনিষ্ঠের বলিবার অধিকার নাই ? দ্রাতা দেহ মন কলঙ্কিত করিতেছে, আয়ু, বল, শক্তি হারাইতেছে—কনিষ্ঠের বাধা দিবার অধিকার নাই ? পিতার গৃহ কলঙ্কিত হইবে, পিতার অর্থ নরকের পথে ভাসিয়া যাইবে, আর আমার বাধা দিবার অধিকার নাই ?

হরপ্রসাদ। এতক্ষণে তোর গুঢ় উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি ! পিতার গৃহে, পিতার অর্থে তোর অধিকার আছে বৈকি ! বেশ ! পিতার অর্থ, পিতার গৃহ আজই বিভাগ করিয়া লও। এত ভূমিকা না

করিয়া এ কথা স্পষ্ট বলিলেই ভাল হইত ! মনে যখন অল্প ভাব আছে, তখন মুখে লজ্জা সঙ্কোচ কেন ? হরপ্রসাদ তাহার স্বর একেবারে পরিবর্তন করিয়া পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিল ।

রামপ্রসাদ । দাদা ! মনে অল্প ভাব যেদিন উদয় হইবে, সেদিন যেন আমার অস্তিত্ব জগতে না থাকে । ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার তুচ্ছ বিষয়-বিভাগ ! এ পাপ-কল্পনা আমার মনে কখনই উদ্ভিত হয় নাই । দাদা আপনার সহিত আমার কি কোন প্রভেদ আছে ? আমাদের পিতামাতা যে এক ! এক রক্ত, এক মাংস, এক অস্থি—একই শরীর ! ইহা কি কখনও পৃথক হইবার ? ভিত্তি নাহার এক, তাহাকে পৃথক করিবে কে ? কাহার সাধ্য তাহাকে ভিন্ন করিতে পারে ? এক মাতৃসুত্রে আমাদের শরীর পুষ্ট হইয়াছে । আমাদের উভয় ভ্রাতার জীবনের প্রধান উপাদান এক । একই জিনিষে যে শরীরের উৎপত্তি, সেই জীবনটা কি পৃথক হইতে পারে ? কেবল সেই মৃত্যুর দিনেই আমরা উভয় ভ্রাতায় পৃথক হইব ! হিন্দুর নিকট জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য—ইহাই শাস্ত্রবাক্য । হিন্দুর শাস্ত্র যদি সত্য হয়, তবে পিতৃতুল্য ব্যক্তিকে পৃথক ভাবিবে কে ? দাদা ! অথবা কিছু বলিয়া যদি আপনার মনে কষ্ট দিয়া থাকি, তবে তাহার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি, আপনি যদি মার্জনা না করেন, তবে সমগ্র জীবনেও কি তার প্রায়শ্চিত্ত

করিতে পারিব না ? এই আশীর্বাদ করুন, আর যেন কখন এই
অধম ভ্রাতা-কর্তৃক আপনাকে মনঃকষ্ট পাইতে না হয় ।

কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ জোষ্ঠকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া গৃহ
হইতে বহির্গত হইয়া গেল ! হরপ্রসাদও “পাপ বিদায় হইল”
ভাবিয়া আপন কার্যো গমন করিলেন ।

* * * *

পরদিবস প্রাতঃকালে রামপ্রসাদের কক্ষে কেহ তাকে
দেখিতে পাইল না । ক্রমে এ কথা হরপ্রসাদ শুনিল ; কিন্তু বহু
অনুসন্ধানেও তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

পরিধানে একখানি সামান্য ধূতি, গায়ে একটিমাত্র পিরান ।
গৃহ পরিত্যাগ করিয়া রামপ্রসাদ বিষ্ণুপুরের পথ ধরিয়া চলিয়াছে ।
সঙ্গে একটি কপর্দকও নাই । তিন দিবস আজ সে অনাহারী ।
কুংপিপাসাতুর হইয়া নিকটস্থ একটি অস্থখ বৃক্ষের ছায়ায় গিয়া
তর্কীষাসের উপর শয়ন করিল । বিশ্রামান্তে উঠিবার চেষ্টা করিল ;
কিন্তু আর উঠিবার শক্তি নাই । ধনীর সম্মান, আজন্ম স্তূথে
প্রতিপালিত, অভাব কাহাকে বলে জানে না ! দাস-দাসী, দ্বারবান
যাহার গৃহে অহরহঃ কোলাহল করিতেছে, অগণিত স্বর্ণমুদ্রা যাহার
লৌহ-সিন্দুকে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, যাহার নায়েব, কাকূন ও
কর্মচারিগণ ভৃগুকে নৈমিত্ত শয্যায় শয়ন করে, সেই স্তূথৈশ্বর্য-পালিত
অগাধ অর্থের অধিকারী রামপ্রসাদ, আজ বৃক্ষছায়ায় তৃণশয্যার
উপরে গড়াগড়ি দিতেছে ! ঘটনাচক্রে আজ সে একটি পরসার
জন্ত লালায়িত, এক মুষ্টি অন্নের জন্ত প্রাণ বুঝি বহির্গত হইয়া যার !
দংসারের নিয়মই বুঝি এই । যাহার সম্বল নাই, সে ক্ষুধার বাতনায়
মস্তিষ্ক হইতেছে—খাইতে পায় না ; আবার যাহার আছে, সেও
রাগাদির জন্ত বিধিবিড়ম্বনায় খাইতে পায় না । কেহ উপার্জন

করে, ভোগ করিতে পারে না, আবার কেহ আজন্ম উপার্জনের চেষ্টা মাত্র না করিয়াও অতের উপার্জিত অর্থ ভোগ করিতে পায়। কেহ ক্রোড়পতি হইয়াও কৌপীন মাত্র পরিধান করিয়া, অর্থ সম্পদকে ধূলিমুষ্টি জ্ঞানে সমস্ত ত্যাগ করিয়া যায়—আবার কেহ সেই অর্থের জন্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম না মানিয়া হা হা করিয়া ছুটিতেছে! সংসারের একি প্রহেলিকা! একি ভীষণ কস্মফল! মানবের এই অবস্থা দেখিয়া মনে হয়—বিধাতার বিধান এত কঠোর কেন? ক্ষুধার যন্ত্রণায় একবার রামপ্রসাদের মনে হইল, কোন গৃহস্থের গৃহে যাইয়া কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করে! পরক্ষণে আবার স্থণা জন্মিল! তাবিল, জনার্দন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র হইয়া—হর প্রসাদের সহোদর হইয়া, লোকের দ্বারে ভিক্ষা করিব! জীবনকে যদি ভিক্ষার উপর নির্ভর করিতে হয়—এমন জীবন ধারণ করিবার প্রয়োজন নাই! এই অশ্বখবৃক্ষতলই আমার অন্তিমস্থান হউক। কুংপিপাসা ও পথশ্রমে আমার জীবনীশক্তি দ্রুত হ্রাস হইতেছে, অগ্নি রজনীতেই দেহ হইতে জীবন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে! এই সময় আমার জ্যেষ্ঠের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি! আমি তাঁহার চরণে অপরাধী! তাঁহাকে মনঃকষ্ট দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু আমি ক্রোধের বশে হয় ত মনের কথাগুলো তাঁহাকে গুছাইয়া বলিতে পারি নাই। তাই হয় ত তিনি ভাবিলেন, আমার পিতার সম্পত্তি আমি তাঁহার

নিকট হইতে বিভাগ করিয়া লইতে ইচ্ছুক ! ভ্রমক্রমে যদি ভাবের বা ভাষার ব্যতিক্রমে এ কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকে, তবে ত রামপ্রসাদ আজ নরকের কীট ! আমার জ্যেষ্ঠ মিনি, তিনি যদি পিতার সর্বস্ব উড়াইয়া ও স্মৃখী হ'ন, তাহাতে আমি বলিবার কে ? কঠোর পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন করিয়া জ্যেষ্ঠকে স্মৃখী করাই ত কনিষ্ঠের কর্তব্য ! সে কর্তব্য ত আমি কোনদিনই পালন করি নাই ! স্মিত্রানন্দন আদর্শচরিত্র লক্ষণ, চৌদ্দবর্ষ কাল বিনিস্র-নেত্রে জ্যেষ্ঠের স্মৃথের জন্য অরুণো অতিবাহিত করিয়া ছিলেন ! ভরত জ্যেষ্ঠের অভাবে তাঁহার পাছকা মস্তকে ধারণ করিয়া, রামের ভৃত্যরূপে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। চারি পাণ্ডব-ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের বিনা অনুমতিতে একপদও কোথাও অগ্রসর হইতেন না ! যখন কুরুগণ তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পাঞ্চালীকে কুরুসভায় কেশাকর্ষণ করিয়া উলঙ্গ করিবার প্রয়াস পাইলেন, তখন ইচ্ছা করিলে ভীমার্জুন সেই দণ্ডেই কুরুকুল বিনাশ করিয়া দ্রোপদীর লাঞ্ছনা ও অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারিতেন ! চারি পাণ্ডব, জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অনুমতির জন্য রোষকষায়িত নেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন—জ্যেষ্ঠ অনুমতি দিলেন না ! জ্যেষ্ঠের আদেশ পাইলেন না বলিয়া—ক্ষমতা সত্ত্বেও পাঞ্চালীর অপমান স্বচক্ষে দেখিতে লাগিলেন ! প্রতিকারবিধানের জন্য তাঁহারা হস্ত উত্তোলিত করিতে পারিলেন না ! কেবল বজ্রবৃষ্টিতে গদা ধারণ

করিয়া আলাময়ী দৃষ্টিতে কুঙ্কসভার দিকে চাহিয়া রহিলেন। চারি পাণ্ডবের প্রতিজ্ঞা ছিল, জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের একবিন্দু রক্ত যে ভূমিতে ফেলিবে, তাহার বংশে বাতি দিতে কাহাকেও রাখিব না! কি অপূৰ্ণ ভ্রাতৃত্ব! যে আৰ্য্যগণ জ্যেষ্ঠের সম্মানার্থে এতদূর ত্যাগ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই আৰ্য্যের বংশধর হইয়া জ্যেষ্ঠের প্রাণে বেদনা দিব? জননী মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন, “ভ্রাতার শক্তি সংসারে অজেয়! ভ্রাতার স্নেহাশ্রয়ে এমনিই মধুরত্ব আছে যে, সংসারের সহস্র বিপদ, দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না!” আজ আমি মাতার সেই অন্তিম বাক্যকেও উপেক্ষা করিয়াছি! আমার মত পাপী জগতে আর কে আছে?

আমরাও ত সেই আৰ্য্য-বংশধর! আমরাও ত সেই হিন্দু! আমরাও ত সেই পবিত্র ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। যদি তাঁহাদের পদাঙ্কসরণ না করি, যদি হিন্দুর শাস্ত্রবাক্য পালন না করি, তবে যে আমরা হিন্দু নামের অযোগ্য! যদি আমরা হিন্দু নহি, তবে আমরা কি? আমরা কি তবে নরকের কীট?

অগ্রজ! আপনি মাতৃগর্ভ অগ্রে অধিকার করিয়াছিলেন,— মাতৃস্তন্থের আপনিই অগ্রে অধিকারী হইয়াছিলেন! আপনি আপনার প্রসাদভোজী মাত্র! পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির আপনিই ভ্রাতৃত্ব অধিকারী! আমি আপনার দাস,—ভৃত্য মাত্র! আপনি আর

করিবেন, সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আপনার আদেশ পালন করিব, ইহাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল ; কিন্তু আমি পাপী—মহাপাপী, সে সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে নাই ! আমি অনশনে আপনার চরণ স্মরণ করিয়া, অথ বৃক্ষতলে জীবন ত্যাগ করিয়া আমার কৃত কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিব, আমাকে ক্ষমা করুন । রামপ্রসাদ হৃদয়ের বহুগায় ছটফট করিয়া রোদন করিতে লাগিল । তাহার চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে একবার ইচ্ছা হইল ; কিন্তু সে শক্তি তখন তাহার ছিল না ।

কুংপিপাসায় অধীর হইয়া রামপ্রসাদ সেই বৃক্ষতলে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল ।

একজন ব্রাহ্মণ সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন । তিনি দেখিলেন—মৃতপ্রায় একটি বৃক্ষ অস্থখ বৃক্ষতলে পড়িয়া আছে । নিকটে গিয়া বারংবার চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাঠিলেন না । নাসিকায় হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন যে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অতি মৃদুভাবে প্রবাহিত হইতেছে । বৃক্ষকে ভদ্রবংশ-সমুত্ত দেখিয়া তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল । তিনি তাহার চৈতন্য-সম্পাদনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তিনি বুঝিলেন, বৃক্ষ ব্রাহ্মণকূলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । হিন্দুমাত্রই ব্রাহ্মণের বাহ্য লক্ষণ দেখিলেই তিনি ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব কি না, তাহা অনায়াসে চিনিতে পারেন । অনেক চেষ্টা করিয়া বখন চেষ্টনা হইল না, তখন ব্রাহ্মণ বৃক্ষ

করিয়া রামপ্রসাদকে গৃহে লইয়া গিয়া বহু সেবা-শুশ্রূষায় তাহার চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন ।

বিষ্ণুপুরের সম্মিটস্থ একখানি ক্ষুদ্র গ্রানের প্রান্তসীমায় ব্রাহ্মণের পর্ণকুটার অবস্থিত । একটি বৃদ্ধ বৎসরের কন্যা ও একজন বৃদ্ধা ব্যতীত গৃহে আর কেহই ছিল না । কন্যাটি যখন ছয় মাসের, তখন তাহার জননী ইহধাম ত্যাগ করেন । আজ দেড় বৎসর হইল ব্রাহ্মণ গৃহশূন্য !

ব্রাহ্মণের কয়েক বিঘা নিম্নর জমি আছে । তাহা অপরে ভাগে চাষ করিয়া অর্ধেক ধাত্ত এবং বিচালী পোষ মাষ মাসে ব্রাহ্মণের গৃহে তুলিয়া দিয়া যায় । ব্রাহ্মণের যজ্ঞমান, শিষ্য নাট, নিজের চাষবাস করেন না । এ সব করিবার তাহার সময় হইয়া উঠে না । ব্রাহ্মণ পরের কাজ লইয়াই ব্যস্ত—নিজের কাজ করিবার তাহার সময় নাই । তাহার স্ত্রী বর্ধমান থাকিতেও তিনি পরোপকার লইয়াই থাকিতেন, গৃহকার্য্যে আদৌ মনোযোগ করিতেন না । তবে গৃহিণীর ভয়ে মাঝে মাঝে তাহাকে সাংসারিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইত । গৃহিণীর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ স্বাধীন হইয়াছেন, কেবল কন্যাটির ক্ষুদ্র এক একবার গৃহে আসিতে হয় । বৃদ্ধাই কন্যাটির রক্ষণাবেক্ষণ করেন । এই বৃদ্ধার পরিচর্য্য এ পর্য্যন্ত কেহ পায় নাই ; ব্রাহ্মণ তাহার অহুমতি ব্যতীত এক পদও কোথাও অগ্রসর হইত না । বৃদ্ধাকে সেই নিম্নর কুজিরখানি

বাতীত কেহ কখন কোথাও বাইতে দেখে নাই ! ব্রাহ্মণ যখন “মা ! মা !” বলিয়া বৃদ্ধার চরণ-যুগলের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিত, তখন তাহার হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সপ্তসিন্ধু উগলিয়া উঠিত ! বৃদ্ধা দেবী না মানবী ! বৃদ্ধার অত্ম পরিচয় আমরা এ পর্য্যন্ত পাই নাই, সুতরাং পাঠকও তাহা পাইবেন না ! মেয়েটিকে বৃদ্ধা প্রাণের অধিক ভালবাসে । ব্রাহ্মণের নাম গঙ্গাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় । তিনি “গাঙ্গুলী ঠাকুর” বলিয়াই সে দেশে পরিচিত ! বিষ্ণুপুরের আবালবৃদ্ধবর্গিতা গাঙ্গুলী ঠাকুরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকে । কেহ কেহ গাঙ্গুলী ঠাকুরকে পাগল ঠাকুর বলিত । তাহার দায়িত্ব দরপ-ধারণ ক্রিয়াকার্য্য কতকটা পাগলেরই মত ছিল ! নিজের স্বার্থের দিকে না চাহিয়া, নিজ সামসারিক কার্য্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, নিজ স্থখ স্বচ্ছন্দের জন্য অর্থোপার্জনের চেষ্টা না করিয়া—যে পরের কার্য্য লইয়াই থাকে, তাহাকে লোকে “পাগল ঠাকুর” না বলিয়া, আর কি বলিবে ? ব্রাহ্মণ সেই বৃদ্ধার আদেশেই পাগলের মত জগতের হিতকল্পে ঘুরিয়া বেড়াইত ! ব্রাহ্মণ সেই বৃদ্ধার আদেশেই পরিচালিত—তাহারই পবিত্র মন্ত্ৰে দীক্ষিত ! পাঠক ! পার্থিব দৃষ্টিত্যাগ করিয়া, একবার চাহিয়া দেখুন, এ বৃদ্ধা কে ? আমরা বহু চেষ্টাতেও বৃদ্ধার পরিচয় পাইলাম না ।

কেহ বলিল, “গাঙ্গুলী ঠাকুর ! আমাদের পুরোহিতের অস্থখ !

আজ তোমাকে আমাদের লক্ষ্মীপূজাটা করিয়া দিতে হইবে।” গাঙ্গুলী ঠাকুর মান করিয়া লক্ষ্মীপূজা করিতে চলিল। পূজাদি করিয়া আতপ চাউল, রস্তু গামছায় বাঁধিয়া ভাবিতে লাগিল—আজ কাহার গৃহে অন্নের অভাব, তাহা দেখিতে হইবে। সংবাদ পাইল, গ্রামের শনী পরমানিক পীড়ায় শয্যাগত—তাহার ছেলেগুলি অন্য ভাবে কষ্ট পাইতেছে। গাঙ্গুলী ঠাকুর নাপিতের গৃহে গিয়া, নাপিত-বোয়ের অঞ্চলে চাল কলাগুলি ঢালিয়া দিয়া বলিল, “ছেলে-গুলিকে সকাল করিয়া ছুটি রাঁধিয়া দে।”

কেহ আসিয়া বলিল, “অম্বকের না মরিয়াছে, লোকাভাবে দাহ হইতেছে না।” গাঙ্গুলী ঠাকুর মাথায় গামছা বাঁধিয়া ছুটিল। অল্প লোক জুটিল ভালই, নচেৎ একাই মৃতদেহ বৃকে করিয়া লইয়া গিয়া শ্মশানে দাহ করিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণের শরীরে বলও অসাধারণ ছিল।

কাহার পীড়া হইয়াছে, লোকাভাবে সেবাশ্রমণ হইতেছে না! গাঙ্গুলী ঠাকুর আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর শিয়রে বসিয়া সেবাশ্রমণ করিতে লাগিল। দিনের পর রাত্র, রাত্রের পর দিন এইরূপ কত দিবা রজনী অতীত হইয়া গেল, গাঙ্গুলী ঠাকুরের কিন্তু ক্লেশ নাই।

এই সব সংবাদ আনিবার জন্য গাঙ্গুলী ঠাকুরের অনেক চর ছিল। গ্রামের নিকট ছেলেরা এই চরের কাজ করিত। গাঙ্গুলী

ঠাকুর তাহাদিগকে মাঝে মাঝে ভোজ দিতেন । যদি দুই একদিন এইরূপ কোন সংবাদ ব্রাহ্মণ না পাইত, তবে তাহার দারুণ মনঃকষ্টে দিন কাটিত । ব্রাহ্মণ বেকার বসিয়া থাকিতে পারিত না । শ্মশানে, বনে, জঙ্গলে, গ্রামের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত । পরের জন্ত প্রাণপাত করা রোগ, ব্রাহ্মণের পূর্বেও ছিল ; তবে সহধর্মিণীর মৃত্যুর পর হইতে ব্যাদিটা খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে । এই সকল কার্যে তাহাকে সেই বৃদ্ধা উৎসাহিত করিত । মাঝে মাঝে গাঙ্গুলী ঠাকুর বৃদ্ধাকে বলিত, “না ! তুই আমার এই রোগটা স্মারও বাড়াইয়া দে ।” যদি কোনদিন ব্রাহ্মণের হাতে কোন কাজ না থাকিত, তবে তাহার দুঃখের সীমা থাকিত না ; আপনা আপনি মনে মনে বলিত, “ভগবান আমাকে কাজের বাহির করিয়া সৃজন করিয়াছেন ! তাঁর সৃজিত এই বিশাল জগতে একটা কাজেও আমি লাগিলাম না ! ভগবান কেন যে আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও বুঝিতে পারি না ! দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করিতাম, এত লোক জগতে রহিয়াছে, আবার আমার নত একটা নিষ্কণ্টক লোককে এখানে পাঠাইবার তাঁহার কি প্রয়োজন ছিল !” যে সব লোকে এই প্রকার উদ্ভট চিন্তা করে, তাহাকে সভ্যসমাজ “পাগল ঠাকুর” বলিবে না কেন ?

আজ গাঙ্গুলী ঠাকুর চারিদিন গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল । কয়দিন হাতে কোন কাজ না থাকায়, তৈলাক্ত কৃষ্ণবর্ণ

গানছাথানি মস্তকে বাধিয়া গাঙ্গুলী ঠাকুর শুণ শুণ করিয়া গান গারিতে গারিতে বৃদ্ধার আদেশে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কাহারও কোন কাজ না পাওয়ার মনটার স্থখ নাই। ভ্রমণকালে দেখিল, চিনিবাস জানা বিরম্বদনে সেই পথ দিয়া আসিতেছে। ক্রোধ, অভিমান ও ঘগায় চিনিবাসের মৃণমণ্ডল বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে। জহরীর রক্ত-পরীক্ষা করিতে যেমন অধিকক্ষণ সময় লাগে না, ঠাকুরেরও তরুণ লোক চিনিতে বিনয় হয় না। গাঙ্গুলী ঠাকুর চিনিবাসের চমুধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন রে বাবা! চিনিবাস! তোর মুখ আজ শুষ্ক দেখছি কেন?”

চিনিবাস জানা জাতিতে কৈবর্ত! স্বী ৭ একটা বিধবা কহ লইয়া চিনিবাসের ক্ষুদ্র সংসারটি সুখে-দুখে একপ্রকার চণ্ডির বাইতেছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ দ্বিতী বিধবা কত্কার রূপই তাহার স্থান হইয়াছে! গ্রামের জমীদার দোকণপ্রতাপ রঘুবর সামন্তের অত্যাচারে সে আজ দেশত্যাগ করিয়া যাইবে। সাত পুরুষের ভদ্রাসন তাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তাই সে আজ পাগলের মত হইয়া বৃদ্ধার ও গাঙ্গুলী ঠাকুরের চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে যাইতেছিল।

গাঙ্গুলী ঠাকুরকে দেখিয়া সে লুপ্তিত হইয়া প্রণাম করিল। পরে বলিল, “খুড়োঠাকুর! আমি তোমাদের চরণেই বিদায় লইতে যাইতেছিলাম।”

স্বক্কে হস্তার্পণ করিয়া গাঙ্গুলী ঠাকুর স্নেহভরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাবি রে বাবা ?”

“দেশ ত্যাগ ক’রে আমার পিসীর বাড়ী চলিলাম খুড়োঠাকুর ।”

চিনিবাস এই কথা বলিয়া উচ্চৈশ্বরে কাঁদিয়া উঠিল ।

চিনিবাসের হস্ত ধারণ করিয়া গাঙ্গুলী ঠাকুর একটা গাছের ছাওয়ায় বাইয়া বসিল । কয়েক মুহূর্ত্ত চিনিবাসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “দেশ ত্যাগ করবি কি রে ? এই গ্রামে তোর সাত পুরুষের ভিটা, সে কি পরিত্যাগ করা যায় ! তোর কি সংসারে বড়ই কষ্ট হচ্ছে ? এ সংসার তোর ক্ষেতে কসল অন্নই হইয়াছিল বটে ! তা আমাকে এতদিন বলিস্ নাই কেন বাবা ! তোরা তিনটে প্রাণি কি না পেতে পেয়ে মারা যাবি ? আমার ত অল্পস্র ধান আছে বাবা ! আমার অত ধানের দরকার কি বল ? আমি থাকতে তোর স্ত্রী ও রাজলক্ষ্মী অম্মাভাবে ক্লেশ পাইবে, তাও কি কখন হয় ? তোর ভাবনা কি বাবা ?” বলা বাহুল্য চিনিবাসের বিধবা কণ্ঠাটির নান রাজলক্ষ্মী ।

গাঙ্গুলী ঠাকুরের স্নেহসিক্ত ও সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যে চিনিবাসের বদাক্লিষ্ট হৃদয় উথলিয়া উঠিল, হুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল । একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া চিনিবাস বলিল, “না খুড়োঠাকুর ! আমি পেটের জন্ত আমার সাত পুরুষের বাস ত্যাগ করিয়া যাইতেছি না ! তর্কীয়াস খাইয়াও বাপের ভিটায় দরিতে

পারিলে স্মৃতে মরিতাম। আমি দেশ ত্যাগ করিতেছি—মানের জন্ত, আমার অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক আরোপিত হইবে—সেই ভয়ে। অর্থ থাকিলেই কি গরীবের উপর অত্যাচার করিতে হয় খুড়ো ঠাকুর!” চিনিবাস চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে আশোপাস্ত সমস্ত ঘটনা গাঙ্গুলী ঠাকুরকে বলিয়া শেষে বলিল—

“কাল রজনী দ্বিপ্রহরের সময় আমাকে কাছারি ঘরে জমিদারের পাইক ধরিয়া লইয়া গিয়া কত প্রলোভন দেখাইল! ক্রোধে, ঘৃণায়, ও লজ্জায় আমার সর্ব-শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। একবার অবিলম্বে, যে মুখে আমার কণ্ঠার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতেছে, সেই পাপ মুখে সজোরে ছুই লাথি বসাইয়া দি! পরিণামে মৃত্যু—তাহা না হয় জমিদারের হাতেই হইবে; কিন্তু ঠাকুর, কেবল তোমার বোয়ের মায়ায়, আর নেয়েটার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া প্রতিশোধ লইতে সাহসী হইলাম না। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম, “আমি গরীব বলিয়া তুমি আমার অপমান করিতে সাহসী হইলে; কিন্তু বেশ জানিও, গরীবের উপর এত অত্যাচার তোমার সহিবে না! উপরে ভগবান আছেন, তিনিই ইহার বিচার করিবেন। রাজলক্ষ্মী আমার সতী! সতীকে ভগবানই রক্ষা করিবেন। এই বলিয়া চলিয়া আসিয়াছি।”

চিনিবাস ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

গাঙ্গুলী ঠাকুর দীর্ঘভাবে সকল কথা শুনিয়া, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল ! মুখ গম্ভীর, চক্ষু দিয়া অগ্নিফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে । বহুক্ষণ সে নির্বাক রহিল ।

গাঙ্গুলী ঠাকুর একবার উঠিয়া দাঁড়াইল । আবার বসিয়া পড়িয়া গভীর চিন্তামগ্ন হইল ! এরূপ বিষম সমস্তায় সে বুদ্ধি আর কখনও পড়ে নাই ! অনেকক্ষণ চিন্তার পর তাহার মুখে হাসি দেখা দিল । এই বিপদের কথাতেও হাসি ! এই জটাই বুদ্ধি গাঙ্গুলী ঠাকুরকে লোকে “পাগলা ঠাকুর” বলে ।

গাঙ্গুলী ঠাকুর বলিল, “চিনিবাস ! গাঙ্গুলী ঠাকুর বাস্তবিক পাণ্ডিত্যে, কাহার সাধ্য সতী রাণী রাজলক্ষ্মীর অঙ্গস্পর্শ করে ? তুই নিশ্চিত হইয়া ঘরে যা ।”

গাঙ্গুলী ঠাকুরকে সকলেই চিনিত । চিনিবাসও তাঁহার স্বভাব ভালরূপ অবগত ছিল ; কিন্তু দোহাওপ্রতাপ জনিদার রঘুবর সানন্তের গ্রাস হইতে ক্ষুদ্র দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি করিয়া রাজলক্ষ্মীকে উদ্ধার করিবে, ইহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না ।

গাঙ্গুলী ঠাকুর কৃত্রিম ক্রোধ ও বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল, “আবার তুই ভাবছিস ? আমার কথা তোমার বিশ্বাস হ’ল না ?”

চিনিবাস ভয়ে আর দ্বিভক্তি না করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল ।

গাঙ্গুলী ঠাকুর সেই বৃক্ষতল হইতেই নিরুদ্দেশ হইল । কেহ আর তাহাকে দেখিতে পাইল না । তবে একদিন একটা লোক

গভীর রজনীতে তাহাকে জমিদার রঘুবর সানস্তের অন্তঃপুর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া বাইতে দেগিয়াছিল ।

দুইদিন পরেই জমিদারের ক্লোকজন আসিয়া, গভীর রজনীতে চিনিবাসের বাটী আক্রমণ করিল । তাহারা তাহার বিধবা কন্যার গৃহে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে বহুপূর্বক ধৃত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । রাজলক্ষ্মী তখন প্রকৃত উন্মাদিনী । সে বহুস্বরে বলিল “সাবধান ! আমার কেহ অঙ্গস্পর্শ করিস্ না ! কোথায় বাইতে হইবে বল, আমি স্বেচ্ছায় বাইতেছি ।”

অদূরে বেহারারা পাকী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল । বিধবা বাইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে প্লাকীতে উঠিল । বেহারারা প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল । গ্রামবাসী এই অত্যাচারে কোনও প্রকার বাধা দিল না । অসীম শক্তিশালী ভূস্বামীর সহিত প্রতিকূলাচরণ করিবে—এমন ক্ষমতা কাহারও নাই । কাজেই বিনা বাধায় এই অত্যাচার হইয়া গেল । চিনিবাস একবারমাত্র বলিল, “ভগবন্ ! তোমার অভিষ্ট পূর্ণ হউক ।” তারপর তাহার রোক্তমান স্বীকে সাস্তনা প্রদান করিতে লাগিল ।

পাঠক ! পল্লীগrame এই সকল ঘটনা তখন প্রায়ই ঘটিত । প্রবলের অত্যাচারে গ্রাম ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইত । শত সহস্র যুবতী, স্বামীর বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার যথাসর্বস্ব হারাইন্ত । পশুবলের নিকট কাহারও সাধা থাকিত না—যে ইহার প্রতিকার

করে । এখনও গ্রাম অন্বেষণ করিলে এই প্রকার জমিদার অনেক দেখিতে পাওয়া যায় ।

প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটি উত্তানে আসিয়া সেই পাক্কী পামিল । উত্তানের মধ্যে একটি পুষ্করিণী ও তাহার চারিদিকে ফল-ফুলের গাছ ছিল । উত্তানে কোনও প্রকার গৃহ ছিল না—কেবল-মাত্র একপানি উত্তান-রক্ষকের ক্ষুদ্র পর্ণকূটার ছিল । জমিদারের গৃহজন পাঠক বিধবাকে সেই ক্ষুদ্র কূটারের মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিল । বিধবা দিনা আপত্তিতে গৃহের মধ্যে গিয়া উপবেশন করিল । তাহারা চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল ।

প্রায় অন্ধ ঘণ্টা পরে, জমিদার রঘুবর সামস্ত চাবি খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল । গৃহ অন্ধকার ! পান্ডু স্বহস্তে দীপ জালিল !

রমণী বস্ত্রাঞ্চল চক্ষে দিয়া কাদিতে কাদিতে বলিল, “আপনি কে ? যদি আপনার স্ত্রী-কন্যা থাকে, আমার সতীত্ব রক্ষা করুন । যদি আপনার সতীর গর্ভে জন্ম হইয়া থাকে, তবে আমার উদ্ধার করুন । সতীর সতীত্ব নাশ করিলে গৃহ জলিয়া যাইবে—বংশে প্রতি দিতে কেহই থাকিবে না । এখনও চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় হই-তেছে, সাবধান আমার সতীত্বের্ষে হস্তক্ষেপ করিও না—এত পাপ পৃথিবী কখনই সহ্য করিবেন না ।”

জমিদার রঘুবর এই কর্ণস্বর শুনিয়া, সহসা বিশ্বয়ে চীৎকার

করিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু ভয়ে বিফারিত হইল এবং মস্তকের
কেশ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। বিশ্বয়ে আবেগে সে চক্ষে অন্ধকার
দেখিল। মনে মনে ভাবিল, সে জাগ্রত না স্বপ্ন দেখিতেছে।
বিকট চীৎকার করিয়া সে বলিল—“একি? বিনোদ! তুমি
এখানে? কে তোমাকে এখানে আনিল?”

“আপনারই নিয়োজিত বেহারা, পাইক?”

“কেন! তোমাকে আনিল কেন?”

“রাজলক্ষ্মী আমার কণ্ঠা, সে আমাকে মা বলিয়াছে। সেইজন্য
আমি পথিমধ্যে তাহাকে মুক্ত করিয়া রক্ষা করিয়াছি। তোমার
বেহারারা অর্থলোভে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া
আসিয়াছে।”

“যথেষ্ট হইয়াছে! আর বলিতে হইবে না, আমার পাপের
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে! এতদিনে আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়াছে।
আর এই জঘন্ত পথে আমি কখনও বাইব না! রাজলক্ষ্মী কেবল
তোমার কণ্ঠা নয়, আজ হইতে সে আমারও গর্ভধারিণী।”

জমিদার রঘুবর সামন্ত সহধর্মিণী বিনোদবালাকে লইয়া গৃহে
ফিরিল। সেইদিন হইতে তাহার যথার্থই পরিবর্তন আরম্ভ
হইল। পত্নীর মধুর আকর্ষণে তঙ্করও সাধু হয়—নরহত্যাকারীও
পাপ-মুক্ত হয়। ভারতে সতীর মহিমা এই প্রকার—সতী মনে
করিলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

পাঠক বুঝিতে পারিলেন কি, কে এই সতী-লক্ষ্মীকে এই কার্যে নিয়োজিত করিয়াছিল ? কাহার উপদেশে এই সতী-শিরোমণি আদর্শ জমিদার-পত্নী আর এক রমণীর সতীত্বরত্ন রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন ? এ সকলই সেই গাঙ্গুলী ঠাকুরের চক্রান্ত । তিনিই রাজসিংগে জমিদার-ভবনে প্রবেশ করিয়া, সতীকে সতীর সহায়তা করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন । গাঙ্গুলী ঠাকুরের নিকট সকল বাটীর দারই উন্মুক্ত ছিল । সামান্য গৃহস্থ হইতে জমিদার পন্থা সকলেই তাঁহার মহানুভবতার মুখ হইয়া তাঁহাকে অবাধে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দিত । এই রাজলক্ষ্মীর সতীত্ব রক্ষা করিয়া গাঙ্গুলী ঠাকুর আজ চারিদিনের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন । পথিমধ্যে রামপ্রসাদকে এই অবস্থার দেখিতে পাইয়া তিনিই তাহাকে বহন করিয়া নিজ গৃহে লইয়া আসেন ।

এই ঘটনার পর জমিদার রণবর সামন্ত ও তাঁহার সাক্ষী স্ত্রী গাঙ্গুলী ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং পরে তাঁহারই উপদেশানুসারে চলিয়া একজন আদর্শ ধার্মিক জমিদার হইয়াছিলেন । তাঁহার দানশীলতার কথা এখনও বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বংশপরম্পরায় কীৰ্ত্তিত হইয়া আসিতেছে ।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে এই পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কথা বর্ণিত হইল, তাহার সহিত এই পুস্তকের সম্পর্ক অতি অল্প । ভবরাম বৃদ্ধার কুটীর হইতে যে সমস্ত কাগজপত্র প্রাপ্ত

কইয়াছিলেন, ইহা তাহারই স্মরণার্থ্য । এই কয়টি পরিচ্ছেদের
সহিত কামেরিয়ার দপেট সংগ্রহ আছে । পাঠক তাহা ক্রমশঃ
উপলব্ধি করিতে পারিবেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

“না ! তুই এই তিন বৎসরের মধ্যে কি করিয়া গীতা পাঠ্যঙ্গন
কণ্ঠস্থ করলি ! আমি এ পর্য্যন্ত উহার একটি শ্লোকও ভাঙ
বুঝিতে পারিলাম না !”

“আমিই কি সমস্ত শ্লোকের গভীর অর্থ জদয়ঙ্গম করিতে
পারিয়াছি না ! শ্লোকের মধ্যে কি গভীর অর্থ নিহিত আছে, তাহা
মহাপুরুষ ব্যতীত অত্রে কে বুঝিবে ?”

“তুই ত গীতা-পড়িবার সময় তন্ময় হইয়া থাঙ্গ ! সেই অবস্থায়
আমি তোমার মুখের দিকে অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া থাকি । মনে
হয়, তুই তখন যেন মহানারায়ণ ! কি এক দিব্য জ্যোতিতে তোমার
মুখখানি যেন উদ্ভাসিত হইতে থাকে !”

“না ! সংসার-ত্যাগী আদর্শ সন্ন্যাসীর চরণতলে বসিয়া গীতা পাঠ
না করিলে, শ্লোকের গূঢ় তাৎপর্য্য জদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না ।
যদি সেই মহাপুরুষ—আনাদের গুরুদেব কখন দয়া করিয়া দর্শন
দেন, তবে গীতা পাঠ করিয়া মনের সাধ পূর্ণ করিব । ভগবান
জানেন, আর গুরুদেবই জানেন, সে সাধ ইজজীবনে পূর্ণ হইবে
কি না ?

না ! গীতা হিন্দু শাস্ত্রের সার রত্ন । শ্রীভগবানের মুখ-নিঃসৃত

বলিয়া ইহা যোগী-ঋষির হৃদয়সর্ব্বস্ব ধন! যোগী ব্যতীত গীতার অর্থ কেহই জ্ঞাত হইতে পারেন না। গীতার অর্থ বুঝিতে পারিলে ষড়্দর্শন, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। জ্ঞান, ক্রিয়, পুণ্য, যোগ নানান্বয়া সকলই গীতা পাঠে হৃদয়ঙ্গম হয়। নান্দারা সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহারা গীতার অর্থ বুঝিতে পারেন। পণ্ডিতগণ বাহ্য গীতার অর্থ করেন, তাহা অনেকটা চিনি না খাইয়া, চিনির আত্মদ-বর্ণনার মত অলীক! বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি কণ্ঠস্থ করিয়া যাহারা পণ্ডিত উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা চিনি কি বস্তু গুলিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহার আত্মদ কখনও গ্রহণ করেন নাই! সুতরাং অন্ধ হইয়া অন্ধকে কি করিয়া পথ দেখাইবেন মা! যোগীরাই চিনির আত্মদ গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং গীতার অর্থ যোগী ব্যতীত অন্তের বুঝাইবার সাধ্য নাই। সেদিন একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে এক রাজার উপাখ্যান পাঠ করিতে ছিলাম। তিনি তপ, ধ্যান, দান, বজ্র করিয়া কিছুতেই শাস্তি পান নাই। গীতার শ্লোকগুলি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তব্রাচ তিনি স্মৃথ শাস্তি লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে এক সন্ন্যাসীর কাছে গীতা পাঠ করিয়া তিনি হৃদয়ে শাস্তি লাভ করেন। মা! নিজে বন্ধন-মুক্ত না হইলে কেহ কি গীতার প্রকৃত অর্থ কাহাকেও বুঝাইতে পারে? 'আমি ক্ষুদ্রমনা নারী হইয়া গীতার অর্থ কি বুঝিব মা?'

নারিকেলডাক্তার একটা ত্রিতল অট্টালিকায় বসিয়া উভয়ের

কথোপকথন হইতেছে । উভয়েই স্ত্রীলোক । একজন ছই সন্তানের জননী । অপরা কুমারী ! গৃহদ্বারে একটি মর্ম্মর-প্রস্তরে লেখা আছে “রামনয় আশ্রন।” অট্টালিকার অধিকারিগণ তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতিরক্ষার জন্ত এই অট্টালিকা উৎসর্গ করিয়াছেন ।

অট্টালিকার ভিতরে প্রবেশ করিলেই মনে হয়, ভারতের প্রাচীন রীতি-নীতি বুঝি এই অট্টালিকার মধ্যে চারিদিকে পূর্ণ নাত্রায় বিরাজ করিতেছে । প্রাঙ্গণে একটি তুলসীমঞ্চ স্থাপিত রহিয়াছে, সুগন্ধি ধূপ ধূনার পবিত্র গন্ধে চতুর্দিক আয়ো-
দিত । প্রতি গৃহেই দেব-দেবীর ছবি । দেখিলেই হৃদয়ে নাত্তিক ভাব ও ভক্তিরসের উদ্বেক হয় । কুমারী এক প্রহর রাত্রি থাকিতে শয্যাভ্যাগ করিয়া দেব-দেবীর পূজার্কনার আয়ো-
জন করেন । ত্রিতলের একখানি গৃহ পূজার উপকরণেই পূর্ণ ! কুল, চন্দন, তুলসী, ধূপ, ধূনা, গুগ্গুল, তাম্রকুণ্ড, কাশা ও কুশী, পুষ্পপাত্র, পঞ্চপ্রদীপ, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘৃতপ্রদীপ, কুশাসন, মৃগচর্ম্ম, শ্বেত ও রক্তচন্দন কাষ্ঠ, চন্দনপীড়ি, হোমী কাষ্ঠ, ঘৃত, মধু, কুশ, তুর্কী, চণ্ডী, গীতা, ভাগবৎ, আতপ তণ্ডুল, কলমূল, মিষ্টান্ন কত নান করিব ! হিন্দু-দেবদেবীর পূজার্কনার জন্ত বাহ্য কিছু প্রয়োজন, সমস্তই এই গৃহে সুসজ্জিত রহিয়াছে । গৃহে চর্ম্ম-পাচ্চার ব্যবহার নাই । গৃহবাসীর বিজাতীয়

বেশভূষা নাই। সকলেরই পরিধানে গৈরিক বসন। পাড়ক লইয়া কেহ কখন এই ভবনে প্রবেশ করিতে পার না। মাংস, পলাধু প্রভৃতি হিন্দুর অথাত্ত অস্পৃশ্য কখনও এ গৃহে প্রবেশ করে না। একবেলা নিরানিষ আতপ অন্ন দেবদেবীর ভোগ হইয়া থাকে। ক্ষুন্নিবৃত্তি ও দেহ রক্ষার জন্ত একবার মাত্র সেই প্রসাদ, গৃহবাসী সকলেই ভক্তিবরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাত্রে দেবদেবীর প্রসাদ তুণ্ড ও কলাদি এই গৃহে জ্বী পুঙ্কব, বালক মাত্রেই গ্রহণ করেন। সাম্বিক ভাবে সকলেই জীবন বাপন করিতেছেন। পোষাক, পরিচ্ছদ, বিলাস, ও অন্য বস্তুর অধিকার দায় না থাকায়—ভারতের চিত্রপ্রসিদ্ধ অভাব রাক্ষসী এ গৃহে প্রবেশ করিতে পার নাই। ব্যাধি, পীড়া, অশ্বল, ডিস্‌পেপ্সিয়া, বহুমূত্র, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি কলিকাতার ব্যাধিগুলি এ গৃহে কখনও প্রবেশ করে নাই। সকলেরই শরীর সুস্থ, সবল ও কর্মঠ। সকলেই এই প্রকারে কঠোর নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া একান্তচিন্তে ভগবদ্ আরাধন করিয়া থাকেন। তাহাদের মুখশ্রী কি যেন এক অপূর্ণ সুখময় সর্বদা দীপ্তি পাইতে থাকে। জগৎ হইতে তাহারা যেন স্বতন্ত্র। তাহাদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, শিক্ষা-দীক্ষা, সকলই বিভিন্ন। পল্লীর প্রত্যেক লোকই এই বাটীর অধিবাসীদিগকে এক প্রকার শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই গৃহের সকলেই করবোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, “হে ভগবন! ভারতের প্রাচীন রীতি-নীতি ঘরে ঘরে প্রচলিত হউক, ভারতের গৃহ আবার ধন-ধাত্রে পরিপূর্ণ হউক, বিলাস-ব্যাধি দূর হইয়া যাক, হিন্দু আবার নগ্নদেহে, নগ্ন-পদে, নগ্ন-মস্তকে বিচরণ করুক, হিন্দু শাস্ত্র গৃহে গৃহে পণ্ডিত হউক, গৃহে গৃহে হোমের পবিত্র অগ্নিশিখা উদ্ভিত হউক। দেশ আবার দ্রব, হিংসা বর্জিত হউক, হিন্দু মিথ্যা, কপটতা বিষ্মত হউক, সত্য ও ধর্মের জ্যোতিঃ ঘরে ঘরে প্রজ্জ্বলিত হউক, হিন্দুর আশ্রয় পুণ্যময় ও পবিত্র হউক, পূর্বের সমাজ বন্ধন আবার দৃঢ় হউক, হিন্দুর গুরু পুরোহিত পূর্বের আশ্রয় শক্তিবান ও নির্লোভ হউক, বিদেশী রীতি-নীতি হিন্দুর গৃহ হইতে দূর হইয়া নাটক বাক্যে পণ্ডিত আবার বথার্থই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ হউক।

পাঠক এই স্বাক্ষরদ্বয়কে চিনিতে পারেন কি? ইহার ভিতর যিনি সন্তানদ্বয়ের জননী, তিনিই আপনাদের পূর্ব পরিচিতা সাগরবালা। কুমারী—কামেরিয়া। অট্টালিকা—ভবরামের সংসারশ্রম। বিরোধীর বৃদ্ধার কুটীরে যেদিন আপনারা ভবরাম ও কামেরিয়াকে দেখিয়াছিলেন, তাহার পর সুদীর্ঘ তিন বৎসর সতীত হইয়া গিয়াছে। ভবরাম শ্রমশান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কাগজ পত্র সহ কামেরিয়াকে সেইদিনেই স্বগৃহে বইয়া আসিয়াছেন। কামেরিয়া এখন আর সেই পূর্বের আশ্রয়

পার্কভীয়া বালিকা নাই। সে সাগরবালার সংস্পর্শে এবং ভব-
রামের যত্নে এখন আদর্শ বঙ্গবাল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমেরিয়া
এখন ভবরামের সংসারশ্রমে বাস করিতেছে। পূর্বের ছায় সে
সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞাই আছে, তবে লোকালয়ে বাস করিয়া
এখন জগতের অনেক বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে।
আমেরিয়ার অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্যভাব দেখিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ
পাঠের জন্ত ভবরাম একজন ধার্মিক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত
করিয়াছেন। আমেরিয়ার জ্ঞান, বুদ্ধি, ভগবদ্ভক্তি ও বিচার-
বিশ্লেষণ শক্তি দেখিয়া, ভবরাম আশ্চর্য্য হইয়াছেন। পূর্বজন্মের
স্মৃতি ও ব্রহ্মতেজসম্পন্ন মহাত্মার কৃতা বলিয়াই আমেরিয়া বুদ্ধি
সাধারণ স্ত্রীলোক হইতে এই প্রকার উচ্চাসনে অবস্থিত। সে
যাহা কখনও শিক্ষা করে নাই, যে কথা কেহ তাহাকে কখন
বুঝাইয়া দেয় নাই,—যে সব শাস্ত্রগ্রন্থ কখন পাঠ করে নাই, সে
সকলের তাৎপর্য্য সে সুন্দররূপে বুঝাইতে পারে। ভবরাম কখন
মনে করেন, আমেরিয়া দৈবশক্তিসম্পন্ন অদ্ভুত বালিকা। কখন
ভাবেন, আমেরিয়া নানবী নহে—বাস্তবিকই দেবী। আমেরিয়াকে
গৃহে আনয়ন করা অবশ্য তাঁহার সংসারশ্রম আরও
পবিত্র ও উজ্জলভাব ধারণ করিয়াছে! বুঝি কুমারী গৌরী
স্বয়ং বালিকামূর্তি পরিগ্রহ করিয়া হিমালয় হইতে নামিয়া
আসিয়া, ভবরামের সংসারকে হিন্দুর আদর্শ-রূপে পরিণত

করিয়াছেন । ভবরাম উপযুক্ত পাত্রের হস্তে আমেরিয়াকে অর্পণ করিবার জন্ত বহু চেষ্টা করিয়াছেন—আমেরিয়াকে কত প্রকারে বুঝাইয়াছেন, সাগরবালা আমেরিয়াকে কত অনুনয়-বিনয় করিয়াছে; কিন্তু সে বিবাহ করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হয় নাই । বিবাহের নামেই আমেরিয়ার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয় । সে বলে—

“কেন আপনারা আমাকে সংসার-বন্ধনে বাধিয়া অথবা ছুঁধ দিবেন ! বিবাহের নামে আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে । কে যেন আমার কাণে কাণে বলে—বিবাহ করিলে তোমার ব্রত উৎসাপন হইবে না, সংসারে সাধারণ স্ত্রীলোক যাত্রা করে, তোমাকে তাহা করিতে হইবে না । সম্ভান গর্ভে ধারণ করিবার জন্ত ভারতে রত্নবীর অভাব নাই ! তুমি একা বিবাহ না করিলে ভগবানের সৃষ্টির কোনই ক্ষতি-রুদ্ধি হইবে না । তবে কেন তুমি তোমার জীবনের ব্রত পণ্ড করিবে ?”

বিবাহ কি, বিবাহ কাহাকে বলে, বিবাহের ফলাফল কি—পূর্বে এ সব আমেরিয়া কিছুই বুঝিত না ! এখন সে বিবাহের উদ্দেশ্য কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছে ।

বিবাহে আমেরিয়াকে বীতরাগ দেখিয়া এখন ভবরাম সাগরবালা কেহই আর সে কথা উত্থাপন করে না । বিবাহ না করিয়া যদি আমেরিয়া বিমল সুখশান্তির অধিকারিণী হয়, তাহাই ঠিক, ভগবানের যদি ইহাই অভিপ্রেত হয়, তবে তাঁহারই

মঙ্গল-ইচ্ছা পূর্ণ হউক । আমেরিয়ার বিবাহের কল্পনা এখন আর ভবরাম বা সাগরবালার হৃদয়ে মুহূর্তের জন্ত উদ্ভিত হয় না ।

সাগরবালার সহিত আমেরিয়ার ভগবদ্ গীতা লইয়া আলোচনা হইতেছিল । দিবা অবসানপ্রায়, রবি অন্তগমনোন্মুখ । আমেরিয়া বলিল, “চল মা ! সন্ধ্যা-আফ্রিক ও আরতির আরোজন করি বাবা এখনই সন্ধ্যাবন্দনাদির জন্ত গৃহে আসিবেন ।”

আমেরিয়াকে ভবরাম ও তাহার কনিষ্ঠ করুণাময় “মা” বলেন । সেও ভবরামকে বাবা ও করুণাময়কে কাকা বলে । আমেরিয়া সাগরবালাকে মা বলিয়া সম্বোধন করে । সাগরবালার আমেরিয়াকে কখন মা-লক্ষ্মী, কখন বা আদর করিয়া আমেরি বলিয়া ডাকেন । তিনি তাহাকে নিজের কত্যা অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করেন । আমেরিয়াও সাগরবালাকে নিজ গর্ভধারিণী অপেক্ষাও অধিক ভক্তি সম্মান করে । ভবরামের সন্তান দুইটি আমেরিয়ার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় । ভবরামের বর্তমান জ্যেষ্ঠ পুত্র ককু আমেরিয়াকে না দেখিলে মুহূর্তের জন্ত কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে পারে না । আমেরিয়া যেন স্নেহ-ভালবাসার কঠিন নিগড়ে ককুকে হৃদয়ের সহিত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে একপভাবে বাঁধিতে বাকি তাহার জননী সাগরবালাও পারে নাই ।

আমেরিয়া সন্ধ্যা-আফ্রিক ও আরতির আরোজন করিবার জন্ত

উঠিয়া গেল। সাগরবালাও তাহার সঙ্গে যাইতেছিল; কিন্তু স্বামীকে আসিতে দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ভবরামের আর পূর্বের মত বেশভূষা নাই। নগ্নপদ, নগ্নদেহ, কঙ্ক কেশ, গৈরিক বসন—তাহাও আবার জাম্বুর উপরে অবস্থিত।

ভবরাম আসিয়াই সাগরবালাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মা কোথায়?”

সাগরবালা বলিল, “মা-লক্ষ্মী সন্স্কারতির উদ্যোগ করিতে গিয়াছে।”

“তুমি যাও নাই কেন?”

“আমিও যাইতেছিলাম, আপনি আসিতেছেন দেখিয়া দাঁড়াইয়া আছি।”

সাগরবালা তাড়াতাড়ি একখানি কুশাসন আনিয়া স্বামীকে বসিতে দিল।

স্বামী উপবেশন করিলে, সাগরবালা ভবরামের পদপ্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, “আপনি কি আজ শ্রান্ত হইয়াছেন? আমি ওই একটি কথা আজ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব।”

ভবরাম নতমুখী সাগরবালার দিকে চাহিয়া বলিলেন—“কি কথা বল! আমি ক্লান্ত হইলেও সাধামত তোমার প্রশ্নের উত্তর দব।”

সাগরবালা বলিতে লাগিল—

“আমি কামেরিয়ার আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি।

তিন বৎসরের মধ্যে মা আমার কি করিয়া তুচ্ছ শাস্ত্রগ্রন্থগুলি কর্তৃস্থ করিল? কেবল কর্তৃস্থ নয়, শাস্ত্রগ্রন্থের বার্থ তাৎপর্য-গুলি যাহা মা আমার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। আজ আমেরিয়া আমাকে কত যোগের কথা বুঝাইতেছিল। সে বলিতেছিল যে, প্রাণায়াম বাতীত মন ও ইন্দ্রিয়গণ স্থির হয় না। প্রথমে প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত। প্রাণায়ামের দ্বারা প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, এমন কি সমাধি পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। প্রাণায়ামাদি যোগ-ক্রিয়া অভাবেই ভারত আজ গ্লানভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পুণি গত শাস্ত্রালোচনার ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। এক যোগবলেই জীব সে জ্ঞানলাভ করিতে পারে। যোগিগণ যোগবলে শত যোজন দূরের কথা এক নিমেষে জানিতে পারেন। এই প্রকার কত যোগের কথা আজ আমাকে বুঝাইতেছিল। আমি সে সব কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারি নাই। আমেরিয়া কিরূপে এই বয়সে এ সমস্ত আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে? আমি দুই বৎসর প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, আমেরিয়াও আমার মনের উন্নতির জন্ত কত চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলাম না। আমার চেষ্টা বার্থ হইয়া যাইতেছে কেন? আর মা-লক্ষ্মী আমার অতি সহজেই ভগবদ্ আরাধনার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে কিরূপে? ইহার ভিতর কি কোন গুঢ় কারণ আছে?”

ভবরাম বলিলেন, “এই কথাটা কি তুমি বুঝিতে পার নাই ?”

মাগরবালা সাগ্রহে স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল, “বুঝিবার জন্তই আজ আপনার আশ্রয় লইয়াছি ।”

ভবরাম বলিলেন, “আচ্ছা ! তবে আমি বুঝাইতেছি । তোমার মন বেশ স্থির আছে ত ?”

মাগরবালা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন । ভবরাম বলিতে আরম্ভ করিলেন—

“শুন মাগরবালা ! তুমি বলিলে অনেক চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু কার্যো অগ্রসর হইতে পার নাই ; কিন্তু না আনার বিনা চেষ্টায় বা স্বল্পায়াসেই প্রাণায়াম বা শাস্ত্রাদির মন্ত্র হৃদয়মন করিতে পারিয়াছে । একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলেই এই প্রণের মীমাংসা করিতে পারিতে । আমরা গতজীবনে যেক্রপ কার্য্য করিয়া আসিয়াছি, ইহজীবনে তক্রপ ফলভোগ করিতেছি । আবাত ইহজীবনে যেক্রপ কার্য্য করিব, পরজীবনে সেইক্রপ ফলভোগ করিতে হইবে ।”

মাগরবালা বলিল, “আমরা গতজীবনে কি করিয়াছি না করিয়াছি, তাহার প্রমাণ কি ? কি করিয়া আমরা গতজীবনের কথা বুঝিব ?”

ভবরাম গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “বহু প্রমাণ আছে ; কিন্তু প্রমাণ দ্বিত্বা কি হইবে মাগরবালা ? হিন্দুশাস্ত্রে মহা মহা ঋষিগণ

যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা কি মিথ্যা কথা ? তাঁহাদের তুলনায় আমরা যে কত নগণ্য জিনিসকীট—তাহা কি আবার বলিতে হইবে ? যোগী-ঋষিরা কখন মিথ্যাবাদী ছিলেন না, ইহা যদি বিশ্বাস করিতে পার, তবে তাঁহাদের বাক্যের একটি বর্ণও যে মিথ্যা নহে, ইহা কেন বিশ্বাস করিবে না ? সেদিন ত আমেরিয়া—মা-লক্ষী তোমাকে মহাভারত পাড়িয়া বুঝাইতেছিল—

“মৎস্তোহ বথা স্রোত ইবাভি পাতী,

তথা কৃতং পূৰ্ব্বমুপৈতি কৰ্ম্ম ।

শুভে হ্যসৌ তুশ্যতি হৃষ্টতে তু,

ন তুশ্যতে বৈ পরমঃ শরীরী ॥

মহাভারত, শাস্তিপৰ্ব ।

মৎস্ত যেমন স্রোতের দিকে ছুটিয়া যায়, পূৰ্ব্বজন্মের কৰ্ম্মগুলিও সেইরূপ মনুষ্যের পশ্চাতে ছুটিতে থাকে । গীতা ইহাতেও এই সব কথা মা তোমাকে প্রত্যাহই ত বুঝাইয়া থাকে । তুমি কি সব ভুলিয়া গেলে সাগরবালা ?

“পূৰ্ব্বজন্মের কৰ্ম্মফলে যে সৌভাগ্য সঞ্চিত হয়, সেই সৌভাগ্যই তাহাকে ইহজন্মে শুভফল প্রদান করিয়া থাকে । গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, “পূৰ্ব্বজন্ম ধৃতং বিজ্ঞা পূৰ্ব্বজন্মার্জিতং কলম ।” চৈতন্যদেব বড়বিশ্ব বৎসর বয়সে সমগ্র ব্যাকরণ, স্তোত্র, সাংখ্য, কাব্য প্রভৃতি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন । তাঁহার নিকটে বড় বড়

পণ্ডিত তর্কে পরাস্ত হইয়াছিল। বেশী দিনের কথা ছাড়িয়া দাও—ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কখনও শিক্ষা-মন্দিরের দ্বারে গমন করেন নাই, অথচ তাঁহার নিকট কোনও শাস্ত্র কি অবদিত ছিল? তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি এবং অমৃতউৎসরূপী বাক্যসুধা সকলেই পান করিয়া বিমোহিত হইত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অতি অল্প বয়সেই সমগ্র শাস্ত্রগ্রন্থ আয়ত্ত করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তি-তর্কে কত বড় বড় বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাণ্ডিতগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। তাই বলিতেছি, বিদ্যালভ পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি না থাকিলে হয় না। মায়ের আনার পূর্ব্বজন্মের সৌভাগ্য সঞ্চিত ছিল, তাই সে ধর্ম্মের পথে—যোগের পথে—ভগবদ্ আরাধনার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। তোমার পূর্ব্বজন্মের সৌভাগ্য নাই, তাই চেষ্টা করিয়াও অগ্রসর হইতে পারিতেছ না। মায়ের আনার স্মৃতি ছিল বলিয়াই সে ভগবৎভক্ত ভক্তব্রী একমিষ্ট ব্রাহ্মণের গুরুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তুমি বলিলে—

কি করিয়া গতজীবনের কথা বুঝিবে?
 “কেন বুঝিবে না! চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পার। ইহা নিজে উপযুক্ত হও, স্বচক্ষে গতজীবনের ঘটনা দেখিতে পাইবে। না হয় যোগীশ্বরির কথা বিশ্বাস কর। নিজেও দেখিবে না, শাস্ত্রের কথাও শুনিবে না? তবে তুমি কি করিবে? আমি যদি তোমার বলি, “আজ পঙ্গাব একখানা বড় জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে।”

যদি আমার উপর তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে তুমি তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। আর সে বিশ্বাস যদি না থাকে, তাহা হইলে হয় ত পরীক্ষা করিবার জন্ত নিজে যাইয়া দেখিয়া আসিবে। ছুটির একটিও করিবে না, কেবল মুখে বলিবে—হিন্দুশাস্ত্র মিথ্যা, পূর্বজন্ম নাই, দেব-দেবী নাই, পাপ-পুণ্য নাই, যোগ-ধ্যান নাই, হিন্দুধর্মে কিছুই নাই। ইহা কেবল তোমার দোষ নয় সাগরবালা! এই দোষেই ভারত রসাতলে ঝাইতেছে। বেদ-বিদী যদি মিথ্যা হয়, ধর্ম-অধর্ম যদি মিথ্যা হয়, পাপ-পুণ্য যদি মিথ্যা হয়, ইহজন্ম, পরজন্ম, কর্মফল এ সমস্ত যদি মিথ্যা হয়, তবে সত্য কি? সত্য কি কেবল আহার-বিহার অর্থোপার্জন রোগ-শোকের দাহন আর মৃত্যু! তাহা হইলে ভগবান যিনি আপনার আদর্শ লইয়া মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই মানবে ও পশুতে কি প্রভেদ রহিল। পশুরা এই সকল করিয়া থাকে বলিয়া তাহারা ছেয়—আর মানব পশু-প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্ররূপে কার্য্য করে বলিয়া তাহারা শ্রেষ্ঠ। কর্মফলে মানব জ্ব্ব ও ছুঃখ লাভ করিয়া থাকে। এ কথা তোমায় বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি, মনযোগ সহকারে শুন।

“পণ্ডিতগণ বলেন, মানবগণ কৃত কর্মের দ্বারা কলভোগ করিয়া থাকে। সকলেই কর্মাধীন। কেহই ইহার উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারে না। কর্মফলে যেথিবে এক

জন অন্ধ, খঞ্জ, বিগলিতাঙ্গ ভিক্ষুক রাস্তায় বসিয়া কাতরস্বরে ভিক্ষা করিতেছে, আর একজন দিবা আরামে তাশুল চৰ্কাণ করিতে করিতে সিগারেটের ধূম উদ্গীরণ করিয়া, মোটর হাঁকাইয়া সুখে গমন করিতেছে । গতজন্মে মানব যে প্রকার কৰ্ম্ম করে, পরবর্ত্তী জন্মে তাঁহাকে সেই প্রকার ফলভোগ করিতেই হইবে । কৰ্ম্মের সুপরাশি ভেদ করিয়া যদি শৈশবের রূপা ব্যয়িত্বকে মনে পড়ে, তবে গতজন্মের কথা ইহজীবনে মনে পড়িবে না কেন ? হৃদয়ের মলিনতা দূর কর, স্বচ্ছ হৃদয় হইলে গতজীবনের কৰ্ম্মরাশির প্রতিবিম্ব আপনি আসিয়া পড়িবে । যোগীরা বহু জীবনের কথা জানিতে পারেন । গতজীবনে আমরা যে যেৰূপ কাৰ্য্য করিয়াছি, ইহজীবনের কৰ্ম্মের আদর্শ দেখিয়া তিরচিত্তে চিন্তা করিলে পূৰ্ব্বেজীবনের কৰ্ম্মের কতকটা আভাস পাওয়া যায় । ইহজীবনে কেহ বাল্যকাল হইতেই চোর, কেহ ধার্মিক, কেহ সাধু, কেহ লম্পট, কেহ নিপণবালী, আবার কেহ ধৰ্ম্মভীরু বা অধার্মিক হয় । ইহার কারণ কি ? কেন একরূপ ঘটে ? মানব মাত্রেই ভগবানের সৃষ্ট জীব । তবে এ তারতম্য কেন—তবে এ সৃষ্টিবৈচিত্র্য কেন ?

“যে কারণে এই সব হয়, সেই কারণেই আমাদের মাঝেবিস্তীর্ণ আত্মাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে । তিন বৎসরের মধ্যে না আমার যে এত

উচ্ছে উঠিয়াছে, ইহা বর্তমানকালের হিন্দুরা বিশ্বাস করিবে না, বা বিশ্বাস করিতে পারে না। পূর্বজীবনে যে যতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, ইহাজীবনে সে সেই কৰ্ম্মভূত্বের উপর আসিয়া প্রায়মান হয়। সুকৰ্ম্মের ফলেই নর-নারী, দোগা-ঈষি বা দোয়াগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করে। কেহ বা রাজার গৃহে রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, কেহ বা ভিখারী গৃহে জন্মলাভ করিতেছে। কেন একরূপ হয়? পূর্বের কৰ্ম্ম সঞ্চিত না থাকিলে কেমন কি একরূপ হইতে পারে? মা কামেরিয়া পূর্বে এসব করিয়াছিল, তাই ইহাজীবনে সেগুলি স্বল্পায়াসে আয়ত্ত করিয়াছে। আমার করা ছিল না, তাই অগ্রসর হইতে পারিতেছ না। একথা মুখবার ত বিশেষ কোন গোল নাই। তুমিও কৰ্ম্মবীজ রোপন কর, জন্ম-জন্মান্তরে কোনদিন না কোনদিন এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইবে এবং কালে সেই বৃক্ষ ফলে ও ফুলে হৃদ্যোভিত হইয়া বিশাল বনস্পতির আকার ধারণ করিবে।

“সাগরবালা! সুকৰ্ম্ম বা কুকৰ্ম্মের ফল কখন বৃথা যায় না! কৰ্ম্মফল যাহারা স্বীকার করে না, তাহারা যে কেবল হিন্দু নয় তাহা নহে। তাহারা পশু অপেক্ষাও অধম। আমি ব্রহ্মহত্যা করিলাম, পরস্ব অপহরণ করিলাম, পরদার গমন করিলাম, গায়ের জোরে পরের ধন কাড়িয়া লইলাম। আমায় কেহ কিছু করিতে পারিল না। মিথ্যা কপটতার জয়ডঙ্কা বাজাইয়া দিন দিন আমি

পার্থিব উন্নতি-শিখরে উঠিতে লাগিলাম । লোকে ভাবিল, পাপ-পুণ্য নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই ; কিন্তু ইহাদের পূর্ব্ব কর্ম্মের জোর আছে বলিয়া এত অধর্ম্মের উপরেও সুখভোগ করিতেছে ! সময় না হইলে কোন কার্য্যই হয় না । জন্ম-জন্মান্তরের পর যখন সময় আসিবে, কর্ম্মফল ভোগ হইবে । এই হিন্দুশাস্ত্রের কথা কখনই মিথ্যা হইবার নয় । আমাদের শাস্ত্র বলিতেছে—

যশ্মিন বয়সি যৎকালে যা দিবা যচ্চ বা নিশি ।

যমুহুর্ন্তে ক্লেণে বাপি তন্তুখান চদন্তথা ।

যে বয়সের সময়, যে দিন বা রাত্রে, যে মুহূর্ত্তে যে কর্ম্ম নির্দিষ্ট আছে, ঠিক সেই দিনে বা মুহূর্ত্তে সেই কর্ম্ম অবশ্য ঘটিবে । আমাদের কর্ম্মফল বরাবর সঞ্চিত হইয়াই আসিতেছে । সেই কর্ম্মফলগুলি পরে পরে আমরা জীবনে ভোগ করিয়া আসিতেছি মাত্র । এই জন্যই যোগিগণ যোগবলে কু ও সুকর্ম্মের ফলাফল অবগত হইয়া মানবের কল্যাণের জগা বচ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন । কোনটি সুকর্ম্ম, কোনটিই বা কুকর্ম্ম, শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । ভারতের রীতি-নীতির যে প্রচলন ছিল, তাহা এই শাস্ত্র হইতেই গৃহীত । তাহারা যে সব বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা মানবের কল্যাণের জগা । সে সব আমরা তাগ করিতেছি বলিয়াই আমাদের এই অধঃপতন । নতুবা হিন্দু আমরা,—ব্রাহ্মণ আমরা, আমাদের আরার অভীত ক্রম কি ?

হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ ব্যতীত হিন্দুকে কোন কার্য করিতে নাই ; কিন্তু আমরা শাস্ত্রোপদেশ না মানিয়া মনগড়া ধর্ম সৃষ্টি করিয়া লইতেছি। পাছে হিন্দুকে কৃষ্ণের ফল ভোগ করিতে হয়, এই জন্ত ঋষিগণ আনাদিগকে সম্বৎ রামিবার জন্ত বেদ-বিধির সৃজন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশ্বপ্রেমিক ও জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন বলিয়াই শত সহস্র বর্ষের তপস্তার অভিজ্ঞতার ফল মানবকে দান করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু হিন্দুর এখন এমনই ছুরাদৃষ্ট যে, সেই উপকারী ঋষিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দূরে থাকুক,—তাঁহাদের বেদবিধি না মানিয়া সব মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয় ! ভাবে না যে কাহার মঙ্গলের জন্ত তাঁহারা এই জীবনব্যাপী যোগ-তপস্তার ফলস্বরূপ এই অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

“সাগরবালা ! কর্মফল ভোগ করিবার জন্তই আনাদিগকে বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যদি কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতে না হইত, তাহা হইলে আনাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হইত না।

দেহে পঞ্চত্মাপন্ন দেহী কর্ম্মানুজোহবশঃ ।

দেহান্তর মনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং তাক্ততে বপুঃ ॥

ব্রজং তিষ্ঠনুশৃদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি ।

যথাতৃণ জলৌকৈবং দেহী কর্ম্ম গতিং গতঃ ॥

(ভাগবত—১০ স্কন্ধ ।)

কাহার মন্মথবাদ এই যে,—বাহার স্বরূপ কর্ম্ম, সেই কর্ম্মানুসারে

দেহী, সেইরূপ একটা দেহকে আশ্রয় করিয়া পূর্বদেহ পরিত্যাগ করে ; অর্থাৎ যাত্রার যেরূপ কন্মফল, সে সেই প্রকারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । কেহ চণ্ডালের গৃহে, কেহ ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিতেছে, কেহ জন্মাবধি বাল্যকাল হইতে চোর হয়, কেহ বা যৌবনে উপনীত হইতে না হইতেই লম্পট বা কানুক হয়, কেহ বা বাল্যকাল হইতেই ধর্মপথের পথিক হয় । কেহ বা শিশুকাল হইতেই পূজা অর্চনা করিতে ভালবাসে । কেহ বা শিশুকাল হইতেই প্রতিবাসীর লাউ-কুমড়া চুরি করিতে অভ্যস্ত হয় । গীতাতে স্বয়ং ভগবান নিজ মুখে বলিয়া গিয়াছেন, “যে রূপ মনভাব তাইরা দেহ-প্রাপ্ত করে, দেহান্তে সে সেইরূপ দেহই প্রাপ্ত হয় ।” ইহার উপরেও কি “পূর্বজন্ম” বা “কন্মফল” মিথ্যা বলিবে সাগরবালা ? নামেরিয়া কেন যে আমাদিগকে দূরে রাখিয়া যোগের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, তাহা কি এখন বুঝিতে পারিলে ? ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,

নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপর্যাণি ।

তথা শরীরানো বিহায় জীর্ণ—

ব্রহ্মানি সংগ্ৰহাতি নবানি দেহী ॥

(গীতা, ২য় অধ্যায় ।)

জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যেরূপ নূতন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তদ্রূপ জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে। অর্থাৎ যাহার যেরূপ কর্মফল, সে তদ্রূপ দেহই ধারণ করে। পূর্বেই বলিয়াছি, তুমি যদি স্থিরচিত্তে অর্থাৎ প্রাণায়ামাদির দ্বারা চিত্তচাক্ষুশ্য দূর করিতে পার, তবে গত জীবনের ও পূর্ব কর্মের প্রতিবিম্ব তোমার স্বচ্ছহৃদয়ে চাক্ষুষ দেখিতে পাইবে। তখন আর তোমাকে সন্দেহ-দোলায় ছলিতে হইবে না। তখন যদি না পার, তবে যাহারা চাক্ষুষ দেখিয়াছেন, সেই ঋষিদের কথার উপর—তোমার এণমাদিগের উপর, সর্বশেষে হিন্দুশাস্ত্রের উপর—মুঠল বিশ্বাস স্থাপন কর। চন্দ্র, সূর্য্য, দিবারাত্র, পাপ ও পুণ্য যেরূপ সত্য, জন্মান্তর কর্মফলও তদ্রূপ সত্য।

“মাগরবালা ! তুমি মহাতপা বশিষ্ঠদেবের কথা বিশ্বাস করিবে না, কালকালকার ভোগসর্বস্বদেহ, আচারভ্রষ্ট, হিন্দুশাস্ত্রানভিজ্ঞ, যেরূপ ভাবন হিন্দুর কথা বিশ্বাস করিবে ? কুর্কর্মের ফলে—মানুষ, পশু, পক্ষী—এমন কি ক্রিমিকীট ইহঁয়া ভগ্নগ্রহণ করে ! বশিষ্ঠদেব ক্রিমিকীটকে বলিতেছেন :—

“দেবত্ব মণমানুষ্যং পশুত্বং পক্ষিতাং তথা।

ক্রমিকং স্থাবরত্বঞ্চ যায়ন্তে চ স্বকর্মভিঃ ॥”

অর্থাৎ মানুষ স্ব স্ব কর্মফলানুসারে—স্থাবর, পশু, পক্ষী, দেব, মনুষ্য, ক্রিমিকীটরূপে ভগ্নগ্রহণ করে। কর্মফলের কি শক্তি বুঝিলে ?

“ভাগ্যানি পূর্ব তপসা কিল সঞ্চিতানি ।

কালে ফলন্তি পুরুষশ্চ যথৈব বৃক্ষাঃ ॥”

অর্থাৎ পূর্ব জন্মের তপস্তার ফলে যে সৌভাগ্য সঞ্চিত হয়, তাহা যথা সময়ে বিনা চেষ্টায় বা স্বল্পায়সে বৃক্ষ সমূহের জ্বায় ফল প্রসব করে । আমাদের কাঁমেরিয়া পূর্বের কার্য্য করিয়া রাখিয়াছিল, তাই ইহজন্মে সুফল প্রাপ্ত হইতেছে—ইহা বুঝা ত কঠিন নহে সাগরবালা ? হিন্দুশাস্ত্রে অগাধ শ্রদ্ধা বিশ্বাস রাখিতে পারিলে, একদা সন্দেহ তোমার মনে আর কখনও আসিতে পারিবে না ।”

“বাবা ! আপনি এখনও বসিয়া আছেন ? সন্ধ্যা যে উত্তীর্ণ হইয়া গেল ।”

কাঁমেরিয়া দেবগৃহে সন্ধ্যা-প্রাক্তিকের সমস্ত আয়োজন করিয়া ভবরামের অপেক্ষা করিতেছিল, বিলম্ব দেখিয়া ডাকিতে আসিয়া দেখিল, ভবরাম সাগরবালার সহিত ধর্ম্মচর্চা করিতেছে ।

কাঁমেরিয়ার আস্থানে ভবরাম তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, “মাই না ! এতক্ষণ আমাকে সাগরবালা আটক করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছিল ।”

সাগরবালা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, “আমিই দোষী বটে মা ! আমি শাস্ত্রালোচনা শুনিতে বড়ই ভালবাসি । যখনই শুনি, তখন মনে দিবা কি রাত্রি আমার জ্ঞান থাকে না । স্বামীর অনুত্তমর উপদেশ শুনিলে আমার মন উবেলিত হইয়া উঠে । আমি তখন

হইয়া যাই। তখন আর আমার সন্তান ও সংসারের কথা মনে থাকে না—এক্ষণে চল যাইতেছি।”

এই বলিয়া ঝামেরিয়া অস্ত্রে, মধ্যে সাগরবালা, তৎপশ্চাতে ভবরাম ত্রিতলস্থ দেবারাধনার নির্দিষ্ট গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিয়দূর অগ্রসর হইয়া ভবরাম বলিল, “সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে চলিল, করুণাময় এখনও আসিতেছে না কেন?”

ঝামেরিয়া বলিল, “কাকা বহুক্ষণ আসিয়াছেন—তিনি আপনার জন্ত দেবগৃহে অপেক্ষা করিতেছেন। আমার ফকুও কাকার কাছে একটি ছোট কুশাসনের উপর যোড়হাত করিয়া বসিয়া আছে।”

ঝামেরিয়ার কথা শুনিয়া ভবরামের হৃদয় আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অন্তর করুণাময় পূর্বে বড়ই অনাচারী ছিল। ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া বিদেশীভাবাপন্ন জমীতিপরায়ণ বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্য্যে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল। দ্রাতার অবস্থা দেখিয়া ও পরিণাম ভাবিয়া ভবরাম মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠিতেন। এমন দিন যাইত না—যেদিন ভবরাম এইজন্ত ভগবানের নিকট নীরবে অশ্রুপঙ্কত না করিত। এতদিনে ভবরামের প্রতি দেবতা স্মৃতিসম হইয়াছেন। প্রাণের অন্তর করুণাময় স্ব-গৃহে ও স্ব-ধর্মে ফিরিয়াছে। তাহার মোহ খুচিয়াছে—সে বন্ধুদের পরিত্যাগ করিয়াছে। করুণাময় এখন যোগের পথে, ধর্মের পথে

মগসর হইতেছে । বিলাসিতার আকারজনক পীড়া করুণাময়ের
মার শূল করিতে পারে না, সুপথ একবার যে দেখিতে পাইয়াছে,
সে কি আর জন্ম-জন্মান্তরে উহা পরিত্যাগ করিতে পারে ?
করুণাময় পূর্বেই গিয়া আসনে বসিয়াছে—আমেরিয়ার নিকট এই
কথা শুনিয়া, বিমল আনন্দে ভবরামে স্নান করিয়া হইল । তাহার
প্রথম গুলি কি যেন এক স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইল ।

তিনজনে গৃহে প্রবেশ করিয়া করুণাময়ের পার্শ্বে স্ব স্ব আসনে
উপবেশন করিলেন । সেই গৃহ ধূপধূনার গন্ধে আমোদিত ।
সেই প্রবেশ করিলেই মন যেন কি একপ্রকার পবিত্র ভাবে পূর্ণ
হয় । ভবরাম আচমনাদি করিয়া প্রথমতঃ বেদমাতা গায়ত্রীর ধ্যান
করিতে লাগিল । গায়ত্রীর ঐ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতেই সে
সাহজ্ঞান হারাইল !

হার ! ব্রাহ্মণ হইয়া বেদমাতা গায়ত্রীর নামোচ্চারণ বুঝি এখন
স্বাভাবিক হইতে পারে না ! এ কথা মনে হইলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়—
ব্রাহ্মণের জল সংবরণ করা বাগ্ন না ! লিখিতে হস্ত অবশ হইয়া
পড়িতেছে । গায়ত্রীই যে ব্রাহ্মণের সর্বস্বত্ব ! গায়ত্রীই যে ব্রাহ্মণের
প্রাণায়াম । ও হ্রঃ (মুলাধার), ও ভুবঃ (স্বাধিষ্ঠান—লিঙ্গমূল),
ও স্বঃ (মণিপুর—নাভিদেশ) ! এইরূপ ব্রাহ্মণের গায়ত্রীতেই
প্রাণায়াম করিয়া বায়ুকে ক্রমান্বয়ে ষট্চক্র ভেদ করিয়া সহস্রাধারে
বিস্তারিত করিয়া দিয়া রাখা যায় । ইহাতেই ব্রাহ্মণের

কোটা সূর্যের তায় তেজোবিশিষ্ট বিমল জ্যোতিঃ পরমব্রহ্মের
দর্শনলাভ হয়।

ইহা কিরূপ বুঝাইবার উপায় নাই। সাধক যিনি, তিনিই
ইহা জানেন। জিহ্বায় আশ্বাদ না করিলে মিষ্টতা যে কি,
গাহা বুঝান যায় না। বড়ই হৃৎথের বিষয়, ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ
আজকাল বিদেশীভাবে বা বিদেশী শিক্ষায় এতই অধঃপতিত
হইয়াছেন যে, বেদমাতা গান্ধারী পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা
তৈলাক্ত, মলিন ছিন্ন বস্ত্রপবীত স্বল্প হইতে কটীদেশে নামাইয়া
আনিয়াছেন। আজকাল—“আমি ব্রাহ্মণ” এ কথা বলিয়া কেহ
কাহাকেও পরিচয় দেয় না! হিন্দুর শিরোভূষণ ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব
কুলস্মারগণ এখন “বোনার্জি”, “চেটার্জি”, “মুথার্জি” নামে
অভিহিত হইয়া পুণ্যায়্যা পিতৃপুরুষগণের উজ্জ্বল মুখে ছুরপনের
কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিতেছে! আমাদের পূর্বপুরুষগণের
অতিসম্পাতেই বুঝি ভারতের আত্ম এই হৃদয়!।

বহুদিনের একটি গল্প মনে পড়িল। একজন শিক্ষিত ভদ্র
মাতালকে একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ উপদেশ দিতেছেন, “বাপু! সুর
পান করিও না! সুরপানকারীদের নরকে বাস হয়।” মাতাল বলিল,
“অমুক রাজা, অমুক মহারাজা, অমুক জমিদার ইহারা আমার
চেহ্নে বেশী মদ খায়। আমার বেশী পরমা জোটে না, আরই খাট
খাই। কখনো কখনো খাট খাই। ইহাদের অপার পরমা, ইহারা

বিলাতি খান, তবে সখ করিয়া মাঝে মাঝে খাঁসী খান । তা' ভট্টাচার্য্য মহাশয় ! ইহারা সবাই নরকে যাবে ত ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ধর্ম্মের কাছে কি পয়সাগুলো আর গরীব আছেরে বাবা ! শাস্ত্রে বলে সুরাপান করিলেই নরকগামী হইতে হইবে ; তা বড় লোকই হউক, আর গরীবই হউক ।" মাতাল স্মৃতিভরে বলিল, "তবে আর ভাবনা কি ? নরক ত গুলজার হবে ।"

যাহারা যোগী-ঋষির বংশধর হইয়া—ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া, হিন্দুর আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিতেছে—গায়ত্রী, ইষ্টমন্ত্র, পূজার্ত্তনা প্রভৃতি হিন্দুর কর্তব্য কৰ্ম্মগুলি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, বিদেশীর অনুকরণে পিতৃপুরুষের উপাধী ত্যাগ করিয়া, আপন নাম নিজ হইতে ঘোষিত করিতেছে, তাহারাও হয়ত ভাবে "আমাদের নরক ত গুলজার ! ভয় কিসের ?" ইহারা পৈত্রিকধর্ম্ম, পিতৃদত্ত নাম, পৈত্রিক আচার-ব্যবহার, ব্রীতিনীতি কিছুই জানে না ! স্বর্গ নরক মানে না ! পূর্বজন্ম স্বীকার করে না ! আবার মরিতে হইবে, ইহাও বুঝি ভাবে না ! ভাবে যে কি তাহা বুঝান কঠিন !

“আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনক,

সানাতনমেতৎ পশুভিনরাণাম্ ।

ধর্ম্মোহিতেশ্বামধিকো বিশেষো,

ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥”

আজ্ঞার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন মানবেরও আছে, পশুরও আছে। কেবল ধর্মকার্যের গুণেই মানব পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহাদের শেবোক্ত কার্যটিরই একবারে অভাব হইয়াছে। বিকৃত শিক্ষায় হিন্দু আজ জাতিস্ব হারাইয়াছে। ব্রাহ্মণ দিনান্তেও বোধ হয় একবার ভগবানের নাম স্মরণ করে না। শিল্পোদয়—লোভপরায়ণ—স্বার্থপর—সংকীর্ণমনা—নীচ প্রকৃতি যাবতীয় বিশেষণ এই কলির ব্রাহ্মণের অঙ্গের ভূষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেহবিলাসী—ভোগবিলাসী—হিন্দুর সন্তান হইয়া পাশ্চাত্যের দৃষ্ট অমুকরণে—আমাদের দেহ ও মন পুষ্ট হইতেছে—আমাদের আদর্শ নাই—উদ্দেশ্য নাই—লক্ষ্য নাই—সীমাহীন—অস্তুহীন—চূর্নীতির মহার্গবে আমরা ভাদিয়া চলিয়াছি। আমাদের কলঙ্ক—আমাদের অধঃপতন—কাহিনী কি কাহারও জানিতে পারি আছে? আমরা হিন্দুসন্তান হইয়া, ঋষির বংশধর হইয়া, পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিবির নিকট বেদের ব্যাখ্যা শুনিতেছি। আমরা এখন গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর নিকট ধর্মব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি না। এখন ঘাঘরা-সুশোভিত বিবির মুখকমল হইতে বাগবিজ্ঞান শুনিতে আমরা সদাই অভিলাষী। আমাদের বেদের বিলাতী অনুবাদ না পড়িলে জ্ঞানলাভ হয় না—আমরা উহা বুঝিতে পারি না। গীতাপাঠে এখন অধিকার ও অনধিকারের ভেদবোধ কমিয়া গিয়াছে। এখন পাশ্চাত্য শিক্ষা

প্রভাবে বহু হিন্দুসম্মান হিন্দুর অধিকার ও অনধিকার সম্বন্ধে নিগূঢ় তত্ত্ব ভুলিয়া যাইতেছে । গীতাপাঠের অধিকারী না হইলে যে, গীতাপাঠকের অপকার হয়, একথা অধুনা বহু হিন্দু সম্মান স্বীকার করে না । অধিকারভেদ হিন্দুধর্মের একটা মূল কথা । অধিকারভেদ মানিয়াই হিন্দুর ধর্ম একই সঙ্গে এমন উদার ও বিচিত্র হইয়াছে । পৃথিবীর কোনও ধর্মে অধিকার ভেদের কথা নাই । হিন্দু যেদিন অধিকারভেদ ভুলিবে, সেদিন ইহার পতন হইবে । মর্ত্যের নানব ছাড়িয়া দাও—স্বর্গের দেবতা পরীক্ষা এই অধিকারভেদ মানিয়া থাকেন । ইন্দু ইন্দ্রজ পাওয়া ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলেন । তাহাতে চতুরানন বলিয়াছিলেন—এখনও তুমি উচ্চ বিজ্ঞালাভ করিবার অধিকারী হও নাই । অগ্রে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন কর, পরে উচ্চ প্রাপ্ত হইবে । ইন্দ্রদেব তাগাই করিলেন—পরে আবার অল্প বিজ্ঞা প্রার্থনা করাতে এই প্রকার ব্যবস্থা হইল—আবার কঠোর ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করিয়া তিনি অল্প বিজ্ঞালাভ করিলেন । এই প্রকারে দীর্ঘকাল কঠোর আত্মদান ও ব্রহ্মচর্যের পর ইন্দ্রদেব আয়-তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন ।

তাই বলিতেছিলাম, অধিকারী পদ লাভ করিয়াও আজ আমরা দীনহীন কান্দালের ছায়ার কাছে ধর্মবাখ্যা শুনিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি । আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান নাই—গুরু করণ নাই—তাই চারিখানি অমুবাদ পড়িয়া আমরা হিন্দুধর্মের ভেদ

মানিতে ইচ্ছা করি। হায়! ইহা অপেক্ষা আর অধিক ধৃষ্টতা কি হইতে পারে? মাক্সমুলার এখনি অনেকেরই গুরু স্থানীয়। সেই প্রতীচ্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, ঋতু, কপিল, গৌতম, পাতঞ্জলি, বেদব্যাস, জৈমিনি, নারদ, মরীচি, বশিষ্ঠ ও অত্রাণ্ড ঋষিগণ যে জাতির গুরু—সে জাতি জ্ঞানোন্নতির জন্ত কোন্ পাশ্চাত্য শিক্ষকের নিকট যাইবে? এই কথা কি কেহ মানিয়া চলিবেন? আমাদের শাস্ত্রে কি আছে, যদি তাহা জানিবার যথার্থ অভিলাষ থাকে—সদগুরু অব্বেষণ কর—দেখিবে তিনিই তোমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া দিবেন। গুরুর নিকট উপদেশ পাইলে অধিকার তব্ব তোমার আয়ত্ব হইবে। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিবে; কিন্তু এ অব্বেষণ করিবার প্রবৃত্তি কাহারও নাই। আমরা যদি বাস্তবিকই বাগ্রচিন্তে তাহাই অব্বেষণ করিতাম, তাহা হইলে আজ আমাদের এ ছরবস্থা হইত না। আমরা অন্নবুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞানহীন—তাই বেদমাতা গায়ত্রীর অবমাননা করিতেছি—হিন্দুর দেবদেবীকে—হিন্দুর আচার ব্যবহারকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছি। ধর্মের ভাণ করিয়া বিষম অনর্থ ঘটাইতেছি। অধুনা তীর্থস্থান, দেবমন্দির, মসজিদ, গির্জা প্রভৃতি সকল স্থানই নিকুঞ্জবনরূপে ব্যবহৃত হয়। কেহ একবার চিন্তা করে না যে, এই দেহ অনিত্য—এই বিরাট সংসার অসত্য—এক ফুৎকারে জীবন দীপ নিবিয়া যাইবে। আত্মকাল সে শিক্ষা নাই, সে দীক্ষা

নাই, প্রবৃত্তি-দমনের চেষ্টা নাই, সংযম-ভিলাষ নাই, মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান ধর্ম-প্রবৃত্তি নাই। নবাসম্প্রদায় একেবারে বিলাসী বিলাসী বাঙ্গালী ! কি ভীষণ পরিবর্তন ! এক শতাব্দীতে বাঙ্গালীর এই অবস্থা হইয়াছে। আর অল্প শতাব্দী পরে বাঙ্গালী জাতি বলিয়া কিছু থাকিবে কি ?

* * * *

বহুক্ষণ পরে ভবরামের গায়ত্রী জপ শেষ হইল। তাহার পর সকলে আবার ভগবদ্ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। সকলেরই চক্ষু নিমীলিত। দেহ নিশ্চল, অসাড়, ঠিক যেন সমাধিপ্ৰাপ্ত এবং বাহ্যজ্ঞান বিরহিত। পাঠক ! এ অবস্থা লিপিয়া বুঝাইবার নয়। চিত্ত-চাক্ষুশ ও পার্থিব চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া নির্জনে ভগবদ্ ধ্যানে রত হও, তুমিও এই অবস্থার বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারিবে। ভবরাম, করুণাময়, ঝামেলিয়া ও সাগরবালার বহুক্ষণ এই অবস্থায় অতীত হইয়া গেল। ভবরামের আয়ুজ শিশু ফকু সকলের দেখাদেখি এইরূপে চক্ষু ~~হুঁসিয়া~~ থাকিতে থাকিতে অবশ অঙ্গে ক্রমে নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে ঢুলিয়া পড়িল।

রজনী এক প্রহরের পর সকলের ধ্যান ভঙ্গ হইল। চন্দ্র ও কলাদি ঐশবেশ্যগুলি ভবরাম ভক্তিসহকারে ভগবানকে উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে করুণাময়, ঝামেলিয়া ও সাগরবালার করবোধে স্তব করিতে লাগিলেন। ভক্তি-অশ্রুতে তাঁহাদের

বন্ধুস্থল প্রাবিত হইতে লাগিল। নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ করিতে রজনী দেড় প্রহর অতীত হইয়া গেল। এইবার তাঁহারা ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতে লাগিলেন, পাঠাঙ্গি সমাপ্ত হইতে রজনীর দ্বিতীয় যান অতীত হইল।

সাগরবালা স্থানীর অনুমতি লইয়া আহারের আয়োজন করিতে গেলেন। কুশাসনের সম্মুখে একখানি করিয়া কদলী-পত্র। তাহা উপর দেবতার প্রসাদ দুই চারিখানি শশা, রস্তা, চারিটি মুগের ডাইল, কাঁচা গুড় ও মৃৎভাণ্ডে দুগ্ধ। ভবরাম ও করুণাময়ের আহারের পর সাগরবালা ও স্বামেরিয়া আহার করিল।

আহারাদির পর সকলে আবার একস্থানে উপবেশন করিলেন। করুণাময় এই সময়ে সাংসারিক ও কারবারাদির কথা অগ্রজকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভবরাম যথোপযুক্ত উত্তর দিয়া শেষে বলিলেন, “ভাই করুণাময়! সংসারে যাহাই কর না কেন

“প্রাতঃপ্রভৃতি সায়ান্তঃ সায়াদিপ্রাতরন্ততঃ।

যৎ করোমি জগত্যর্থং তদন্ত তব পূজনং ॥”

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত জগতের জন্ত বাহা কিছু করিতেছি, সমস্তই যেন তোমার পূজা বলিয়া গণ্য হয়, এই কথাটি ভাই কখনও বিস্মৃত হইও না। আশ্বিনের আশ্বিনের সেই রাখাল ছুতরের মা এক হাতে ধান ভানিত। এক হাতে টেকির গড়ের দাগগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দিত, শিশু

পুলটিকে বক্ষে চাপিয়া স্তন দান করিত, মুখে ছেলোটিকে কতই আদরের ছড়া বলিত, কিন্তু লক্ষ্য থাকিত, হাতের দিকে—পাছে টেকি পড়িয়া তাহার হাতটি চূর্ণ হইয়া যায়। সংসারে সবই করিও ভাই, কিন্তু লক্ষ্য রাখিও উপরের দিকে। কিছু করিব না বলিলেও চলিবে না। পূর্বের কর্মরাশি ক্রমে ক্রমে পুঞ্জীভূত হইয়া জোড় করিয়া আশ্বিনমাসে কশ্মে নিয়োজিত রাখিবে। এখন রাত্র গভীর হইয়াছে—তোমরা বিশ্রাম করিতে যাও।”

“না আমায় ঘুরাবি কত,

যেন চোক-ঢাকা বলদের মত।”

সদেক রামপ্রসাদের এই গানটী গায়িতে গায়িতে ভবরামও শয্যা-গ্রহণ করিতে গেলেন। করুণাময়, আমেরিয়া ও সাগরবালা ভবরামের পশ্চাতে পশ্চাতে আপন আপন কক্ষে গমন করিলেন।

প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া ভবরাম, করুণাময়, আমেরিয়া ও সাগর-বালা গঙ্গাস্নানে গমন করিতেন। ইহারা প্রত্যহই পদব্রজে পাঁচ-দণ্ড রজনী থাকিতে পুণাতোয়া জাহুবী সলিলে অবগাহন করিয়া গৃহ প্রত্যাগমন করেন। স্নানান্তে পূজার্চনায় রত হ'ন। ভবরাম আজকাল আর কারবারাদি দেখেন না। ধর্মগ্রন্থ ও পুঁজাদি লইয়াই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। কনিষ্ঠ করুণাময় বিশ্বস্ত কর্মচারীবর্গকে লইয়া কারবারাদি পরিচালনা করিতেছেন। ভক্ত যেরূপ শ্রীরামচন্দ্রের পাছুকা মন্তকে রাখিয়া রাজ্য পালন

করিয়াছিলেন, অন্তঃ করুণাময় ও তদ্রূপ—জ্যেষ্ঠের অনুমতি ব্যতীত এক পদ অগ্রসর হয় না। জ্যেষ্ঠের আদেশ করুণাময় বেদ-বাক্য, অপেক্ষাও অধিক ভক্তি ও আত্মের সহিত প্রতিপালিত করে। ইঁহারা ঘোর সংসারী বটে, কিন্তু কোন ইঁহাদের সংসারে লিপ্ত নাই! বাহ্যজ্ঞানে করুণাময়কে ঘোর সংসারী, পাকা ব্যবসায়ী বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু করুণাময়ের অন্তঃকরণ প্রকৃতই সন্ন্যাসীর অন্তঃকরণ। “সঞ্চয়” বলিয়া যে কথা আছে, ইঁহা করুণাময় জানে না। করুণাময় দাখা ব্যতীত সংসারে আর কাহাকেও জানে না! এ শিক্ষা করুণাময় জ্যেষ্ঠ ভবরাম ও বৌদ্ধিদি সাগরবালার নিকট পাইয়াছে। সাগরবালার চরিত্রের আভাষ পাঠক পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদেই কতকটা পাইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভবরাম ও বাল্যকাল হইতে “সঞ্চয়” বলিয়া যে অভিধানে কোন শব্দ আছে, তাহা জানেন না। ইঁহাদের কারবারগুলি ধর্মের ভিত্তির উপর স্থাপিত। অধর্মের লেশ যাত্রাও ইঁহাদের কারবারগুলিকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। কারবারে সহস্র সহস্র মুদ্রা লভ্য হইতেছে, কিন্তু সঞ্চয় কাছাকে বলে, ইঁহারা শিক্ষা করেন নাই। হাতে কিছু টাকা জমিয়াছে, জ্যেষ্ঠ ভবরাম বলিলেন, “করুণাময়! জন্মভূমিতে গিয়া স্বর্গীয়া জননীর নামে একটা কিছু করিগে চল।” করুণাময় বলিলেন, “যথাজ্ঞা”। গাড়ি গাড়ি জিনিষ পত্র বোঝাই হইয়া দেশে যাইতে লাগিল। মহা-সমারোহে দেব-দেবীর পূজা ও সহস্র সহস্র কাছালী-ভোজন হইতে

নাগিল। কাজালিদের রুক্ষ কেশ তৈল-নিষিক্ত হইয়া তৈল ধারায় মৃত্তিকাসিক্ত হইল! সঞ্চিত অর্থগুলি যতক্ষণ না বায় হইল, ততক্ষণ তাঁহাদের মনে শান্তি আসিল না। আজকালের শিক্ষিত সমাজ ইহাদিগকে হয় ত পাগল ভাবিবে, আমরাও বলি, ইহারা সত্য সত্যই পাগল। পাগল না হইলে কি প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়?

আজকাল ভবরামের নেশা হইয়াছে, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে হিন্দু চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে হইবে। বিদেশী শিক্ষায় দেশের ভাবী বংশধরদের ধর্ম ও সংযম শিক্ষা হইতেছে না। তাহারা লেখাপড়া শিগিরায় যেন অর্থোপার্জনের যত্ন বিশেষ হইতেছে। এখন পিতা নাতা বা অভিভাবকগণ পুত্রদিগকে স্কুলে প্রেরণ করেন, অতীতকালে নানুষ করিবার জন্ত নয়—নানা রোগের আকর, ধর্ম-বর্জিত ঘোঁষে অর্থোপার্জন করিয়া বিলাস ভোগ করিবে বলিয়াই যেন বালকেরা আজকাল শিক্ষা-মন্দির সমূহে প্রেরিত হয়। বালকগণকে ইংরাজি স্কুলে পাঠাইয়া জনক-জননী যেন বলিয়া দেন, “বাবা! তোমাকে অন্নায়ু হইতে হইবে, অম্বল, ডিসপেন্সিয়া, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে জর জর হইয়া অকালে শমন সদনে যাইতে হইবে, তোমাদের সম্ভান-সম্ভতি ভূমিষ্ট হইলেই যকৃতাদি ছুষ্ট হইয়া নানা রোগ দেখা দিবে। এসব এড়াইয়া যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে তোমাদের অপেক্ষাও উহারা অন্নায়ু হইবে। তা’ হউক তোমরা বিদ্যাশিক্ষা কর, অর্থোপার্জন কর, ক্রহাম হাঁকাও, উকিল, ব্যারিষ্টার, ডেপুটি হও—দেখিয়া

আমরা নয়ন সার্থক করি! আর পাশ্চাত্য জাতির মত তোমার স্ত্রী হউক, সেমিজ গাউন পরিষ্কার ঘুরিয়া বেড়াক—আমরা আর ক’দিন বাচিব, তবু দেখিয়া মরি।”

ভবরাম একদিন কনিষ্ঠ কর্ণাময়কে ডাকিয়া উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়া অবশেষে বলিলেন, “ভাই! দেশের দুর্দশা স্বচক্ষে ত দেখিতেছ। এখনও চেষ্টা করিলে ভগবানের ইচ্ছায় শ্রোত কিরিতে পারে। দেশে এখন উপযুক্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নাই। যাহারা আছেন, তাঁহারা গণনায় মুষ্টিমেয়। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই অর্থোপার্জনের জন্ত হা হা করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রকৃত ধার্মিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিরল। গ্রামালঙ্কার, তর্কালঙ্কার এখন সঙ্কলনদিগকে অর্থকরী বিজ্ঞাপিকা দিতেছেন। সুতরাং আর্থাভূমি শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতে বসিয়াছে। গ্রামালঙ্কারের পুত্র ডেপুটী হইবে, তর্কালঙ্কারের সন্তান বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবে, সুতরাং তাহাদের হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি মমতা কতটুকু, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? আকাশ ঘোর ননঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের এখন আর ঘণা লজ্জা নাই, আছে কেবল অর্থ-লালসা। যদি কেহ দেখেন বা না জানেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, সকল কার্গাই ইহারা করিতে পারেন। যাহারা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, শাস্ত্রে তাহাদের গুণ-ব্যাখ্যা আছে—

“শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ॥”—গীতা ।

এবং পণ্ডিতের লক্ষণ—

“ভূনিচৈব স্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সন্নদর্শিনঃ”—ইতি গীতা ।

যাহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তাঁহাদের এই গুণাবলী থাকিবে ; কিছ কৈ ? শম, দম, জ্ঞান, আস্তিকতা এসব কোথায় ? আস্তিক হইলে কি অর্থ-লালসায় পুত্র-পৌত্রকে বিদেশী ভাবে শিক্ষা দিবার প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে ? ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের এখন ব্রাহ্মণত্ব ও পাণ্ডিত্য উভয়েরই অভাব হইয়া পড়িয়াছে—

“যোগন্তপোদমোদানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা ।

বিজ্ঞা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্ ॥”

যোগ, তপ, দম, দান, ব্রত, শৌচ, দয়া, এ সব এখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের আছে কি ? যদি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের যোগবল থাকিত, তাহা হইলে আবার আমরা বশিষ্ঠের মত গুরু পাইতাম ! যোগের অভাবে এখন সকল বিষয়েই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে । যে যোগপ্রভাবে ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, সে যোগবল ব্রাহ্মণের দেহে আর দেখা যায় না । পূর্বের ব্রাহ্মণগণ সংসার-কীট ছিলেন না, তাহারা প্রাণায়াম ও যোগের পক্ষে বিচরণ করিতেন । এই জন্য তাহারা অর্থকে ধূলিমুষ্টিবৎ জ্ঞান করিতেন । এই জ্ঞান শক্তিবান দেশপালক তাহাদের চরণে ভরে নুটাইয়া পড়িত ।

তঁাহারা লোভশূন্য, সুস্থ ও দীর্ঘায়ু ছিলেন। সংসার কি করিয়া করিতে হয়, কেন সংসারে আসিয়াছি, পূর্বের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রাণায়ামের ফলাফল জ্ঞাত হইয়া, তঁাহারা লিখিয়া গিয়াছেন —

“প্রাণায়ামো মহাধর্মো বেদানামপ্য গোচরঃ ।

সর্বপুণ্যন্ত সারোহি পাপরাশিতুলানলঃ ॥

মহাপাতক কোটীনাং তৎকোটীনাঞ্চ দুহৃতম্ ।

পূর্বজন্মার্জিতং পাপং নানা দুষ্কর্মপাতকম্ ।

নশ্বতোব মহাদেব ধনুঃ মোহভ্যাসযোগতঃ ॥”

ইহার মর্মার্থ, প্রাণায়াম মহাধর্ম, বেদের অগোচর, পাপরাশি-বিনাশক, সকল পুণ্যের সার। প্রাণায়াম দ্বারা কোটি কোটি দুষ্কর্ম, কোটি কোটি মহাপাতক, পূর্ব জন্মের পাপ সকল, নানাবিধ দুষ্কর্ম-জনিত পাতক ধ্বংস হয়। যিনি প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ ও ধনু ।

“প্রাণায়ামাৎ খেচরকুং প্রাণায়ামাদ্রোগনাশনম্ ।

প্রাণায়ামাধোদয়েচ্ছক্তিং প্রাণায়ামান্মনোমনী ।

আনন্দো জায়তে চিত্তে প্রাণায়ামী সুধীতবেৎ ॥”

—ইতি যোগশাস্ত্র ।

প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে মন শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, প্রাণায়ামের দ্বারা নানা রোগ বিনাশ হয়,

পরমায়-শক্তি উদ্বোধিত হয় এবং দিবাজ্ঞান লাভ হইয়া হৃদয় অপার আনন্দে ভরিয়া উঠে ।

ভাই ! এখন যদিও কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, লোককে দেখাইবার জন্ত সকাল-সন্ধ্যায় চক্ষু মুদিয়া বসেন ; কিন্তু তাঁহাদের সম্পূর্ণ মন থাকে অর্থের দিকে । এহ জন্ত নিজেরাও শাস্তি পান না । শিষ্য বজনানকেও শাস্তির পথ দেখাইতে পারেন না ।

আজ তোমাকে পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বের একটি সত্য ঘটনা বলিতেছি । পূর্ববঙ্গে একজন সমৃদ্ধিশালী ধার্মিক জমিদার ছিলেন । তাঁহার বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী ছিল । জমিদার কিছুতেই শাস্তি পান না । তিনি নীরবে সততই চিন্তা করিতেন, দু'দিন পরে চলিয়া যাইতে হইবে ; কিন্তু সংসারে আসিয়া করিলাম কি ? জমিদার বড়ই গুরুভক্ত ছিলেন । তিনি গুরুকে নিজের অশাস্তির কথা জানাইলেন । গুরু বলিলেন, দান-পান কর, পূজা-অর্চনা কর, মনে শাস্তি পাইবে । গুরুদেব বেদ-পাঠ, পুরাণ, শাস্তি-স্বস্তায়নের ফর্দ করিয়া দিলেন । ছয় মাস ধরিয়া ক্রিয়া-কলাপ চলিল । গুরুদেব বড়লোক হইয়া গেলেন । তিনি কার্যান্তে গৃহে গিয়া বলিলেন, “ব্রাহ্মণি ! তোমার অলঙ্কার পরিবার সাধ ছিল, এইবার তোমায় গা ভরিয়া গহনা দিব ।” ব্রাহ্মণীর আত্মাদের সীমা নাই । এদিকে শিষ্য কিন্তু “যে তিমিরে, সেই তিমিরে” তিনি ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন,

“প্রভু! আমার শাস্তির পথ দেখাইয়া দাও।” ভগবানের বৃষ্টি দয়া হইল। যথার্থ ব্যাকুল হইয়া ছাকিলে, তিনি কি স্থির থাকিতে পারেন? একদিন প্রভাতে প্রাণের আলায় জমিদার উঠানে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসী আসিয়া দর্শন দিলেন। সন্ন্যাসী সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “বাবা! তোমার গুরুদেব নিজেই অন্ধ! তোমাকে পথ দেখাইবে কি করিয়া?” এই বলিয়া সন্ন্যাসী জমিদারকে শাস্তির পথ দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। জমিদার সহস্র চেষ্টাতেও আর সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন না। আধুনিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ স্বীকে গা ভরিয়া গহনা দিবার জ্ঞান ব্যাকুল, স্মৃতরাং শিশু যজমানকে শাস্তির পথ দেখাইবে কে?

তাই আমি মনে করিয়াছি—পূর্বের ছায় উপযুক্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেশে যাহাতে আবার হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমি একখানি নিয়মপত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি শ্রবণ কর। এই বলিয়া ভবরাম পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। গুনিতে গুনিতে আনন্দে করুণাময়ের মুখখানি রক্তিমাত হইয়া উঠিল।

১। দেশের নানাস্থানে আপাততঃ একশত আদর্শ চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিব।

২। একশতজন ধার্মিক ও সংসার-আসক্তি-হীন উপযুক্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত থাকিবেন। ইহারা যোগজ্ঞানমগ্ন হইবেন।

৩। ইহাদের স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের জন্য ভূমি ও উপযুক্ত বস্তির ব্যবস্থা থাকিবে ।

৪। ব্রাহ্মণসন্তানগণ যজ্ঞোপবীতের পরেই ব্রহ্মচারী বেশে আসিয়া এই চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইবে ।

৫। ছাত্রগণ ষড়্‌বিংশতি বর্ষের পূর্বে সংসারে প্রবেশ করিতে পাইবে না ।

৬। ছাত্রগণকে হিন্দুশাস্ত্র ও প্রাণায়ামাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে ।

৭। ছাত্রগণকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যে, তাহারা কখন বিনামা বা বিলাসদ্রব্য অঙ্গে ধারণ করিবে না। শীত, গ্রীষ্ম নিবারণার্থ হিন্দুর যাহা আবশ্যক, তাহাই চিরজীবন ব্যবহার করিবে ।

৮। ছাত্রগণ শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া ও প্রাণায়ামাদি যোগমার্গ অবগত হইয়া, চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলে এক্ষণ তাহারা পূর্বনির্দিষ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে ।

৯। ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে ষড়্‌বিংশতি বর্ষের পর হিন্দুধর্মে আত্মবান্ পবিত্র-কুলোদ্ভব জনক-জননীর মূলক্ষণা কুমারী কন্যাকে সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে ।

১০। ছাত্রগণকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যে, তাহারা এই চতুষ্পাঠীতে তাহাদের নিজ নিজ সন্তানগণকে অধ্যয়ন করাইবে এবং তাহাদিগকে যোগমার্গের পথ অবলম্বন করাইবে ।

১১। যাহাদের একমাত্র সন্তান, তাঁহারা যদি পুত্রকে চতুষ্পাঠিতে পড়াইতে দেন এবং এই পুত্রের অভাবে তাঁহাদের যদি ভরণপোষণের কষ্ট হয়, তাহা হইলে যতদিন না তাঁহাদের সন্তান উপযুক্ত হইয়া অষ্টাপকের পদ গ্রহণ করে, ততদিন তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত রুত্তির ব্যবস্থা করা হইবে।

ভবরাম কনিষ্ঠ করুণাময়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—
“ভাই! এই পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে। আরও অনেকগুলি নিয়ম ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। কয়েকজন যোগরত সন্ন্যাসীর চরণ-প্রান্তে নিবেদন জানাইয়া যাহাতে তাঁহারা এই কার্যের সহায় হ'ন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি ভারতের সুদিন সন্নিকটবর্তী হইয়া থাকে—তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা নিভৃত স্থান হইতে আসিয়া এই কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।”

কনিষ্ঠ করুণাময়ের মুখখানি চিন্তাক্রিষ্ট হইল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, “দাদা! ইহা বর্ত্তমানকালে বড়ই ব্যয়সাপেক্ষ।”

ভবরাম হাসিয়া বলিলেন, “ভগবানের ইচ্ছা হইলে কিসের অভাব হইবে ভাই? তাঁহার ইচ্ছা হইলে এখনই ভারতে লক্ষ লক্ষ চতুষ্পাঠীর সৃষ্টি হইতে পারে। দেশের কত রাজা, মহারাজা, কত ক্রোড়পতি বিলাসশ্রোতে কত অর্থ ভালাইয়া দিতেছে! ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়, তবে হয় ত কালে তাহাদেরও

স্ববুদ্ধির উদয় হইতে পারে! আমাদের সঙ্কল্প তাহার কাৰ্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবে।”

সাগরবালা ও ঝামেরিয়া একাগ্রচিত্তে এই সমস্ত শুনিতছিলেন। সাগরবালা সহস্র স্বামীর সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—“আমার দেহের সমস্ত অলঙ্কার ও যাহা কিছু সঞ্চিত আছে, সে সমস্তই আমি এই সংকার্য্যে দান করিব।”

ঝামেরিয়া বলিল, “বাবা! আপনি একদিন বলিয়াছিলেন, যিনি আমাকে সহোদরার স্নেহে প্রতিপালিত করিয়াছেন, তিনি আমার কিছু দান করিয়া গিয়াছেন। তাহা যদি আমার প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে আমি আজই সেগুলি আপনার এই মহৎ কার্য্যে অর্পণ করিলাম।”

সাগরবালা ঝামেরিয়ার কথা শুনিয়া স্বামীকে অভিমানভরে বলিলেন, “কৈ! আপনি ত ঝামেরির অবশিষ্ট কাগজগুলি আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন না? মহাত্মা রামপ্রসাদের জীবনের বাকী অংশটুকু যে কাগজখানিতে লেখা আছে, সেখানি আপনি গোপন রাখিয়াছেন কেন?”

ভবরাম হো হো করিয়া হাসিয়া কনিষ্ঠের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “কঙ্কণাময়! শুনিলে তোমার বৌদিদির অভিমানের কথা! হিন্দুর স্ত্রী অর্দ্ধজিণী, সহোদর এক পিতামাতার সন্তান—এক আত্মা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তোমাদের কাছে কি আমার

কিছু গোপনীয় আছে? জ্ঞানাদের কাছে কোন কথা গোপন রাখিলে আত্ম-প্রবঞ্চনা করা হয়। তবে কি জান, সেই কাগজ-পানিতে আমেরিয়াকে কিছু দানের কথা আছে। টাকা-কড়ি লইয়া হাঙ্গামা করা আমার আর ভাল লাগে না। বিশেষতঃ, মা আমেরি যে পথে যাইতেছে, তাহাতে তাহার টাকার কোনই প্রয়োজন নাই। যদি আমেরির গর্ভে আমার পৌত্র-পৌত্রীর আশা থাকিত, তাহা হইলে না হয় আবার একটা ঝগড়া বাড়াইতাম। মা আমেরি যাহা লাভ করিতেছে, তাহার নিকট পার্থিব ধনসম্পদ অতি তুচ্ছ! মহাত্মা রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের কথা নিজ হস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহা যখন তোমরা শুনিতে ইচ্ছুক, তখন আজই শুনাইতেছি।” এই বলিয়া ভবরাম করুণাময়কে আমেরিয়া-সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলি রৌহ-সিন্দুক হইতে বাহির করিতে আদেশ করিলেন। করুণাময় তৎক্ষণাৎ উহা বাহির করিয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

মহাত্মা রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় গৃহত্যাগ করিবার পরে অবশিষ্ট জীবনের কথা যে কাগজখানিতে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেইখানি কাগজের স্তূপ হইতে বাছিয়া লইয়া ভবরাম পাঠ করিতে লাগিলেন :—

“অন্থথা বৃদ্ধতন হইতে আমার সংজ্ঞাশূন্য দেহ উঠাইয়া লইয়া গিয়া মহাত্মা গঙ্গাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় সেবা-শুশ্রূষায় আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ যথার্থই সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। আত্মগোপন করিয়া, জানি না কি উদ্দেশ্যে তিনি সংসারে বাস করিতেন। তাঁহার সংসারে এক বৃদ্ধা ছিলেন। বৃদ্ধা অজ্ঞেয় শক্তিসম্পন্ন, আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। ইহাদের আশ্রয়ে আসিয়া মানুষ কি করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করে, ব্রাহ্মণের কর্তব্য কি ইত্যাদি বিষয় বুঝিতে পারিলাম। বৃদ্ধার আদেশে ব্রাহ্মণের নিকট আমি দীক্ষিত হইলাম। পূর্বজন্মের স্মৃতি-ফলে সেই মহাপুরুষকে আমি গুরুরূপে পাইয়াছিলাম। নচেৎ আমাকে সংসারাবদ্ধ কীটরূপে থাকিতে হইত। আমার গুরুদেবের একটি শিশুকন্যা ছিল। সে আমার জীবনের স্নেহের

সামগ্রী হইল। তাহাকে আমি আদর করিতাম, দিবারাত্র বৃকে করিয়া রাখিতাম, ক্ষুধার সময়ে দুধ খাওয়াইতাম। আমি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তখনও আমার সংসারের মোহ কাঁটে নাই, সংসারের মায়া আসিয়া এক একবার আমার মনটাকে চঞ্চল করিত। গুরুদেবের ছোট কণ্ঠাটিও আধআধ কথায়—চুমু দিয়া আমাকে ভুলাইয়া রাখিত। সে একটু বড় হইয়াই আমাকে “দাদা” বলিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহার সে স্বর এখনও আমার কণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ছেলেবেলায় তাহার মস্তকে বড় বড় কাঁকড়া চুল ছিল। আমি তাহাকে “ঝামেরি”, আবার কখন আদর করিয়া “ঝামেরিয়া” বলিয়া ডাকিতাম।

ঝামেরি যখন “পা” “পা” করিয়া চলিতে শিখিল, তখন হইতেই সে আমাদের কাছে ভগবানের গল্প শুনিতে ভালবাসিত। “ভগবান কোথা আছে দাদা? তিনি কি করেন? ঐ আকাশের উপর কি তাঁ’র ঘর? আমরা কি তাঁকে একদিনও দেখতে পাব না?” এই প্রকার নানা শিশুসুলভ কথা জিজ্ঞাসা করিত। কোন দিন বলিত “ভগবানের একটা গল্প বল না দাদা!” এই সব কথা শুনিয়া বৃদ্ধা বলিতেন, “তোরা ভবিষ্যতের সম্বন্ধে ভাবনা ছিল, এখন আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম।” আমি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, “এ কথার অর্থ কি? ভবিষ্যতের কি ভাবনা ছিল? কিসে আপনি নিশ্চিন্ত

হইলেন ?” আনার কথায় বৃদ্ধা কোন উত্তর না দিয়া সরিয়া যাইতেন । আমিও আর তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতাম না ।

একদিন রজনী দ্বিপ্রহরের সময় গুরুদেব আসিয়া বলিলেন—
“আমি চলিলাম রামপ্রসাদ ! গুরুদেব আহ্বান করিয়াছেন । তুমি অধৈর্য্য হইও না, সময় হইলে তুমিও যাইবে ।”

এই বলিয়া গুরুদেব বৃদ্ধাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন । একটি কথাও বলিবার আমি অবসর পাইলাম না । গুরুদেবের অদর্শনজনিত শোকে আমি অধীর হইয়া পড়িলাম । কিন্তু বৃদ্ধার ইহাতে সুখ হুঃখ কিছুই নাই ।

হৃৎথেষু দ্বিগ্ন ননা !

সুথেষু বিগত স্পৃহা,

বীত রাগ ভয় ক্রোধ

স্থির ধীর ননিকুচ্চতে !

ইত্যাদি লক্ষণ যেন বৃদ্ধার দেহে জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে । তাই বলিয়াছি বৃদ্ধা যে কে, সে পরিচয়ও পাইলাম না, এ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া চিনিতেও পারিলাম না । কেবল গুরুদেবের নির্দিষ্ট পথে এবং মাঝে মাঝে কামেরির সঙ্গে খেলাধলা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম ।

কিছুদিন এইরূপে অতীত হইবার পর গুরুদেবের জন্ম আমার অত্যন্ত বাকুলতা আসিল। যেন মনে হইতে লাগিল, পূর্বের মত তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন—যেন তিনি আমাকে “আর” “আর” বলিয়া সঙ্গে যাইবার জন্ম ডাকিতেছেন। আমি পাগলের মত হইয়া গেলাম। কামেরিয়ার প্রতিও তখন আর আমার স্নেহ মমতা রহিল না। আমার যখন মনের এইরূপ অবস্থা, তখন একদিন বৃদ্ধা বলিলেন, “আমি আর লোকালয়ে থাকিব না।” আমিও ইহার আকুল প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমরা এক দিবস দুইজনে কামেরিয়াকে লইয়া গভীর রজনীতে কুটীর ত্যাগ করিলাম।

কতদিন চলিয়া আসিলাম, মনে নাই। বহুদিন পরে একটা পর্বতের নিম্নে বিজন অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই অরণ্যের মাঝে গুরুদেবকে হঠাৎ এক স্থানে দেখিতে পাইলাম। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন আমাদেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি গুরুদেবের সঙ্গে চলিয়া গেলাম। বৃদ্ধা কামেরিয়াকে লইয়া সেই অরণ্যে কুটীর বাধিয়া বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।”

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই কামেরিয়ার চক্ষু দিয়া অবিশ্রান্ত জলধারা পড়িতে লাগিল। প্রস্তুতিত কন্ঠের উপর শিশিরবিন্দুর স্রাব সেই শোভা দেখিয়া, ভবান্নাম বলিলেন, “ছিঃ! মা! এখনও কি

তোমার মন স্থির হয় নাই ? পাছে তোমার চিন্তাচঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এই ভয়ে এতদিন এসব কথা শুনাই নাই। শোক হুঃখে বিচলিত হইবার মত মনের অবস্থা ত এখন তোমার নাই ! তাহা হইলে তোমার সাধনা যে বৃথা হইতেছে মা !”

ক্যামেরিয়া বলিল, “না ! বাবা ! মুহূর্ত্তের জন্য আমার হৃদয় বিচলিত হইরাছিল মাত্র। আর কখন এরূপ হইবে না। আমি এখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। আপনি পড়িয়া যান।”

যে পত্রখানিতে ক্যামেরিয়ার দানের কথা ছিল, “ভবরাম সেই পত্রখানির উপন্যাস ভাগ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুদেবের কুটির ত্যাগ করিবার পূর্বেই রামপ্রসাদ জ্যেষ্ঠ হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে এই পত্রখানি লিখিয়া বৃদ্ধার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

পরমারাধা পরম পূজনীয়—

শ্রীল শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—

অগ্রজ মহাশয় শ্রীচরণাশুভেবু—

শত সহস্র প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

দাদা ! কনিষ্ঠের অপরাধ মার্জনা করিবেন। আমাদের পিতামাতা নাই ; জনকজননীর সেবা করা আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই ! আপনি আমার পিতৃতুল্য পূজনীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র।

আপনার সেবাও আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। জানি না, আমি এই পাপ হইতে উদ্ধার পাইব কি না ? গৃহত্যাগকালে আপনাকে নিজের অজ্ঞাতে ছই একটি কঠোর কথা যদি বলিয়া থাকি, তবে তাহার জ্ঞাত চিরদিন অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিব ; কিন্তু আমার কথায় আপনার যদি মৰ্ম্মযাতনা হইয়া থাকে, সে মৰ্ম্মযাতনা আমি সে দূর করিতে পারিলাম না—এ দুঃখ আমার কেবল ইহজীবনে নয়, জন্মজন্মান্তরেও থাকিবে। যদি আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমার কতকটা দুঃখ দূর হইত ; কিন্তু তাহাও আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। দাদা ! আমাকে বিশ্বাস করুন—আপনাকে মৰ্ম্মপীড়া দিব বলিয়া আমি কখনও কোন কথা বলি নাই ! ইহা যদি আপনি বিশ্বাস করেন, তাহা হইলেও আমি ভবিষ্যৎ জীৱনে সুখ ও তৃপ্তি পাইব, নচেৎ আমি যে পথে যাইতেছি, তাহাও বুঝি বুঝা হইবে। গুরুজন—বিশেষতঃ পিতৃতুল্য অগ্রজের যদি মৰ্ম্মবেদনার কারণ হইয়া থাকি, তাহা হইলে স্বর্গে গেলেও আমাকে ভীষণ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। দাদা ! আমি করযোড়ে আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আপনাকে যখন আমার ভক্তির নিদর্শন দেখাইবার সুযোগ ঘটিল না, তখন ভক্তি-শ্রদ্ধার কথা আর তুলিব না ! কেবল বলিতেছি, অপরাধী, অকৃতজ্ঞ, অজ্ঞান, ভক্তিবীৰ্য্য অধম অনুজকে আপনি ক্ষমা করুন।”

“দাদা ! আমি এখন মানবের শ্রেষ্ঠ কর্তব্যের পথে গমন করিতেছি । সাধনের পথেও গুরুজনের অনুমতি ব্যতীত গমন করিতে নাই । আপনি অনুমতি দিন ও সর্বাঙ্গতঃ করণে আশীর্বাদ করুন, যেন আমি অতীষ্ট লাভ করিতে পারি । আর একটি অনুরোধ, আমার গুরুকৃত্য কামেরিকে আমি সহোদরা অপেক্ষাও স্নেহ করি । দাদা ! আমাদের ভগিনী নাই ! কামেরিয়াই আমাদের ভগিনী ! ইহার জন্ত আমি আপনার কৃপাকণা ভিক্ষা করিতেছি ! আমার ছায় অধম ভ্রাতাকেও ত আপনাকে প্রতিপালন করিতে হইত । আমাকে বাহা দিতেন—আমার ভরণপোষণের জন্ত আপনার বাহা ব্যয় হইত, আমাদের ভগিনী কামেরিয়ার জন্ত আপনার শ্রীচরণে তাহাই প্রার্থনা করিতেছি । আমি এখন নিরুদ্বেগে গুরুদেবের সহিত অমৃতের সন্ধানে চলিলাম । যদি বাচিয়া থাকি, যথাসময়ে আবার আপনার চরণ দর্শন করিব ।”

একান্ত আত্মাদীন—

শ্রীরামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ।

পত্রপাঠ শেষ হইলে কঁকণাময় বলিলেন, “দাদা ! মহাত্মা রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ত প্রকারান্তরে আমার কামেরি মাকে ইহার প্রাপ্য অংশ দিবার জন্ত অগ্রজকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন । “আমাকে বাহা দিতেন” এ কথাই অর্থহীন । দাদা ! রামপ্রসাদ জ্যেষ্ঠকে ইহার বেশী আর কি বলিতে পারেন ?”

ভবরাম বলিলেন, “ভাই করুণাময়! হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যদি আজকালকার ভাই হ’ন, তাহা হইলে রাজদ্বারে আইনের শরণাপন্ন হইতে হইবে। বিষয়-লোভে কেন সেটা করিবে ভাই! ইহাতে অধর্ম হইবে।”

করুণাময় একটু উত্তেজিতস্বরে বলিল, “রামপ্রসাদ অর্ধেক বিষয়ের প্রকৃত অধিকারী। তিনি সেই অর্ধেক সম্পত্তি নিজে না লইয়া আমেরিয়াকে দান করিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ যদি একপ ভ্রাতৃভক্ত কনিষ্ঠকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে প্রয়াসী হ’ন, তবে তাহাতে আইনের আশ্রয় লওয়া কি পাপ? বরং একপ অধর্মের প্রশ্রয় দেওয়াই পাপ!”

ভবরাম হাসিয়া বলিলেন, “ভাই! করুণাময়! তুমি ভুল বুঝিতেছ। শাস্ত্রমতে গুরুজনের বিরুদ্ধাচরণ করাই মহাপাতক। হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম বোধ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা কর। দশরথের আজ্ঞায় রামচন্দ্র বনগমন করিলেন কেন? লক্ষণই বা কেন তাঁহার সঙ্গী হইলেন। “অস্ত্রায় আদেশ” বলিয়া ত রামচন্দ্র সিতার আদেশ অমান্য করিতে পারিতেন। এখন ভাবিয়া দেখ, পিতৃসদৃশ অগ্রজের সহিত পার্থিব বিষয়ের জন্য বিরুদ্ধাচারী হওয়া কি পাপ নহে? অগ্রজের জ্ঞায় গুরুজনকে সর্বতোভাবে চিরজীবন সন্তুষ্ট রাখাই ধর্ম! তিনি যদি কনিষ্ঠের প্রাপ্য লইয়া সন্তুষ্ট হ’ন, তাহা হইলে কনিষ্ঠের জ্ঞাতে

আনন্দ উপভোগ করা কর্তব্য। রামচন্দ্র বনবাস যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও “পিতাকে সন্তুষ্ট করিলাম” বলিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পার্থিব-বিষয়ের মোহ ত্যাগ করিয়া জলন্ত ত্যাগ-স্বীকারের দৃষ্টান্ত জগতকে দেখাইবেন—ইহাতেই তাঁহার তপস্যার কল লাভ হইবে। সন্ন্যাসীরা বনে বাইয়া নাচা করেন, কনিষ্ঠ গৃহে বসিয়াই তাহা করিবেন। বাহারা দ্বী-পুত্রের প্ররোচনায় হৃদয়ের সর্বস্ব স্নেহময় সোদরকে বঞ্চনা করে, সেই তাহারা ইহজন্মেই তাহাদের দুষ্কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। বঞ্চিত হইয়া কনিষ্ঠের কোন ক্ষতি হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ইহাতে কনিষ্ঠ আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তাহার সন্ন্যাসীত্ব মত জ্যেষ্ঠের সন্তোষের জন্য একটা ত্যাগ করিতে পারিয়াছি বলিয়া বিমল আনন্দ পায়, কিন্তু জ্যেষ্ঠ তুমের আশুনে চিরজীবন পুড়িয়া মরে! সমগ্র জীবনে সে আর শান্তির মুখ দেখিতে পায় না। সংসার কয়দিনের জন্য ভাই! যাহাকে একদিন না একদিন ত্যাগ করিতেই হইবে, তাহাকে না হয় মানুষ আজই ত্যাগ করিল। ইহাতে আর কষ্ট কি? মানুষ যদি এইটা ভাবিত, তাহা হইলে কি সংসারে হিংসা, ঘেঁষ, বিবাদ থাকিত! তাহা হইলে কি মানুষ অশান্তির দাহনে “আমার” “আমার” করিয়া চিরদিন জলিয়া পুড়িয়া মরিত।

“এই পার্থিব বিষয় লইয়া কিছুদিন পূর্বে এক পরিবারে

ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল। আমি তোনাকে এই ঘটনাটি যথাযথ বলিজেছি। কৃষ্ণদন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাণদন বন্দ্যোপাধ্যায় দুই সহোদর। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদন বিদেশে অর্থোপার্জন করেন এবং কনিষ্ঠ প্রাণদন চানবাগ ও বিষয় কার্যা দেখেন। ক্রমশঃ জ্যেষ্ঠের অবস্থা ভাল হইল, গতজন্মের স্মৃতিতরঙ্গ বহু অর্থ উপার্জন করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের উপার্জিত অর্থ কনিষ্ঠ দেশে জমি, পুকুরিণী, বাগান ইত্যাদি করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের দুইটি সন্তান হইল। ক্রমশঃ সন্তান দুইটি বড় হইল। জ্যেষ্ঠ ভাবিলেন, আমি উপার্জন করিয়া এত বিষয়-সম্পত্তি করিলাম, আমার ছেলেরা ত নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে পাইবে না। এখন হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া কর্তব্য। জ্যেষ্ঠের হৃদয়ে হঠাৎ পাপ-পিশাচ আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করিল—জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার আয়োজন করিলেন। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের কু-অভিসন্ধি বুঝিয়া অনেক কাকুতি-মিনতি করিল; কিন্তু কিছুতেই জ্যেষ্ঠের মন টলিল না। সংসারে নিত্য যাহা ঘটিতেছে, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল—অর্থলোভে প্রবলের দিকে গ্রামের সকলেই যোগদান করিল। রাজদ্বারে আইনের কুটতর্কে অর্থবলে জ্যেষ্ঠ জয়লাভ করিলেন। কনিষ্ঠ কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহত্যাগ করিয়া অন্ত্রাঘাতিয়া বাস করিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হইল। তাঁহার সন্তান দুইটিও পিতার পথানুসরণ

করিল। জ্যেষ্ঠের সেই বিষয়-সম্পত্তি এখন অপরে ভোগ করিতেছে। তাঁহার স্ত্রী এখন স্বামীর নবনির্মিত অট্টালিকায় বসিয়া চক্কর জলে স্বামীর কৃতকার্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। এদিকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবানের আশীর্ব্বাদে স্ত্রী-পুত্র লইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসারধর্ম্ম পালন করিতেছেন। ইহা ত আমাদের একজন আত্মীয়ের সংসারের ঘটনা ! চাক্ষুষও দেখিতে পাইতেছ ভাই !

“ভাই ! ক্ষতি হইল কার ? জ্যেষ্ঠের এই কার্যো অসন্তুষ্ট হইয়া পিতৃপুরুষগণ অভিসম্পাত করিলেন যে, তোমার বংশের জলগধুহ আমরা গ্রহণ করিব না। সহোদরকে বঞ্চিত করিয়া তুমি যে সম্পত্তি রাখিয়া যাইতেছ, সেই সম্পত্তি ভোগ করিয়া যাহারা পুষ্ট হইবে, তাহাদের হস্তের জল ও পিণ্ড পুণ্যাত্মা পিতৃপুরুষগণ গ্রহণ করিবেন কেন ? ধর্ম্ম যে তাকা হইলে মিথ্যা হইয়া যাইবে। এখন বুঝিলে ভাই ! ত্যাগ-স্বীকারে পিতৃপুরুষগণ ও ভগবান কিরূপ সন্তুষ্ট হ’ন, আর প্রবঞ্চনার তাঁহারা কিরূপ রুষ্ট হ’ন ?

“রামপ্রসাদ তাঁহার জ্যেষ্ঠের নিকট ঝামেরিয়ার জন্ত কিছু ভিক্ষা চাহিয়াছেন। তিনি অংশীদার হিসাবে জোর করিয়া কিছু চাহেন নাই। আমরা এই পত্রখানিকে দলিলরূপে গণ্য করিয়া যদি রাজস্বারে বিচারপ্রার্থী হই, তাহা হইলে মহাত্মা রামপ্রসাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত কার্য্য করা হইবে। সুতরাং তাহাতে

আমাদের অধর্ম হইবে। তুমি বলিলে—“আমাকে বাহা দিতেন” এই কথায় “তঁাহার প্রাপ্য অর্থক অংশ” দিবার কথা বুঝাইতেছে। রামপ্রসাদের মনের ভাব তাহা নহে। তিনি জ্যেষ্ঠের নিকট আমেরিয়ার জন্ত করুণা ভিক্ষা করিয়াছেন মাত্র।”

করুণাময় রামপ্রসাদের পত্রখানি আরও একবার পড়িয়া জ্যেষ্ঠকে বলিলেন, “হাঁ দাদা ! আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। আপনি যেমন রামপ্রসাদের মনের ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই ঠিক ! সংকীর্ণ মনে আমি রামপ্রসাদকে অপরাধী ভাবিয়াছিলাম।”

সন্ধ্যা সমাগত—কথাবার্তা বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই ভগবৎ আরাধনার জন্ত ত্রিতলের নির্দিষ্ট গৃহে গমন করিলেন। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া, করুণাময় জ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“দাদা ! হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একবার সন্ধান লইলে হয় না ! তিনি একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ; অল্প চেষ্টাতেই বোধ হয় তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা যাইতে পারে।”

ভবরাম অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “সংবাদ লইতে কোন দোষ নাই।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

চৌরঙ্গীর বড় রাস্তার উপর পাশাপাশি দুইখানি ত্রিতল অট্টালিকা। ঘর দুইখানি সাহেবী ধরণে সুসজ্জিত। ড্রসিং-রুমে সুবৃহৎ তৈলচিত্র, বৈজ্ঞানিক আলোক ও পাখা, নানা-বিধ টেবিল, চেয়ার, কোচ প্রভৃতি সাহেবী উপকরণের কিছুই অভাব নাই। বাটীর সম্মুখে আবার একটা সুস্বাদু উদ্যান। উদ্যানে দেশী ও বিলাতি নানাবিধ ফল ও ফুলের গাছ। মধ্যে একটা মর্শ্বর-নির্মিত কৃত্রিম প্রস্তবণ। ইহা কিছুদিন পূর্বের কথা—বর্তমান সময়ে ইহার কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিনা সে সংবাদ আমরা রাখি নাই। ফটকের সম্মুখে একজন ভীমকার শিখ দ্বারবান বন্দুক ঘাড়ে করিয়া পাহারা দিতেছে। যে ত্রিতল বাটীখানিতে বাবু ও তাঁহার পরিজনবর্গ বাস করেন, সেখানি ইন্দ্র-ভুবনের জায় সুসজ্জিত। পথিক সে বাটীখানির দিকে একবার না চাহিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। বাটীর সম্মুখে প্রাকণ মূল্যবান খেত মর্শ্বরপ্রস্তুত-মণ্ডিত। প্রাকণের চতুর্দিকে মর্শ্বর-নির্মিত অঙ্গরীরা কেহ হাত বাঁকাইয়া, কেহ কটীদেশে স্তম্ভার্ণ করিয়া, কেহ বা ফুলের তোড়া হস্তে লইয়া নানা

মৃত্তিতে ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়াইয়া আছে । অপর অট্টালিকায় বাবুর কাছারি-বাড়ী । সেখানে কার্য্যাধক্ষ, খাজাঞ্জি, নায়েব, কাকুন, গোমস্তা, বাজার-সরকার প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বক্ষণ অবস্থিতি করিতেছেন । বাবুর মফঃস্বলের জমিদারীর নায়েব-গোমস্তাগণ হিলাব-নিকাশ দিবার জন্য এইখানে আসিয়া বাস করেন । জমিদারী ভাদ্রশ বড় না হইলেও, ইহার মুনাফা বাৎসরিক প্রায় চারি লক্ষ টাকা হইবে ।

দিবা ত্রিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে । বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্র ধাঁ ধাঁ করিতেছে । বাবু নিজ খাসকামরায় মূল্যবান মথুমল মন্ডিত একখানি আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত । তাঁহার গাত্রে বহুমূল্য হীরায় বোতামযুক্ত শিকের পাঞ্জাবী, হস্তে তিনটি হীরকানুরী, চক্ষে স্বর্ণযুক্ত চসমা । মস্তকের কেশগুলি ছোটবড় করিয়া কাটা । মধ্যস্থলে একটি সূক্ষ্ম রেখা চুলগুলিকে দশ আনা ছয় আনা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে । বাবুর মস্তক ও গাত্র হইতে নানাবিধ বিলাতি এসেলের গন্ধ, বৈজাতিক বাতাসে চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয় ঘরখানিকে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে । পরিধানে একখানি কয়েসভারার কাল্পাশাড় যুতি । সেখানি অতি সবদে কৌচান বাবুটি যুকা গুড়ব । কয়েস অঙ্কমান অষ্টবিংশতি বর্ষের অধিক হইবে না । তিনি বি, এ পর্ব্বান্ত পড়িয়াছিলেন । কয়েসজিহ্ম গৃহে কয়েসবারে দুইটি জুস্ত মেহগিনির আলমারিতে নামদ্রব্য ইংরাজ

নভেল শোভা পাইতেছে। বাবুর দক্ষিণ পার্শ্বে একটি সুন্দর টেবিল। তত্পরি একটি কাচের মাসে বরফজল রক্ষিত, অত্মদিকে লেমনেড, জিঞ্জার ইত্যাদির বোতল।

বাবুটিকে দেখিতে গোরবর্ণ! মুখখানি জ্যোতিঃহীন। চক্ষুঃ বসিয়া গিয়াছে। দেহ অবসাদগ্রস্ত, মুহূর্হ হাই উঠিতেছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন রাত্রে বাবুর স্নিদ্ধা হয় নাই।

বাবু একখানি ইংরাজী দৈনিক পত্র টেবিল হইতে উঠাইয়া দুই চারি লাইন পড়িলেন। সেখানি রাখিয়া আবার একখানি লইয়া দুই লাইন পড়িলেন, আবার রাখিয়া দিলেন। আরাম-শয়ন হইতে উঠিয়া বৈদ্যাতিক পাখাটা জোর করিয়া চালাইয়া দিলেন। বো বো করিয়া পাখা অনবরত ঘুরিতে লাগিল। একটু বরফজল পান করিয়া একখানি ইংরাজী ম্যাগাজিন লইয়া আবার পড়িতে বসিলেন। দুই মিনিট পরে তাহাও রাখিয়া দিলেন। আলমারি হইতে একখানি ইংরাজী নভেল লইয়া পড়িতে বসিলেন, তাহাও ভাল লাগিল না। উঠিয়া গিয়া গৃহ মধ্যস্থিত টেলিফোনে কাহার সহিত কি কথা কহিলেন।

অল্পকণ পরেই তিনটি নব্য যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার বাবুর মুখখানি প্রফুল্লতাব ধারণ করিল। ভিনজনের মধ্যে একজন বিজাতীয় পোষাকে তাঁহার বরবপু শোভিত করিয়াছেন। অপর দুইজনের বাদ্যালীর মত পোষাক। চক্রে চসমা,

হাতে ছড়ি, করফুরে শিকের শাজাবী, শিকের রুমাল, মাথায় টেরি।
ইহারা বাবুর মোসাহেব, বন্ধু, ইয়ার বা বাহা হয়, এই রকমের
কিছু একটা হইবেন।

একজন বলিলেন—“বা! তুমি ত বেশ হে! ছ’টো বাজে,
এখনও বসিয়া আছ? আজাইটার সময় এন্‌গেজমেন্টের কথাটা
বুঝি মনে নাই?”

একজন বলিলেন, “মাঝে বাঙ্গালী অধঃপাতে গিয়াছে!
বাঁরা কথার সঙ্গে সময়ের খিল রাখতে পারে না, তা’রা আবার
দেখাঙ্গার করবে!”

তৃতীয় বাবুটি একটু গভীর হইয়া বলিলেন, “নাও ভাই! আর
বক্তৃতায় প্রয়োজন নাই। শূরেন বাঁড়ুজোর চিরজীবনটা বক্তৃতা
করেই কাটিলো। কাজ কিছুই হ’ল না। তোমাদেরও সেই
রোমে থাকেই দেখছি! এখন উঠে পড়। সেখানে সব ঠাণ্ডা হয়ে
সেল।”

বাবুটি এতক্ষণ মুহু মুহু হাস্য করিয়া বন্ধুবর্গের বক্তৃতা শ্রবণ
করিতেছিলেন। সকলে নিস্তব্ধ হইলে, তিনি লাক দিয়া উঠিয়া,
বাম হস্তের তালুর উপর দক্ষিণ হস্তের তালু সজোরে ঠুকিয়া বলি-
লেন, “ব্রেভো! ব্রেভো! তোমরা তিনজনে তিনটি নেপোলিয়ান
বোনাগাট হইয়া উঠিয়াছ! কেবল কাজ চাও,—কথা চাও না!
বেশ বাবা! শুনে সুখী হ’লাম।” বাবুর এই কথায় তিন-

জনই বিকট হাস্য করিয়া উঠিল, সেই হাস্যধ্বনিতে অমেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল ।

বাবু ডাকিলেন, “মেহের সিং !” একটা লম্বা শিখ দ্বারবান আসিয়া সেলাম করিল ।

“সাদা জুড়ি বোলাও ।”

দ্বারবান “যো হকুম খোদাবন্দ” বলিয়া চলিয়া গেল ।

আবার হাস্য-কৌতুক চলিতে লাগিল । সাহেব-বেশধারী বাবুটি বলিল, “মিহদীর খাতির-বস্ত্র বেশ ভাই ।” একজন বাবা দিয়া বলিল, “মেম ছুঁড়িটার আরও বেশি ।”

এমন সময় বৃদ্ধ রামধন দত্ত কাকুঁন আসিয়া বাবুকে ডুমিই হইয়া প্রণাম করিল । কাকুঁনের গলায় তুলসীর মালা, হস্তে মধ্যস্থলে পক্ষ কেশের মধ্যে কয়েকগাছি লম্বা চুল, পরিধানে মোট খান ধুতি, কপালে চন্দনের ফোঁটা, হস্তে একতারা কাগজ কাকুঁন দক্ষিণ ধারের দেওয়াল ঠেসিয়া জড়মড় হইয়া দণ্ডায়মান হইল ।

একজন বাবুর কাণে কাণে বলিল, “এইবার সব মাটি হ’ল বাবা ! বুড়ো এমন সময় কোথা থেকে এসে জুটিলো হে ?”

বাবু সে কথা শুনিয়া একটু মুচকি হাসিলেন । পরে বিরক্তি-পূর্ণ স্বরে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

“কি গো! দত্তজা ! কিছু কাজ আছে না কি ?”

দত্তজা আবার ঘোড়হাস্তে নমস্কার করিয়া, একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন—

“হাঁ হজুর! কয়টা জরুরী কাজ আছে। আপনার আদেশ ভিন্ন হুকুমনামা পাঠাইতে পারিতেছি না। আজ দু’দিন বাহিরে ছিলেন, হজুরের সাক্ষাৎ পাই নাই।”

“এখন কাজটা কি তাই বল! দিবারাত্রই কি সাক্ষাতের জগ্ন আমাকে বসে থাকতে হবে?”

“আজ্ঞে না হজুর! সে কথা হজুর কে—

হঠাৎ গৃহমধ্যে কে উপস্থিত হইয়া বলিল, “এই কি হরপ্রসাদ ঘোষের গৃহ?” এই প্রশ্নে সহসা গৃহধানি নিস্তব্ধ হইল।

স্বপ্নের স্বপ্নের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল—

“দাদ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহ?”

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের নগ্নপদ, নগ্নদেহ, শুভ্র বস্ত্রোপবাস। ব্রাহ্মণের উপর স্থাপিত। গৈরিক বসন, স্বক্কেদেশে একধানি গৈরিক ডঙরীয়! দেহ নাতি-দীর্ঘ—নাতি-স্থূল! প্রশান্ত মুখধানি অপূর্ব জ্যোতি-মণ্ডিত।

ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সাহেব-বেশধারী বয়স্কটি বাবুর কাণের কাছে মুখ ঝুঁকিয়া বলিল, “আজ কি কু-বাত্রা তাই! তোমার বাড়ি-ধানি চিড়িয়াখানা বাবা! রকম-বেরকমের আনন্দ-মাতারাত করে!”

বাবু ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি চাও তুমি ?”

ব্রাহ্মণ মুহূ হাসিয়া বলিলেন—“কিছুই না ! হরপ্রসাদ চট্টো-
পাধ্যায়ের কেবল সংবাদ জানিতে আসিয়াছি ।”

বাবু । তিনি ত মারা গেছেন ।

ব্রাহ্মণ । মারা গেছেন ? কত দিন ?

বাবু । অনেক দিন মারা গেছেন ।

ব্রাহ্মণ । আপনার নাম ?

এই স্পন্দাস্থচক প্রপ্নে বন্ধুগণ হো হো করিয়া উপেক্ষার
হাসি হাসিলেন । অসভ্য ব্রাহ্মণের স্পন্দা দেখ ! এক পা ধূলা,
কল্প কেশ । ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিতেছে—“আপনার নাম ?”

মোসাহেবদের হাশ্বে বাবু বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তেজিত হইয়া
বলিলেন—“কি চাও ঠাকুর তুমি ?”

দত্তজা বলিলেন—“চজুরের নিকট আপনার কি থনা
আছে ঠাকুর ?”

ব্রাহ্মণ । আমার প্রার্থনার কপা ত পূরষই বলিয়াছি—
হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের—

বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, “সে কথার উত্তর ত দেওয়া হইয়াছে ।
আর কিছু জিজ্ঞাস্ত আছে ?”

বাবুর একজন বন্ধু চসমাটি কপালের উপর তুলিয়া বলিল—
“লোকটা পঙ্গল বুঝতে পারছে না ।”

ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন—“পাগল কি না জানি না ! তবে তোমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার দেখিয়া মনটা পাগলেরই মত হইয়াছে।”

ক্রোধকম্পিত স্বরে বাবু ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি আচার-ব্যবহার দেখলে ঠাকুর ?”

ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “আচার-ব্যবহার দেখিবার আর বাকী কি আছে বাবা ? তোমরা কোথায় বাইতেছ ? হিন্দুর সন্তান, ব্রাহ্মণের সন্তান তোমরা ! তোমাদের পরিণাম দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি। অর্থ থাকিলেই কি দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইতে হয় ? আচার, সংযম, বিনয় সকলই কি ইংরাজী লেখাপড়া শিখিলে ত্যাগ করিতে হয় ? তোমরা ব্রাহ্মণকে সম্মান করিতে জান না,—বয়োজ্যেষ্ঠকে মাছু করিতে শিক্ষা কর নাই,—উচ্ছৃঙ্খলতার দমন নাই। ছি ! ছি ! দিক্ তোমাদের শিক্ষায় ! তোমাদের সতীলক্ষ্মী জননী কি এই জন্তই তোমাদিগকে কষ্ট করিয়া দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন ? তোমাদের পিতৃ-পিতৃমহাগণ ও অভিভাবকবর্গকে দিক্ বে, তাঁহারা তোমাদিগকে হিন্দুর সভ্যতা ও উন্নতা শিক্ষা না দিয়া, ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির পূণ্য হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন।”

ব্রাহ্মণের ভীত ভিন্নকারে বাবুর সম্মান ও অভিভাব্যতা বুঝি আঘাত লাগিল। চারি লক্ষ টাকার আয়ের অধিকারী যিনি

মালিক, যাহার শত শত শিখ দ্বারবান, পাইক—বন্দুক ও তরবারি হস্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যাহার সহস্র সহস্র লাঠিয়াল মকঃশ্বরের জমিদারিতে বাবুর আদেশের অপেক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া আছে— তাহার রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বসিয়া—তাঁহারই সম্মুখে এক নগণ্য ব্রাহ্মণ এই প্রকার কটুক্তি করিতে সাহসী হইল ! বাবু একটি মুখের কথা বাহির করিলে এখনই ব্রাহ্মণের মস্তক তরবারির আঘাতে দেহচ্যুত হইতে পারে ! ব্রাহ্মণের সাহস ত কম নহে !

ক্রোধে অধীর হইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে বাবু ডাকিলেন—“কোন ছায় ?” ছুইজন ভীমকায় শিখ আসিয়া সম্মুখে বলিল, “হজুর ।”

“এই বাওরাকো কাছে ঘুস্‌নে দিয়া গুয়ার কি বাচ্ছা—আমি বাহার কর দেও ।”

সিংহের জ্বায় গর্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—“সাবধান বুবক ! ধনমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের অশ্রমান করিও না ।”

বিরক্তি ও ক্রোধের ছায়া মাত্র সে স্বরে ছিল না ! এই কথা বলিয়াই চকিতের জ্বায় ব্রাহ্মণ জমিদারের কটক পার হইয়া চলিয়া গেলেন । শিখ ছুইজন শীকার মিলিয়াছে তাহারা স্তম্ভিত ব্যাক্তের জ্বায় ব্রাহ্মণের পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়াছিল । শীকার হাতছাড়া হইল দেখিয়া—“ভাগ চেট্টা শালা” বলিয়া ব্রাহ্মণকে গালাগালি দিতে লাগিল । কয়েক মিনিট পরেই বাবু, মোসাহেব ও বন্ধুবর্গ

পরিবেষ্টিত হইয়া গাড়িতে উঠিলেন । শ্বেত জুড়িঘর কোনদিকে
 ভ্রক্ষেপ না করিয়া উর্দ্ধ্বাসে ছুটিতে লাগিল । রামধন দত্ত কার্কুনের
 হাতের কাগজ হাতেই থাকিয়া গেল । বেচারী অবাক হইয়া
 দাঁড়াইয়া রহিল । পরে ধীরে ধীরে বলিল, “দেব ! কি পাপে
 এই সংসারকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছ ! এই বংশের
 অগ্নে আমার শরীর পুষ্ট হইয়াছে, বৃদ্ধ বয়সে কেমন করিয়া
 এই বিপদ স্বচক্ষে দেখিব ! যাই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া
 যাই । আমার ত সময় কুরাইয়া আসিয়াছে, পরকালের কার্য্য
 করি । কেন পরের ঝগড়াটে দেহপাত করি, দূরে থাকিলে ইহ
 আমাকে দেখিতে হইবে না ; কিন্তু কি করিয়াই বা যাট
 শত রুপ্নে আমি আবদ্ধ—কি করিয়া ইহার মামা ত্যাগ করিব ?
 নানাপ্রকার কথা ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধ কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ-বর্ণিত ঘটনার পর—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ঘটনা দুই বৎসর পরে ঘটিল। করুণাময় দুই বৎসর পূর্বে ভব-রামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “দাদা! হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একবার সন্ধান লইলে হয় না?” ভবরাম বলিয়াছিলেন—“সংবাদ লইতে কোন দোষ নাই।” করুণাময় জ্যেষ্ঠের অমুমতি পাইয়া হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সন্ধানার্থ লোক নিযুক্ত করে। করুণাময় হরপ্রসাদের বাটীর সন্ধান পাইয়া জ্যেষ্ঠকে বলে—“দাদা! আপনি অমুমতি করিলে আমি বাইয়া সাক্ষাৎ করিতে পারি।” ইহাতে ভবরাম বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—“ভাই! করুণাময়! সংসার সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা অল্প। ইহা একটি জটিল ব্যাপার। তোমার বাইবার প্রয়োজন নাই। আমিই সুবিধা মত একদিন বাইয়া সংবাদ লইব।” ইহা এক বৎসর পূর্বের কথা।

এই এক বৎসরের মধ্যে অনেকবার করুণাময় ও সাগরবালা ভবরামকে কথাটা স্মরণ করিয়া দিয়াছে; কিন্তু ভবরামের বাইবার সুবিধা ঘটে নাই। ভবরাম চতুর্নাষ্ঠী চিন্তা লইয়া ব্যস্ত—বিশেষতঃ

এ সব গোলযোগের ভিতর যাইবার তাঁহার আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না। বারবার করুণাময় ও সাগরবালা যখন কথাটা পুনরালোচনা করিতে লাগিল, তখন ভবরাম, সাগরবালা ও করুণাময়ের আগ্রহাতিশয্যে যাইতে সক্ষম হইলেন। হরপ্রসাদের গৃহে গিয়া ভবরাম করুণ অপমানিত হইয়া আসিয়াছেন, তাহা পাঠক শূন্য পরিচ্ছেদে জানিতে পারিয়াছেন।

ভবরাম গৃহে আসিয়া কাহাকেও কিছু বলিলেন না। সন্ধ্যার সময় সকলেই দেবারাধনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের বা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের মর্ম্মযাতনা সর্ব্বাণেই বুঝিতে পারে। করুণাময় দাদাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না বটে, কিন্তু জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে চাহিয়া কনিষ্ঠের প্রাণের ভিতর দাবানল অগ্নিতে লাগিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, “তবে দাদা পাশ্চাত্য হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অপমানিত হইয়াছেন! দাদার মনের ভাব আজ এরূপ হইল কেন? যদি কেহ আমার দাদার অপমান করিয়া থাকে, তবে সে যেই হউক, বক্তৃতা করুণাময়ের দেহে রক্তবিন্দু থাকিবে, তাহাকে প্রতিফল পাইতে হইবে। কনিষ্ঠ করুণাময় জীবিত থাকিতে দেহের অপমান স্বচক্ষে দর্শন করিবে না! জীবনের বিনিময়েও কি দাদাকে তাহা ফিরাইয়া দিতে পারিব না! দাদা কষ্টকরবোধে ধর্ম্ম হারা করিবার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্ম বহির্ভূত কার্য

করিতে বান নাই ! ধর্মের জন্ত, জ্ঞানের জন্ত, কার্য্য করিতে গিয়া তিনি যদি অপমানিত হইয়া থাকেন—জান, ধর্ম কি তাহার বিচার করিবে না ?” এই প্রকার চিন্তা করুণাময়ের মনোমধ্যে উদ্ভিত হইয়া তাহাকে যন্ত্রণা দিতে লাগিল । তাহার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা গড়াইতে লাগিল ।

ভবরাম গভীরভাবে আজ ভগবৎ উপাসনায় বসিলেন । সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিয়া আত্মশক্তির স্তবপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহার মধুর কণ্ঠে সেই স্তবগুলি উচ্চারিত হইয়া, সেই গৃহ যেন মধুময় করিয়া তুলিল । ভবরাম করবোধে বলিতে লাগিলেন :—

সতী সাধ্বী ভব প্রীতা ভবানী ভবমোচনী ।

আর্য্যা দুর্গা জয়া আত্মা ত্রিনেত্রা শূলধারিণী ॥

পিনাকধারিণী চিত্রা চণ্ড ঘণ্টা মহাতপাঃ ।

মনো বুদ্ধিরহঙ্কারা চিত্তরূপা চিত্তা যিতিঃ ॥

সর্বমন্ত্রময়ী সত্য্য সত্যানন্দময়ী ॥

অনন্তা ভাবিনী ভব্যা ভব্যভব্যা সদাযতিঃ ॥

শাকম্বরী দেবমাতা চিন্তা রত্নপ্রিয়া সদা ।

সর্ব বিত্তা দক্ষকন্যা দক্ষবজ্রবিদ্যাশিনী ॥

সুপার্বী চৈ কল্যা চ পাটলা পাটলাবতী ।

মহাধরপরিধানা কলমঞ্জীরধারী ॥

অমেষ্যবিক্রমাকুরা সুন্দরী সুরসুন্দরী ।
 বনভূগা চ মাতঙ্গী স্বতন্ত্র মুনিপূজিতা ॥
 ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী জৈন্তী কোমারী বৈষ্ণবী তথা ।
 চামুণ্ডা চৈব বারাহী লক্ষ্মীশচ পুরুষাকৃতেঃ ॥
 বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানী ক্রিয়া সত্য চ বুদ্ধিদা ।
 বহলা বহলপ্রেমা সর্ববাহন বাহিনী ॥
 নিশুস্ত শুস্ত হননী মহিষাসুর মর্দিনী ।
 মধুকৈটভ হস্তী চ চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী ॥
 সর্ষাপসুর বিনাশ চ সর্বদানব ঘাতিনী ।
 সর্বশাস্ত্রময়ী সত্য সর্বশাস্ত্রধারিণী তথা ॥
 অনেকশস্ত্রহস্তা চ অনেকাশস্ত্র ধারিণী ।
 কোমারী চৈব কল্যা চ কৈশরী সুবতী রতিঃ ॥
 অশ্রোতা চৈব শ্রোতা চ বৃদ্ধা মাতা বলপ্রদা ॥

ন ভাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা ন পুত্রো ন গৃহী ন ভৃত্যো ন ভক্তা
 ন জ্ঞানী ন বিদ্যা ন সুতিষ্ঠমৈব গতিস্বং গতিস্বং স্বমেকা ভবামী ॥
 ভবামিহিগারে মহাভূতভীরো সপাত প্রকামী প্রলোভী প্রবর্তঃ ॥
 কুসংসারকুপ্রবন্ধঃ সদাঃ গতিস্বং গতিস্বং স্বমেকা ভবামী ॥
 ন জানামি দানং ন চ ধ্যান যোগং ন জানামি তত্ত্বং ন চ সত্যমসত্যং ॥
 ন জানামি পূজাং ন চ ভাস যোগং গতিস্বং গতিস্বং স্বমেকা ভবামী ॥

জানামি পুংগং ন জানামি তীর্থং ন জানামি মুক্তিং লয়স্বা কদাচিৎ ।
 । জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি নাতর্গতিত্বং গতিত্বং স্বমেকা ভবানী ॥
 চক্ৰা কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ ।
 হৃদ্ষিঃ কুবাকা প্রবন্ধঃ সদাহং গতিত্বং গতিত্বং স্বমেকা ভবানী ॥
 প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ
 । জানামি চান্দ্ৰং সদাহং শরণ্যে, গতিত্বং গতিত্বং স্বমেকা ভবানী ॥
 বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে জলে চানলে পর্কতে শত্রুমধ্যে ।
 মরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি গতিত্বং গতিত্বং স্বমেকা ভবানী ।
 মনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো মহাক্লীণদীনঃ সদা জাড্যবদ্ধঃ
 বপত্তিঃ প্রবিষ্টঃ প্রবুদ্ধঃ সদাহং গতিত্বং গতিত্বং স্বমেকা ভবানী ॥
 ও নমস্তে শরণ্যে শিবে সান্নুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিনী বিশ্বরূপে
 নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পদারবিন্দে নমস্তে জগত্তারিণী জাহি হর্গে ।
 নমস্তে জগচ্চিস্ত্যমানস্বরূপে, নমস্তে মহাযোগিনী জ্ঞানরূপে ।
 নমস্তে নমস্তে সম্মানস্বরূপে, নমস্তে জগত্তারিণী জাহি হর্গে ।
 মনাথস্ত দীনস্ত তৃষ্ণাতুরস্ত, ভর্য্যস্ত ভীতস্ত বহুতরস্তোঃ ।
 স্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারকর্তী, নমস্তে জগত্তারিণী জাহি হর্গে ।
 মরণ্যে বর্ণে দারুণে শত্রুমধ্যেহনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে
 স্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতুনমস্তে জগত্তারিণী জাহি হর্গে ॥
 মর্পারে মর্পারেহত্যস্ত ঘোরে, রিপং-সাগরে মকুতাং মেহতাম্য ।
 স্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনোকা, নমস্তে জগত্তারিণী জাহি হর্গে ॥

নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমমূর্ত্তে সরস্বতীরূপতামোঘশূররূপে ।
 বিভূতিঃ শচী তং সতী কালমাত্রি নর্মস্তু জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে ।
 নমস্চণ্ডিকে চণ্ড দোর্দণ্ড লীলালসৎখণ্ডিতাখণ্ডনামশেষ শত্রোঃ ।
 স্বমেকা গতিবিঘ্ন সন্দোহ হন্ত্রী ! নমস্তু জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে ।
 স্নানেকাজিতারাধিতা সত্যবাদিত্রমেয়াজিতারাধিতা ক্রোধনিষ্ঠা ।
 ইড়া পিঙ্গলা ত্বেং সুসুম্না চ নাড়ী নমস্তু জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে ।
 শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধ-বিদ্যাধরাণাং মুনিদমুজনরাণাং ব্যাধিভিঃ
 পীড়িতানাং

নৃপতিগৃহ-গতানাং দম্ভ্যভিস্রাসিতানাং হুমসি শরণমেকা

দেবী দুর্গে প্রসীদ

সুতপাঠ শেষ হইলে ভবরাম ধ্যানে বসিলেন । রজনী দ্বিতীয়
 প্রহর অতীত হইয়া গেল, তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না । সেই
 পায়জমিরের মতিগতি ধর্ম্মের পথে কিরাইবার জন্ত ভবরাম আর
 ব্যাকুলভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন ।

“রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে । সকলেই সুশুপ্ত
 ক্রোড়ে শায়িত । এমন সময় কে একজন দ্বারে টীংকার করিয়া
 ডাকিল, “বাটীতে কে আছেন, দ্বার খুলিয়া দিন, আমার বিশেষ
 প্রয়োজন ।”

দামরবালায় ভক্তা ডাকিল, তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া

করুণাময়ের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন—“ঠাকুর-পো ! একটা লোক বাহিরে ডাকিতেছে ।”

করুণাময় আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন, আগন্তুকটি কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কে ?”

“আমার নাম করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় ।” লোকটি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল ও পদধূলি গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি ভবরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ?”

করুণা । হাঁ । আমি তাঁহার কনিষ্ঠ ।

আগন্তুক । . আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব । আমার বিশেষ প্রয়োজন ।

লোকটির কণ্ঠস্বর অতিশয় জড়িত । কথাগুলি ব্যাকুলতা-পূর্ণ । করুণাময় তাঁহাকে বৈঠকখানার ঘরে সম্বন্ধে বসাইয়া কহিলেন, “আপনি একটু অপেক্ষা করিতে পারিবেন কি ? দাদার আসিতে একটু বিলম্ব হইবে । তিনি এখন পূজা করিতেছেন ।”

লোকটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—“তাঁহার সহিত যে সাক্ষাৎ হইবে, ইহাতেই আমি আশ্বস্ত হইয়াছি । যতক্ষণ না তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, ততক্ষণ আমি বসিয়া রহিলাম । আমার আগমন-সংবাদ প্রদান করিয়া তাঁহার পূজার ব্যাধাত করিবেন না ।” করুণাময় তাঁহাকে বসাইয়া উপরে চলিয়া গেলেন ।

লোকটি বেশ ছটপুট এবং দীর্ঘাকার, যতকের অধিকাংশ কেশই

শুভ্র। বয়স পঁয়তাল্লিশের কম হইবে না। দেখিলেই তাঁহাকে বেশ বুদ্ধিমান ও ধনবান বঙ্গিয়া মনে হয়। অঙ্গে একটা সামান্য কামিজ। পরিধানে একখানি দেশী ধুতি। শিকের রুমালে জড়ান কি একটা জিনিস তাঁহার দক্ষিণ হস্তে রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয় যে, তিনি অতি সাবধানী এবং সর্বক্ষণ মস্তিষ্ক চালনায় অভ্যস্ত!

বহুক্ষণ পরে ভবরামের ভগবৎ আরাধনা শেষ হইল। কৰুণাময় ভদ্রলোকটির কথা জ্যোষ্ঠকে নিবেদন করিলেন। পরে উভয় ভ্রাতাই নীচে নামিয়া আসিলেন।

ভবরামের কটীদেশ হইতে জাহুর উপর পর্য্যন্ত একখানি ক্ষুদ্র গৈরিক বসন জড়িত। হস্ত দুইখানিতে এখনও ফুল, তুলসী ও চন্দনের গন্ধ রহিয়াছে। এইমাত্র ভগবৎ আরাধনা শেষ করিয়া আসিতেছেন, মুখের সে সদানন্দ ভাব এখনও তিরোহিত হয় নাই। ভদ্রলোকটি অবনত মস্তকে অনিমিষ নয়নে ভবরামের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কলুষিত হৃদয় লইয়া বুঝি মুখের দিকে চাহিবার সাহস হইল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ভদ্রলোকটির জ্ঞান হইল। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ভবরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন?”

ভদ্রলোকটি ক্রন্দন-মিশ্রিত স্বরে করঘোড়ে ভবরামকে বলিল—
“আমি মহাপাপী ! আমার পরিচয় আপনাকে কি দিব ? আজ
আমি আপনার চরণে শরণ লইতে আসিয়াছি ! ব্রাহ্মণ চির-
দিনই ক্ষমাশীল ! আপনি আনাকে মহাপাপী বলিয়া কি ক্ষমা
করিবেন না ?

ভবরাম কি বলিতে যাইতেছিলেন । ভদ্রলোকটি অজ্ঞান
জলধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া করঘোড়ে বলিলেন, “আপনি
কোন কথা আনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না । অগ্রে আমাকে হৃদয়ের
ভার নামাইতে দিন ! আমার প্রাণ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে,
পাপরূপ বিষধর সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া আমার হৃদয়ে তীব্র
দংশন করিতেছে ! বিশ্বের জালায় আমার জীবন দুর্ক্স হইয়াছে ।
অনুতাপানলে আমার হৃদয় ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে ।
উঃ কি তীব্র যাতনা ! তার কি ভীষণ মূর্তি ! মনে পড়িয়া
আবার আমার অন্তরাঙ্গা দুর্ দুর্ করিতেছে । ঐ ঐ সেই ভীষণ
জকুটি, আমায় রক্ষা করুন—রক্ষা করুন ।” লোকটা এই বলিয়া
ছিন্ন কদলী-বৃক্ষের শ্রায় সংজ্ঞাশূণ্য হইয়া ভূমিতে পতিত হইল ।

করণাময় তাড়াতাড়ি জল ও ব্যঞ্জন লইয়া আসিলেন ।
ভবরাম মস্তক ও চক্ষে জল সেচন করিতে লাগিলেন । ভদ্রলোকটি
উত্তর ভ্রাতার শুশ্রূষায় শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইলেন । একটু স্থির হইয়াই
তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, “আপনি আমার কোন কথা

জিজ্ঞাসা করিবেন না ! আপনার চরণে অগ্রে আমার প্রাণের
যাতনা নামাইতে দিন ! বিষের জালায় আমি জলিয়া যাইতেছি ।
এ বোঝা আমি আর বহিতে পারি না ! অতি কষ্টে বোঝা লইয়া
আপনার চরণ সমীপে আসিয়াছি ! যতক্ষণ পথে আসিয়াছি, দুই
হস্তে বুক চাপিয়া ধরিয়া আসিয়াছি ! উঃ কি যাতনা ! সহস্র
খুঁচী বিদ্ধ হইলেও বোধ হয় এক যন্ত্রণা হয় না ।

“এতদিন এই পাপের বোঝা বহিতেছিলাম । কোনই কষ্ট
ছিল না । কেবল এক একবার বুকের ভিতর দিকি দিকি করিয়া
আপ্তনের শিখা জলিয়া উঠিত ! কার্য্যান্তরে মন নিয়োজিত করিলেই
পরক্ষণে তাহা নিবিয়া যাইত ।

“কিন্তু আজ—উঃ ! সে কথা আর বলিতে পারিব না ! জানি
না—কে সেই মহাপুরুষ !!! প্রতিদিনের ঘটনা, প্রতি পলের
ঘটনা, যাহা আমি ব্যতীত কস্মিন্‌কালে কখন কাহারও জানিবার
উপায় ছিল না, সেই সমস্ত গুপ্ত কথা, গুপ্ত অভিসন্ধি—গুপ্ত
ঘটনা—গুপ্ত রহস্য তিনি কি করিয়া জানিলেন ?

“আপনাকে কিছুই গোপন করিব না । প্রাণের অন্তঃস্থলে যে
কথা লুকান আছে, অথ তাহা আপনাকে বলিব ! উঃ আবার সেই
মহাপুরুষের ক্রকুটি মুষ্টি আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে !

“আমি অনাচারী,—ধর্ম্মভ্রষ্ট, স্বধর্ম্মানুমোদিত কোন কর্ম্ম
কখনও করি নাই । জাতিভেদ মানি নাই । ব্রাহ্মণ চণ্ডালে

কখনও প্রভেদ মানি নাই? সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান। ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিতে হয়, প্রণাম করিতে হয়, একথা যে বলিত, তাহাকে ভণ্ড—প্রতারণা বলিয়া অদৃষ্ট করিয়াছি। শালগ্রাম শিলাকে পাথরের ছুড়ি বলিয়া ঘৃণা করিয়াছি। কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভিনাকে খড় ও মাটির দেবতা বলিয়া মনে মনে উপহাস করিয়াছি। ভাবিতাম, হিন্দু ব্রাহ্মণগুলার সকলেই ছুষ্ঠামি। সন্ন্যাসী যোগীর কথা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতাম। মনে হইত কোন যুগে হয় ত যোগী-সন্ন্যাসী ছিল, কিন্তু এখন কেবল ভণ্ডামিতে পরিণত হইয়াছে। বেদ-বেদান্তাদি হিন্দুর পবিত্র শাস্ত্র কোন দিন স্পর্শ করি নাই, চিরদিনই ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু আজ মুহূর্ত্তের ঘটনায় যে শাস্ত্রের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, হিন্দুর বাহ্য কিছু সবই সত্য—সকলেই জাগ্রৎ! একবিন্দুও মিথ্যা নহে।

“আনি কার্যস্ব সন্তান; হিন্দু বলিয়া যে খাড়াখাড়ের নিচায় করিতে হয়, তাহা কোনও দিন করি নাই। বিজাতীয় খাড়া ব্রাহ্মণের মত চিরদিনই ভক্ষণ করিয়া আসিয়াছি।

“আনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম, এ, বি, এল, পরে, এটর্নি হইয়াছি। এই বিদ্যাই আমাকে অবিকাররূপে প্রাপ্ত করিয়াছে। এখন বুঝিতেছি, আমি যদি হিন্দু-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া হিন্দুর মত থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে এত অর্থশ্রী-

চরণের প্রবৃত্তি হইত না। অভাব-রাক্ষসীর ভয়ে “হয় কে নয়” “নয় কে হয়” করিয়া অর্থের জ্ঞাত ধর্মকে বিসর্জন দিতে হইত না। অর্থের জ্ঞাত নরঘাতক দস্যুত্তে বাহা করিতে ইতস্ততঃ করে, আমি তাহা ঈমানবদনে করিয়াছি। আইনের কুটতর্কে রামের ধন শ্রামকে, শ্রামের ধন রামকে দিয়াছি। টাকার জ্ঞাত গরিবের “বাহা গ্ৰাঘ্য প্রাপ্য, তাহা ধনীরা অট্টালিকায় তুলিয়া দিয়াছি। কত দিনের অশ্রুধারা একত্র করিয়া অট্টালিকা, উদ্যান, গাড়ি, জুড়ি, মণিমুক্তা, জহরতের অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিয়াছি। দস্যুরা ধ্বংস করিয়া লুণ্ঠন করে, আমি আইনের দোহাই দিয়া পরস্ব অপহরণ করিয়াছি। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, আমার গ্ৰাঘ্য সম্পত্তি কেন উড়িয়া গেল। দস্যুরা আমা অপেক্ষা অল্প অপরাধী। তাহারা প্রকাশ্যভাবে ধনরত্ন লুণ্ঠন করে, আর আমি সুশিক্ষিত দস্যু—লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া অর্থোপার্জন করিয়াছি।

“আমি হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের এটর্নি ছিলাম। হরপ্রসাদ আমাকে যত বিশ্বাস করিতেন, বোধ হয় তিনি নিজেকে অতটা বিশ্বাস করিতেন না। বৈষয়িক সকল কার্যোই তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। আমি বাহা করিতাম, হরপ্রসাদ তাহার উপর আর কোন কথা কহিতেন না। প্রভূত অর্থ হাতে পাইয়া হরপ্রসাদ কুসঙ্গে মজিয়া কিছুদিন চরিত্রহীন হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহার জ্ঞান সরল উদার প্রকৃতির লোক আমি অল্পই

দেখিয়াছি। কপটতার ছায়ামাত্রও তাঁহার হৃদয় কখন স্পর্শ করে নাই।

“অসং সঙ্গীদের সহিত নিশিয়া—অত্যাচারে অনিয়মে অকালে তরপ্রসাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। সানাত্ত কারণে রামপ্রসাদ গৃহভ্যাগ করিয়া বাওরায় স্বাস্থ্যভঙ্গের উপর তাঁহার হৃদয় একবারে ভাঙিয়া পড়িল। ভ্রাতৃহীন হইয়া তিনি পৃথিবী শূণ্য দেখিতে লাগিলেন। আমার গলদেশ বেঠেন করিয়া রামপ্রসাদের ভ্রাতৃ তিনি কতদিবস রোদন করিয়াছেন। তাঁহার সেই করুণ রোদনের কথা মনে পড়িলে এখনও আমার আঘ নিশ্বাস নিঃস্বরের চক্ষু দিয়াও জল পড়ে। ভ্রাতৃহারা হইয়া তিনি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি ক্রন্দনে অতি-বাহিত করিয়াছিলেন।

“ভ্রাতৃশোকে তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চিকিৎসকের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। যাহার হৃদয় ভাঙিয়া যায়, হুলদর্শী চিকিৎসকে তাহার কি করিবে? হরপ্রসাদের সাধ্বী স্ত্রী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বামীর শিয়রে বসিয়া অহোরাত্র সেবা করিত, আর দেবরের ভ্রাতৃ রোদন করিত। ক্রমশঃ হরপ্রসাদের শেষ দিন সংগত হইয়া আসিল। একদিন তিনি আমার গলা জড়াইয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন, “আমি চলিলাম; কিন্তু বৃত্তার পূর্বে আমি একটি উইল করিয়া রাখিতে চাই। আমি

জীবিতাবস্থায় আপনি উহা রেজেষ্টারি করিয়া দিন। এই সেই উইল।” এই বলিয়া ভদ্রলোকটী উইলখানি বাহির করিয়া ভবরাম ও করুণাময়ের নিকট পাঠ করিতে লাগিলেন। আমরা উইলের আবশ্যক কথাগুলি পাঠকগণকে শুধাইতেছি।

(হরপ্রসাদের উইলের মর্ম্ম)।

“আমার নাম শ্রীহরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। পিতা ৬ জনার্দন চট্টোপাধ্যায়। আমার পিতা তাঁহার স্বপুত্র ৬ ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উইলের সর্ত্তানুসারে তাঁহার তাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ’ন। চৌরঙ্গীর ছইখানি ত্রিতল অট্টালিকার মূল্য অনূন একলক্ষ টাকা, বিডন্ ষ্ট্রীটের তিনখানি বাড়ী, একলক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ, চিৎপুর রোডের বাসভবন এবং অলঙ্কার ও নগদ প্রায় ছইলক্ষ টাকা পিতৃদেব তাঁহার স্বপুত্রের কৃত উইল অনুযায়ী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পিতৃদেব স্বপুত্রের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে বাৎসরিক একলক্ষ টাকা আয়ের কতকগুলি জমিদারী নিলামে ক্রয় করেন। এই সমস্ত সম্পত্তির মালিক আমি শ্রীহরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

“আমার কনিষ্ঠ আমারই দোষে অভিমানে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ভ্রাতার সন্ধান পাইবার জন্ত আমি চেষ্টার ক্রটি করি নাই। এমন স্থান নাই যেখানে রামপ্রসাদের সন্ধানের জন্ত যৌক

না পাঠাইয়াছি, সকল চেষ্টায় হতাশ হইয়া ভ্রাতৃশোকে আমি আজ মৃত্যু শয্যায় শায়িত ।

“আমার সন্তানাদি নাই । আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী আমার স্ত্রী শ্রীমতী হেমাজিনী দেবী । রামপ্রসাদ অবিবাহিত । আমি এই চরমপত্রে বিষয়-সম্পত্তির যাহা বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেছি, তাহাই বাহাল থাকিবে । আমাদের আর কোন ওয়ারিশান নাই । আমরা দুই ভ্রাতাই আমাদের পিতার ত্যজ্য সম্পত্তির একমাত্র মালিক ।

আমি স্ব-ইচ্ছায় উইল করিয়া যাইতেছি যে—

১। আমি কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে অর্দ্ধেক সম্পত্তি দানে আমারও অর্দ্ধেক অংশ দান করিয়া যাইতেছি । রামপ্রসাদ পূর্ণ বোল আনা সম্পত্তির মালিক হইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবে ।

২। আমার স্ত্রী হেমাজিনী দেবী আমার মৃত্যুর পর চিরজীবন একখানি বাড়ী ব্যবহার করিতে পাইবেন । এই বাড়ীতে থাকিয়া তিনি বিধবার উপযুক্ত ব্রহ্মচর্যা ব্রত পালন করিবেন । পূজা অর্চনা করিবেন । তাঁহার দান ও ব্রতাদির জন্ত যাহা প্রয়োজন হইবে, রামপ্রসাদ বিধবাকে প্রদান করিবেন ।

৩। বিধবা হেমাজিনী দেবীকে আমার কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ যে কোন একখানি বাড়ী ইচ্ছাপূর্বক দিবেন, তাহাই তিনি জীবনকালে ব্যবহার করিবার জন্ত গ্রহণ করিবেন ।

৪। আমার স্ত্রী হেনাঙ্গিনীর পঞ্চাশ হাজার টাকার দে অলঙ্কার আছে, তাহা তাহার নিজের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। আমার স্ত্রী হেনাঙ্গিনী দেবীর ব্রহ্মচর্য্যপালন, তীর্থ-ভ্রমণ ও দান-পুণ্যের জন্ত যাহা-ব্যয় হইবে, তাহা কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে নিজের বিবেচনা মত প্রদান করিবেন। আমার স্ত্রী হেনাঙ্গিনী দেবী স্বাধীনভাবে বা যদৃচ্ছা কোন কাৰ্য্য করিতে পারিবেন না।

৬। যদি আমার ভ্রাতা রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আর গৃহে প্রত্যাগমন না করেন, অথবা তাঁহার যদি মৃত্যু হইয়া থাকে বা সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সম্যাসের পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন, তবে রামপ্রসাদ সংসার বন্ধন ত্যাগকালে এই বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে যদি কোনরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়া থাকেন, অথবা তাহার কোন স্নেহের পাত্র বা পাত্রীকে বিষয়-সম্পত্তি দানের কোন লেখাপড়া বা বাচনিক কাহারও কাছে কিছু বলিয়া গিয়া থাকেন, তবে তাহার ইচ্ছা মত কার্য্য হইবে। অর্থাৎ এই সমস্ত সম্পত্তি রামপ্রসাদের শেষ ইচ্ছা অনুসারে তিনি বা তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন।

“ইহাই হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের উইলের মর্ম্ম। এই উইলানি তিনি জীবিতকালেই রেজেষ্টারী করিয়া আমার হস্ত দিয়া যান এবং তাঁহার মৃত্যুর পর আমাকেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা

করিতে বলিয়া যান । স্বামী ও দেবরের শোকে হরপ্রসাদের স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর তিন মাস পরেই স্বর্গধামে চলিয়া যান । সেই সতীর পঞ্চাশ সহস্র টাকার জড়োয়া অলঙ্কারগুলি আমার নিকটেই আছে । কতবার তাহা আমি লৌহ-সিন্দুক হইতে বাহির করিতে গিয়াছি, কিন্তু স্পর্শ করিতে পারি নাই । স্পর্শ করিতে গেলেই দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে ! সতীর অন্তিমবাক্য মনে পড়ে । মৃত্যুকালে মা আমার হাতে ধরিয়া বলিয়াছিলেন—“বাবা ! আমার স্বর্গগত স্বামী আপনাকে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতেন । আমি তাঁহার কাছেই যাইতেছি । আমার অলঙ্কারগুলি দেবর রামপ্রসাদকে দিও । আমার অন্তিম অনুরোধ, দেবর যেন এই অলঙ্কারগুলি দ্বারা স্বামী-পুত্রহীন আমার মত নিরাশ্রয়া বিধবাদের অন্নের সংস্থান করিয়া দেন ।” আজ এক সপ্তাহ পূর্বে অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম । চাবি লইয়া অলঙ্কারগুলি বাহির করিতে যাইবার সময় কে যেন আমাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—

“পাষাণ্ড ! সমস্ত গ্রাস করিয়াছ, এখনও তোমার ক্ষুধা মিটে নাই ? সাবধান ! সতীর অলঙ্কারে হস্তার্পণ করিও না ! তোমার সর্বনাশ হইবে । তাঁহার অন্তিমবাক্য স্মরণ কর ।

“আমি বসিয়া পড়িলাম । অলঙ্কারগুলি বাহির করিবার জন্য আর আগ্রহের হইতে পারিলাম না । আমি নাস্তিক, অধাৰ্মিক,

মনে করিলাম, এটা আমার হৃদয়ের দুর্বলতা ! অশ্রু স্থগিত রহিল, অশ্রু একদিন যাইয়া বিক্রয় করিয়া আসিব।

“আমার একজন সহপাঠী বন্ধু আছেন। তিনিও একজন প্রসিদ্ধ এটর্নি। আমি তাঁহার নাম মুখে আনিতে পারিব না। তাঁহার কথা উত্থাপন করিতে হইতেছে, এইজন্য ক্রোধে ও ঘৃণায় আমার হৃদয় অস্থির হইতেছে।

“এই বন্ধুটি হরপ্রসাদের আত্মীয়। দূর-সম্পর্কে ভগ্নীপতি হইতেন। হরপ্রসাদ ভগ্নীপতির আচরণে তাঁহাকে চিরদিনই ঘৃণা করিতেন। সাক্ষাৎ হইলেও কথা কহিতেন না। ইঁহার এক সম্ভান আছে, নাম কৃষ্ণকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

“আমার এই বন্ধু হরপ্রসাদের মৃত্যুর পরেই আমাকে নানা-রূপে প্রলুব্ধ করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার প্রস্তাবে আমার ঘৃণা হইয়াছিল ; কারণ তখনও আমার বিবেক একেবারে আমার পরিত্যাগ করে নাই। এক লক্ষ, দেড় লক্ষ, দুই লক্ষ ক্রমশঃ তিন লক্ষ টাকায় উঠিয়া সে আমাকে অহোরাত্র প্রলোভিত করিতে লাগিল। অর্থের মোহিনী শক্তিতে আমি সব ভুলিলাম। একদিন বন্ধু বলিলেন, “হরপ্রসাদের এখন ত আর কেহ ওয়া-
 ন্নিয়াই নাই। রামপ্রসাদ বহুদিন হইল অরণ্যে ব্যাঘ্রের কবলে
 মগ্ন হইয়াছে। হেমাদিনীও হরপ্রসাদের সঙ্গিনী হইয়াছে।
 আমার পুত্র কৃষ্ণকান্ত একটু দূর-সম্পর্কীয় হইলেও—হরপ্রসাদের

ভাগিনেয় । লোকতঃ—ধর্মতঃ—মাতুলের বিষয় ভাগিনেয়ই প্রাপ্য ।
আইনেও কোন গোল বাধিবে না । তুমি সম্মত হইলেই সব
গোল মিটিয়া যায় ।”

“বন্ধু দুই তিনখানি জাল দলিলও প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন
অর্থলোভে আমি ছায়া, ধর্ম পদদলিত করিলাম । আমার শিক্ষা,
দীক্ষা, প্রতিষ্ঠা, সংযম সবই যেন স্রোতের মুখে তৃণের ছায়া ভাসিয়া
গেল । হায় ! অর্থ—তোমার শক্তি কি ভীষণ ! অর্থলোভে—দম্ভ্য
—নিরীহ, নিরপরাধ অবলা ও শিশু হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় না—
পুত্র পিতার বিরুদ্ধাচারণ করিতে লজ্জাবোধ করে না—ভ্রাতা, ভ্রাতার
বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হয় না—
বন্ধু বন্ধুর প্রতি গুপ্ত মিছরির ছুরি প্রয়োগ করিয়া তাহার সর্বনাশ
করিতে কাতর হয় না । হায় ! অর্থ, তোমার কুহকে যে পড়িয়াছে
—সে নিস্তার পাইয়াছে কি ? কত শত সহস্র গৃহ এই অর্থের
জন্ত যে আজকাল উৎসবের পথে যাইতে বসিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা
নাই । আমি ত কোন্ ছার ! অর্থলোভে আমি মজিলাম । শয়তান
আমায় প্রলোভিত করিল । মানুষ বধন শয়তানের করাত হইয়াছে,
তখন তাহার হিতাহিত বুদ্ধি থাকে না—অকৃত্রিম মিত্রও তখন
শত্রুতে পরিণত হয় এবং সেই পাপরূপ পিশাচই তখন তাহার
একমাত্র উপদেষ্টা হইয়া থাকে । যে হরপ্রসাদ আমাকে -মিজের
মত বিশ্বাস করিয়া বিষয়াদির ভার দিয়া গিয়াছিলেন, আমি বিশ্বাস-

বাতকতা করিয়া শয়তানের পরামর্শে তাঁহার সেই অস্তিত্ব বাক্যকেও অবহেলা করিলাম। অর্থের লোভে নিজে উদ্যোগী হইয়া রামের দান গ্রাহকে দিলাম। ভাগিন্বে কৃষ্ণকান্ত বন্দোপাধ্যায়কেই হরপ্রসাদের তাজা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া আদালতে প্রমাণ করিলাম। হরপ্রসাদের উইল লইয়া কেহই প্রতিবাদ করিতে দণ্ডায়মান হইল না।

“আজ আফিস হইতে দ্বিপ্রহরের পূর্বে ফিরিয়া আসিলাম। আমার মন যেন ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিল। নির্জন গৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যাপরি শয়ন করিলাম। ভূত ভবিষ্যতের চিন্তা একত্রে অগ্নি গোলকের মত সজোরে আসিয়া বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। উঃ! সে কি প্রাণঘাতী যাতনা! এমন সময় সেই নির্জন দ্বার-রুদ্ধ গৃহে কোথা হইতে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইল! তাহার চক্ষু দুটি অগ্নির মত জলিতেছে, অটরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত! উঃ! কি ভীষণ মূর্ত্তি! আমি তাহা দেখিয়াই মনে করিলাম যেন মহাদেব রুদ্ধমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে কৃত অপরাধের জন্ত বিনাশ করিতে আসিয়াছেন। সন্ন্যাসীর দিকে আমি বেশীক্ষণ চাহিতে পারিলাম না! ক্রমে আমি যেন জ্ঞানশূন্য হইলাম। তদ্রূপে তখন আমার তাঁহার বজ্রবাণী আমার প্রবণের ভিতর দিয়া মরমে আঘাত করিতে লাগিল।

“আমি সংজ্ঞাশূন্য কি তদ্রূপে কিছুই স্থিতিতে পারিলাম

না । সন্ন্যাসী বজ্রগম্ভীরস্বরে যেন বলিতে লাগিলেন, “পাপিষ্ঠ !
 তোরই জন্তু নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ অপমানিত ! এতদ্ভিন্ন কত নির্দোষীকে
 তুই পথে বসাইয়াছিস্, কত লোকের সর্বনাশ করিয়াছিস্, একবার
 স্মরণ করিয়া দেখ্ ।” বজ্রনির্নাদে এই কথাগুলি বলিয়া পরে
 বলিলেন, “দেখ্ পাপিষ্ঠ তোর কৃতকর্ম্মের চিত্র দর্শন কর ।” তারপর
 বায়স্কোপের ছবির মত একে একে অতি গোপনে অল্পাঙ্কিত আমার
 পাপ কার্য্যগুলি—আমার চক্ষের উপর নৃত্য করিতে লাগিল । পাপের
 পরিণাম কি তাহাও দেখাইলেন । বেদবিধি মিথ্যা নহে—তাহারও
 চাক্ষুষ প্রমাণ আমার দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল ! দর্শ্যাদর্শ্য,
 পাপ-পুণ্যের ছবি অতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইতে লাগিল ।
 বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষার পরিণামও তিনি দেখাইলেন । ওঃ ! সে কি
 ভয়ঙ্কর ! প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছে ! স্বর্গপুরে হরপ্রসাদ ও
 হেমাজিনী বিচরণ করিতেছেন, তাহাও দেখিয়া নয়ন সার্থক
 করিলাম । পুণ্যাত্মা রামপ্রসাদের যোগ ও সাধনা, পুণ্য-মলয়ানিলের
 তায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ হরপ্রসাদ ও পুণ্যময়ী হেমাজিনীর পুত্ৰ অঙ্গে
 লাগিয়া তাঁহাদের পুণ্যপ্রভাকে আরও বর্দ্ধিত করিতেছে । যোগ-
 প্রভাবের এই আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম । হিন্দুর
 ক্রিয়া-কলাপ, দান, ব্রত, প্রতিমা পূজা, রীতিনীতি যে পরকাল
 ও স্বর্গের সঙ্গে সমন্বয়ে বাধা—তাহাও চাক্ষুষ দেখিলাম । আর
 দেখিলাম—ব্রহ্মতেজ ! হিন্দু সতীর সতীত্বগরিমা !

“তারপর দ্বাচার কৃষ্ণকান্তের দ্বারা আপনি যে প্রকারে অপমানিত হইয়াছেন—সেই চিত্র তিনি আমার নয়নসমক্ষে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, “দেখ্ অবিশ্বাসী স্বধর্মদ্রোহী হিন্দু ! চাহিয়া দেখ ! ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মভোজ অপমানিত হইতেছে ! ভবরাম, সে তেজ সংবরণ করিয়া রহিয়াছেন। ভবরাম ব্রহ্মতেজ সংবরণ করিয়া না রাখিলে কৃষ্ণকান্তকে রক্ষা করিবার কাহারও সাধ্য ছিল না। দেখিলাম, আপনি চক্ষু মুদিয়া কৃষ্ণকান্তের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন।

“দেখিলাম সতীলক্ষ্মীর সতীত্ব গরিমা ! যখন আপনি অপমানিত, সেই সময়ে আপনার সহধর্মিণীর হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল ! তিনি কল্পমোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে বসিলেন। আর দেখিলাম, কনিষ্ঠের হৃদয়ের সহিত জ্যেষ্ঠের হৃদয়ের কি অপূর্ব সৌসাদৃশ্য ! আপনার অনুরক্ত করুণাময় তখন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন। হৃদয়ের তার যেন কাঁপিয়া উঠিল ; কিন্তু করুণাময় বুঝিতে পারিলেন না, কোথা হইতে কিরূপে হৃদয়ের তারে টান পড়িল। সন্ন্যাসী বলিলেন, “দেখ্, পাষাণ এখনও বুঝিয়া দেখ্, হিন্দুর ক্রিয়া-কর্ম্ম, মন-প্রাণ, কেমন সমন্বয়ে বাধা ! উঃ ! আরও কত দেখিলাম, আর বলিতে পারিতেছি না। মুহূর্ত্তের মধ্যে এই সমস্ত ঘটনা আমার চক্ষের সম্মুখে দিয়া চলিয়া গেল।

আবার সেই সন্ন্যাসীর রুদ্রমূর্তির কথা মনে পড়িতেছে । এখন বুঝিয়াছি, হরপ্রসাদ ও রামপ্রসাদের সমস্ত সম্পত্তিই মা কামেরিয়ার । আমিই প্রধান পাপী ! আমি বিচারকের সম্মুখে বলিব, আমার চক্রান্তেই এই বিচার-বিভ্রাট ঘটিয়াছে ! বিচারকের সম্মুখে সমস্ত সত্য বলিয়া, আমার পাপের কাহিনী বর্ণনা করিয়া, চিরজীবনের মত সশ্রম কারাবাস প্রার্থনা করিব । ইহাতে যদি পাপের একটুও প্রায়শ্চিত্ত হয়, তবে আমি সুখে মরিতে পারিব ।

“উঃ আবার সেই ভীষণ মূর্তি মনে হইতেছে ! কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, আমার একটু জল দাও ।”

এই বলিয়া আবার ভদ্রলোকটি অচৈতন্যদেহে ভূমে নুষ্ঠিত হইয়া পড়িল ।

ভবরাম ও করুণাময় এটর্নি বাবুর মূর্ছা ভঙ্গ করিয়া নানা-প্রকার বাক্যে সাবুনা প্রদান করিলেন । ভদ্রলোকটি ব্যাকুল-চিত্তে বালকের ছায় রোদন করিতে লাগিল । উঃ অমৃত্যুপবরণা কি ভীষণ ! তবুও মানব পাপ করিতে কাস্ত হয় না !

ভবরাম বলিলেন—“আপনার পূর্বজন্মের অনেক স্মৃতি সঞ্চিত ছিল । তাই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের এই অদ্বৈত শক্তি বেশিয়া-ছেন । বহু তপস্তা না করিলে মানব ঐলিক শক্তির অমিকারী হয় না এবং মানবের ইহা দৃষ্টিগোচর হয় না ! আপনি পূর্বজন্মে যোগরত মহাপুরুষ ছিলেন । কন্দ্ববিপাকে আপনাকে দিন করেক

বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে। আপনার সুসময় আসিয়াছে, আর চিন্তা করিবেন না। এই কারণেই মহাপুরুষ আসিয়া আপনাকে দর্শন দিয়াছেন।

“আপনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন যে, আপনি একজন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র। বর্তমান শিক্ষার শেষ পর্য্যন্ত আপনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এক্ষণে এই সন্ন্যাসীর হঠাৎ আগমন সম্বন্ধে কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন কি? কোন শক্তিবলে সন্ন্যাসী আমার নির্ঘাতন অবগত হইয়াছেন, তাহা বোধ হয় আপনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। আমি আপনাকে সহজ কথায় ইহা বুঝাইতেছি, শ্রবণ করুন।”

ভদ্রলোকটা বলিলেন, “মানসিক শক্তিবলে মানব অনেক সংবাদ রাখিতে পারে। এ সম্বন্ধে আজকাল প্রতীচা জগতেও বহু আন্দোলন হইতেছে—ইহা আমি পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু বাস্তবিকই মানসিক শক্তিটা কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমাদের দেশে পুরাকালে মুনি-ঋষিগণ এই শক্তিবলে অনেক দুঃসাধ্য কার্য্য করিয়াছেন—এই প্রকার ঘটনা আমাদের বহু শাস্ত্র-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু অবজ্ঞা করিয়া তাহা কখনও পাঠ করি নাই। হিন্দু-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বরাবরই হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ আবর্জনারাশি—এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হইয়া, তাহা উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি।

এক্ষণে আমায় দয়া করিয়া বলুন—কি শক্তিবলে সন্ন্যাসী এই সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়াছেন। প্রথমতঃ বুঝাইয়া দিন, সন্ন্যাসী কি করিয়া আমার রুদ্ধগৃহে প্রবেশ করিলেন।”

ভবরাম হাসিয়া বলিলেন, “যে ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসীদিগের নিকট ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান কিছুই অবিদিত থাকে না, তাঁহারা বহু আরাধনায়—বহু সাধনায় এই শক্তি অর্জন করিয়া থাকেন। মানসিক শক্তি কি, আমি তাহাই আপনাকে বলিতেছি—আর সন্ন্যাসী কি করিয়া আপনার সুরক্ষিত গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা কি বুঝিতে পারেন নাই? আমাদের এই শরীর জড়ের সমষ্টি; অস্থি, মেদ, মাংস ও রক্তে এই শরীর গঠিত হইয়াছে। আমরা এই জড়ের সেবাতেই ব্যস্ত থাকি; কিন্তু ইহার পরিণাম কি, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখেন? ইহা হয় অশানে ভগ্নীভূত হইয়া, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমে মিশিবে—নতুবা সমাহিত হইয়া, নৃত্তিকাস্থ্যে পরিণত হইবে। জড়ের শক্তি ও সীমা এই পর্য্যন্ত; কিন্তু প্রত্যেক মানবেরই একটা স্বতন্ত্র সূক্ষ্ম শরীর আছে; কিন্তু ব্যবহার হয় না বলিয়া ইহা অহুভূত হয় না। লৌহ ফেলিয়া রাখিলে যেমন ময়লা ধরিয়া উহা নষ্ট হয়—সেই প্রকার ইহা অব্যবহারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া সিদ্ধ তাপসগণ যদৃচ্ছা গমন করিতে পারেন, কেহ তাঁহাদিগকে

বাধা দিতে পারে না। হিন্দুর এই অলৌকিক কার্য্য, প্রতীচা সমাজ বুদ্ধিতে পারে না বলিয়াই তাহারা উপহাস ও বিদ্বেষের ছলে ইহার আলোচনা করিয়া থাকেন—আর আমরা তাহাই পাঠ করিয়া, স্বধর্ম্মে বীতরাগ হই এবং ক্রমে ক্রমে নাস্তিকতা আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করে। কিরূপে মানব এই ক্ষমতার অধিকারী হয়, তাহা বুঝান বড় শক্ত। যেমন তৈলঙ্গ স্বামী গঙ্গাগর্ভ হইতে দুইখানি একই প্রকার তরবারি উত্তোলন করিয়া ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডকে বিমোহিত করিয়াছিলেন এবং কিরূপে তিনি এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝান বেক্রম দুর্কর—এই সূক্ষ্ম শরীর তত্ত্ব আলোচনা করাও মানবের পক্ষে তদ্রূপ। যোগমার্গে বেশীদূর অগ্রসর না হইলে, ইহা বুদ্ধিতে পারা যায় না। আজ আর আমি এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিব না। এক্ষণে গুরুদেব কি শক্তিবলে আপনার নিগূঢ় কাহিনী জানিতে পারিয়াছেন, তাহাই বলিব।”

ভদ্রলোকটা বলিলেন, “সূক্ষ্ম শরীর ধারণ সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই আমি ইহা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। যাহাকে আজ আমি দেখিয়াছি—তাঁহার পক্ষে এই প্রকার সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তিনি যে একজন অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন অলৌকিক পুরুষ, তাহা আমি বিলম্বণ বোধিয়াছি।”

ভবরাম বলিলেন, “মানসিক শক্তি কি, তাহা আমাদের দেশে অনেকেই জানেন না অথবা জানিতে চেষ্টাও করেন না। আজকাল থিয়োজফীষ্ট সম্প্রদায় এই সম্বন্ধে আমেরিকায় সামান্য আলোচনা করিতেছেন এবং আমরা তাহাই পাঠ করিয়া প্রশংসা করিতেছি। নিজের জিনিসের’ অপরের মুখে ব্যাখ্যা শুনিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। এই হিন্দু-শাস্ত্র, পূর্বে মানসিক শক্তিসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। চতুর্বেদের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মানসিক শক্তিবলেই যে সনকাদি ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, একথা শুনিলে, আধুনিক লোকেরা হাস্য করিয়া থাকেন; কিন্তু যিনি এই বিশাল জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—এই লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, জল, পাহাড়, মরুভূমি প্রভৃতি বাহ্যিক সৃষ্টি, তাহার মানসিক শক্তি সম্বন্ধে অল্প ধারণা করা সম্পূর্ণ অলীক। আমরা কিছুই জানি না—কিছু বুঝি না বলিয়া, এই ভ্রম-বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে।

“পৃথিবীতে এমন কোনও কার্য নাই, বাহ্য এই শক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইতে পারে। মানব এই শক্তি পাইলে, সমস্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারে। এই মানসিক শক্তি, ধরিতে গেলে সকল শক্তির মূলধার। জাগতিক, শারীরিক, মানসিক, ভৌতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বাবতীয় শক্তি ইহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

হিন্দু-শাস্ত্র বলেন, যে, মানসিক শক্তি ঐশিক ক্ষমতার অংশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। যিনি যে পরিমাণে এই শক্তি সঞ্চয় করিতে পারেন, তিনি ঈশ্বরের নিকট ততই অগ্রসর হইতে পারেন। মানবজীবনে ঈশ্বরলাভ ভিন্ন আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। যে দিক দিয়াই হউক না কেন—সকলেই এই একমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া চলিয়াছে। হিন্দু নিক্সাগ চাহে না—মোক্ষ চাহে না—মুক্তি কামনা করে না—ঐশ্বর্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করে না—তাহারা প্রার্থনা করে, যেন ভগবানের দর্শন লাভ তাহাদের অদৃষ্টে ঘটে। যাহারা ডাকিবার মত ডাকিতে পারে, তাহারা সাফলা লাভ করে; আর যাহারা ডাকিতে চাহে না, কিংবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাহারা বাইবেল-বর্ণিত অভিশপ্ত যিহুদীর আয় চিরজীবন নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া বেড়ায়।

“যদি ঈশ্বরলাভই মানবের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এই মহিম্বাসী শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা কি কর্তব্য নহে? এক্ষণে দেখা যাউক, কি করিয়া এই ক্ষমতার উপর আধিপত্য স্থাপন করা যাইতে পারে। জগতের প্রত্যেক পদার্থ বিশেষ সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করাই মানসিক উন্নতির ভিত্তি। শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে কি সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইলেই ইহার মনোদ্যাটন করিতে পারা যায়। শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মানসিক শক্তি প্রবল—শারীরিক শক্তি

দুর্বল ! মানসিক শক্তি দরিতে গেলে পৃথিবীতে সৃজন, পালন ও লয় কার্য সম্পাদিত করিতেছে । যদি মনুষ্য চিকিৎসক সাজিয়া ঔষধ প্রয়োগে রোগের উপশম করিতে পারে, তবে কে বলিতে পারে যে, সেই মনুষ্য জাগতিক শক্তির উপর কর্তৃত্ব করিতে অসমর্থ ! মানবের মানসিক উৎকর্ষতাসম্বৃত তিনটি শক্তিময় পদার্থের সমষ্টিতে, মানসিক শক্তি সংগঠিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে, প্রথম চিন্তাশক্তি—দ্বিতীয় একাগ্রতা—তৃতীয় মানসিক দৃঢ়তা । আনাদের শাস্ত্র বলেন যে, ঈশ্বরের তিনটি শক্তি প্রত্যেক জীবে সমভাবে বর্তমান আছে । এই তিনটি শক্তি যথাক্রমে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি । পূৰ্বোক্ত ত্রিবিধ শক্তি ইহাদের নামান্তর মাত্র । মানবের মন কখন স্থির থাকিতে পারে না । এই মনের প্রয়োজনের জন্ত (অর্থাৎ যখন মন কোন চিন্তা না লইয়া থাকিতে পারে না) যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে চিন্তা-শক্তি কহে । চিন্তাশক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া একাগ্রতার সৃষ্টি করে । এই একাগ্রতা হইতেই মনের দৃঢ়তা আসিয়া উপস্থিত হয় । মনে করুন, আপনার মনে কোন চিন্তার উদ্বেক হইল ; কিন্তু তাহা তখনই বিলীন হইয়া গেল—এই চিন্তা কখনও কার্য্যকরী হইতে পারে না ; কিন্তু এই চিন্তা যদি আবার মনে ক্রমাগত উদ্ভিত হইতে থাকে, তাহা হইলে একাগ্রতা জন্মিবে । এই দৃঢ় একাগ্রতা না হইলে মানসিক দৃঢ়তা আসিয়া উপস্থিত হয় না ।”

ভদ্রলোকটা বলিলেন, “এই দৃঢ়তা লাভ করিতে হইলে কি বিশেষ সাধনা করিতে হয়? নষ্টন করুন, আমি একটা জটিল মোকদ্দমার বিষয় চিন্তা করিতেছি এবং বেশ বুঝিতেছি, আইনের কূট তর্কে কিছুতেই ইহা দম্মাধিকরণে দাঁড়াইতে পারিবে না। এই সময় হঠাৎ একটা সূক্ষ্ম তথ্য আমার মস্তকে উদ্ভিত হইল। আমি কার্যক্ষেত্রে সেই সূক্ষ্ম তথ্যকে অবলম্বন করিলাম—আমার জয়লাভ হইল। এই চিন্তাশক্তি ধারণাশক্তি দৃঢ় হইলেই, কি মানসিক দৃঢ়তা আসিয়া উপস্থিত হয়?”

ভবরাম বলিলেন, “ঠিক তাহাই হয়। এই একত্র মিলিত ত্রিবিধ শক্তি একরূপভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট যে, একটীর অবর্তমানে অত্রের আবির্ভাব অসম্ভব। চিন্তা হইতে উৎসাহ আইসে—উৎসাহ হইতে বল আইসে এবং উভয়ের সমবায় গতি ও কার্য সম্পন্ন হয়। আপনি একটা কার্য করিতে করিতে চিন্তা করিতেছেন, এই চিন্তা দ্বারা আপনি উৎসাহ প্রাপ্ত হইবেন—তারপর বল পাইবেন। যদি আপনি সেই সময়ে শয়ন করিয়াও থাকেন, তাহা হইলে আপনার উঠিবার শক্তি আসিবে—এই শক্তি দ্বারাই গতি ও কার্য সম্পন্ন হয়। এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, চিন্তাশক্তি দ্বারা সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইতেছে। এখন একাগ্রতার কি প্রয়োজন, তাহাই আলোচনা করা যাউক। কার্য অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বেই একাগ্রতার প্রয়োজন। একাগ্রতা না থাকিলে আপনি কোনও

কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন না। বৈষয়িক কার্য সম্পন্ন করিতে হইলে, যখন একাগ্রতার প্রয়োজন, তখন ভগবানের দর্শন লাভ কিংবা মোক্ষলাভ করিতে হইলে, কি প্রকার একাগ্রতার আবশ্যক, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। এই একাগ্রতা লাভ করিবার জন্য যোগি-ঋষিগণ কঠোর তপস্যা করিতেন। অর্জুনের একাগ্রতা ছিল বলিয়াই তিনি ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যের নমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। লক্ষ্যভেদের কথা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একাগ্রতা ছিল বলিয়াই অর্জুন “নরনারায়ণ” রূপে পূজিত হইয়াছিলেন। একাগ্রতা কার্যসিদ্ধির একমাত্র সোপানস্বরূপ। চিন্তাশক্তিকে মানসিক দৃঢ়তার অধীনে রাখিতে পারিলেই কার্যসিদ্ধি হইবে এবং মানসিক দৃঢ়তার দ্বারা চিন্তাসকল নির্দিষ্ট স্থানে প্রেরিত হয়—ইহাই মানসিক দৃঢ়তার কার্য। এইরূপে চিন্তাশক্তি, একাগ্রতার দ্বারা রক্ষিত ও বর্দ্ধিত মানসিক দৃঢ়তার দ্বারা গলিত হইয়া, এরূপ অপরিমিত দৃঢ়শক্তি সম্পন্ন হয় যে, তখন কোনও পার্থিব বস্তু বা দূরস্থান তাহার কাঁধের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। একটা উদাহরণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। একদিন আমি গৃহে বসিয়া মনে মনে মনে চিন্তা করিতেছি যে, “ব্রাহ্মণ-নভার” কোনও কার্যপদ পাইলে আমি কৃতার্থ হইব। এই চিন্তাটা কেন যে তখন হঠাৎ আমার মনোমধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল,

তাহা বলিতে পারি না। তারপর এক পত্র ঠিক সেই সময়ে ডাকযোগে আসিয়া উপস্থিত হইল। পত্রে লেখা ছিল আনি “ব্রাহ্মণ সভার” কোষাধ্যক্ষপদে মনোনীত হইয়াছি। আনি ভাবিতে লাগিলাম, মানসিক শক্তির ইহা একটা শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। মানসিক শক্তি সকলেরই আছে, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কোন কোন দিন হয় ত প্রাতে উঠিয়া চারিদিকে আনন্দের চিহ্ন দেখিয়াও মনে কেনন একটা আশঙ্কার উদয় হয়, ঠিক সেইদিনই কোথা হইতে এক অতকিত বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ দুঃখের চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও হয় ত কোন কোন দিন সুখলাভ করিতে পারা যায়। মন পূর্ব হইতেই সুখ ও দুঃখের কথা জানিতে পারে। মনের অগোচর কিছুই থাকে না। এই সুখ ও দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতাকেই মানসিক শক্তি বলে। এই শক্তির দ্বারা আমরা পরের ও নিজের চিন্তাসকল বুঝিতে সমর্থ হই। যদি আমরা চিন্তাশক্তিকে আমাদের মানসিক দৃঢ়তার দ্বারা পরিচালিত না করি, তাহা হইলে মন হইতে উৎপন্ন সেই চিন্তা, যে কোন ব্যক্তির নিকট চলিয়া যায়, তাহাতে আমাদের ও অপর ব্যক্তির যে কত ক্ষতি হয়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

“আপনি যাহাকে সন্ন্যাসিরূপে দেখিয়াছেন—আমার সেই গুরুদেব বহু তপস্তার ফলে এই শক্তি লাভ করিয়াছেন।

তপস্যার গতি অতি সূক্ষ্ম । কোনও বংশে একটী তপস্বী ব্রহ্মচারী জন্মগ্রহণ করিলে সেই বংশ পরম পবিত্র হয় । তপঃপ্রভাবে ভূত, ত্রিমাৎ ও বর্তমান ত্রিকাল তপস্বীদিগের নিকট অবিদিত থাকে না ।

“গুরুদেব বলিয়াছেন যে, কোন কার্য্য করিবার পূর্বে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা করিয়া কর্তব্য-কর্ম্ম অগ্রে মনে দৃঢ় করিতে হইবে । অপরিসীম ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য-সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । কোনও কার্য্যে কখনও উৎসাহ-হীন হইতে নাই । কোনও কার্য্য কিংবা কার্য্যের স্থির সিদ্ধান্ত করিতে অপর কোন ব্যক্তিকে সাহায্যার্থ আহ্বান না করিয়া নিজের বিবেক ও ভগবৎদত্ত শক্তি দ্বারা সম্পাদন করাই যুক্তিযুক্ত এবং এই আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই মানসিক শক্তি লাভ হয় । তিনি বলিয়াছেন যে, কতকগুলি নিয়ম পালন না করিলে মানসিক দৃঢ়তা লাভ করা যায় না । প্রত্যহ এই নিয়মগুলি সর্ব্বতোভাবে পালন করা আবশ্যিক । তিনি বলেন যে, (১) জীব মাত্রেই স্বীয় কার্য্যের কর্তা—এই প্রকার চিন্তা করিবে । জীব কখনও কোন কার্য্যে নিরুৎসাহিত বা উত্তেজিত হইবে না । (২) জীব কখনই রিপূর বশীভূত হইবে না । (৩) জীব কখনও কোন ব্যক্তি দ্বারা মনোভাব হৃদয়ে পোষণ করিবে না । (৪) কোনও কার্য্য ব্যস্তভাবে সম্পন্ন করিতে নাই । (৫) কোনও কার্য্য অসুষ্ঠি

হইবার পূর্বে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ করা উচিত নহে। (৭) কোনও কার্য অসম্পূর্ণ রাখিতে নাই। (৮) কখনও অপরের অপকারক কার্য করিতে নাই। (৯) কখনও কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিতে নাই।

“কথাগুলি খুব সহজ।” মানুষ একেবারে উচ্ছে উঠিতে পারে না। তাহা হইলে তাহার পদস্থলন হইবার সম্ভাবনা। অনেকই আপন ক্ষমতার অধিক কার্যভার গ্রহণ করিয়া শেষে সিদ্ধি লাভে হতাশ হন, কিন্তু যদি তিনি প্রথমেই আপন প্রথম কর্তব্য নিরূপিত করিয়া কার্যে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় সকল কার্যই সমাধা হইত। প্রধানতঃ কর্তব্যাকর্মের কোন স্থির সিদ্ধান্ত না থাকাতেই তাঁহাদের নৈরাশ হইতে হয়।

“বর্তমানে এই শক্তির সাধনা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। নরজগতে উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিতে মানসিক শক্তি ভিন্ন আর অন্য কোনও উপায় মানবের নাই। প্রত্যেক মনুষ্যই এই মানসিক শক্তি অধিকার করিয়া বাহাতে স্বাধীন হইতেও মহত্ব লাভ করিতে পারে এবং মানসিক, নৈতিক, জাগতিক ও শারীরিক শক্তিতে গঠিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্যত্বের আদর্শ দেখাইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। যদি কেহ এই পথে বাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উপরোক্ত নিয়মগুলি মানিয়া চলিলে অনেক সাহায্য পাইবেন।

“এখন প্রভাতের আর বিলম্ব নাই, আপনি গৃহে গমন করিয়া বিশ্রাম করুন । দারুণ উত্তেজনায় আপনার মস্তিষ্ক এক্ষণে বিকল হইয়াছে । আর কোনও কথা বলিবার প্রয়োজন নাই । আমার কনিষ্ঠ আপনাকে বাটী পৌছাইয়া দিবে । কল্যা দ্বিপ্রহরে বাহা হয় পুনরায় কথোপকথন হইবে :”

করণাময় একখানি শকট লইয়া আসিলেন—ভদ্রলোকটি প্রথমে কিছুতেই গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন না । পরে অনেক অহুনয়-বিনয়ে তিনি দুঃখিত-চিত্তে শকটারোহণে নিজ গৃহে গমন করিলেন ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

“দাদা ! আপনি আর চতুষ্পাঠীর জন্ত এত পরিশ্রম করিবেন না । আজ কাল আপনি এই কার্যো এরূপ ব্যস্ত থাকেন, যে প্রায়ই আপনার ভাগ্যে আহাৰ ঘটিয়া উঠে না । এ বয়সে এতটা পরিশ্রম আপনার দেহ সহ্য করিতে পারিবে কেন ? অহোরাত্র চতুষ্পাঠীর জন্ত চিন্তা ও পরিশ্রম করিতে করিতে আপনার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে । আজ কাল শরীরের দিকে আপনার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই । ঝামেরিয়া ও বৌদিদি সৰ্ব্বদাই আপনার জন্ত চিন্তা করিতেছেন ।”

“ভাই ! আমরা কৰ্ম করিতে সংসারে আসিয়াছি । মৃত্যুর পূৰ্ব্ব মুহূৰ্ত্ত পর্য্যন্ত যেন কৰ্ম করিয়াই দেহত্যাগ করিতে পারি । কৰ্ম ভিন্ন মানবের মুক্তি নাই । আসক্তিবশে সংসার ত্যাগ করিয়া কোন উচ্চ কৰ্মই করিতে পারিলাম না । সংসারে থাকিয়া মানুষের যে সব কৰ্ত্তব্য কৰ্ম নির্দিষ্ট আছে, তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলেও মানুষের মুক্তি হয় ; কিন্তু ভাগ্যদোষে অদৃষ্টে তাহাও বুঝি ঘটিল না । আমার জন্ত তোমরা চিন্তা কর কেন ভাই ? কালপূৰ্ণ হইলে, দেহ জীর্ণ হইলে, নববস্ত্র পরিধানের

গার আত্মা কৰ্মফলানুসারে অস্ত্র দেহ আশ্রয় করিবেই । তাহাতে আর শোক হুঃখ কি ভাই ? এক সঙ্গে থাকিবার যতদিন নিয়তি আছে, ততদিন এক সঙ্গে থাকিব । সময় হইলেই চলিয়া যাইতে হইবে । আমার জ্ঞাত তোমরা চিন্তা করিও না । ভগবৎ ইচ্ছায় জগতে সৰুলই ঘটতেছে । কাহার কিছু করিবার বা বাধা দিবার শক্তি নাই ।”

পূৰ্বপরিচ্ছেদ-বর্ণিত ঘটনার পর প্রায় তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে । এক দিন অপরাহ্নে ভবরাম ও করুণাময় উভয়ে বসিয়া উপরোক্ত কথোপকথন করিতেছেন । তিন বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, সংক্ষেপে তাহা এই পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিতেছি ।

ভবরাম প্রাচীন আদর্শে চতুশ্চাঠী স্থাপনের জন্ত এই তিন বৎসর প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন । দেশ বিদেশে ঘুরিয়াছেন । স্থানে স্থানে হিন্দু ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া অতীত ও বর্তমান ভারতের উন্নতি অবনতির আলোচনা করিয়া, চতুশ্চাঠী স্থাপনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়াছেন । ভাবী বংশধরগণকে সনাতন হিন্দু আদর্শে শিক্ষিত ও গঠিত করিতে পারিলে দেশের অভাব, দৈত্য, ব্যাধি, পীড়া কমিয়া যাইবে ; আয়ু, মেধা, বল বৃদ্ধি হইবে—ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি হইবে—অনাবশ্যক পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যয়বাহুল্যতা ঘটিবে না—ভিন্ন দেশের বিজ্ঞান-ব্যবধি

হিন্দুর পবিত্র দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে—এই সমস্ত বিষয়, যুক্তি ও অকাটা প্রমাণবলে ভবরাম তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের জ্ঞাত কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়াছেন। ষ্টি, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মচারী প্রভৃতি মহাত্মাদের সহিত সাংসারের জ্ঞাত দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। কিসে হিন্দুর মতি-গতি ফিরিবে, কি উপায়ে তাহাদের পিতৃ পিতামহের রীতি-নীতির প্রতি ভক্তি ফিরিয়া আসিবে, এই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা লইয়া কত বিনিম্ব-রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন। আমাদের দেশোৎপন্ন চন্দন ও পুষ্পের গন্ধে যে কমনীয়তা ও উপকারিতা আছে, শত সহস্র এসেন্সের শিশি তাহার তুলনায় যে কিছুই নহে, এই সমস্ত বিষয় বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবলে দ্বারে দ্বারে বুঝাইয়া বেড়াইয়াছেন। ব্রাহ্মণসন্তানগণকে দেবভাষা শিক্ষা দিয়া স্বধর্ম-পরায়ণ করিবার জ্ঞাত তাহাদের পিতা ও অভিভাবকগণকে কত প্রকারে বুঝাইয়াছেন।

ভবরাম তিন বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে স্থানে স্থানে দুই একটি আদর্শ চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু পূর্ণ মনোরথ হইতে পারেন নাই। ছাত্র পাইলে উপযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ মিলে না। কোন কোন চতুষ্পাঠিতে উপযুক্ত পণ্ডিত পাইয়াছেন কিন্তু সেখানে কেহই পুত্র-পৌত্রকে অধ্যয়ন করাইতে প্রীত নহেন; কারণ বর্তমান সময়ে বজর ও অধ্যাপনা দ্বারা বিশেষ

কিছু উপার্জন হয় না। ভবরাম দেশের যে প্রাচীন উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিতে প্রয়াসী, বিদেশী চাকচিক্যের মোহ ত্যাগ করিয়া সে আদর্শ হৃদয়ে ধারণা করিতে অনেকেই সমর্থ হইতেছে না। ভবরামের চেষ্টার বিরাম নাই—অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্ত অগ্রসর হইতেছেন।

ছয়মাস কাল নানা দেশ পর্গটন করিয়া ভবরাম গৃহে ফিরিয়াছেন। অত্যধিক পরিশ্রম, অনাহার, রাত্রি-জাগরণ, এবং হুশিভ্রাস তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইরাছে। দেশের লোকের মতি-গতি দেখিয়া, তিনি আরও হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি এখন সর্বক্ষণই আকাশের দিকে চাহিয়া থাকেন। গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বলেন—“গুরুদেব! আমার অদৃষ্টে বুঝি আর ব্রাহ্মণের উন্নতি—হিন্দুর সেই প্রাচীন ধর্মভাব, —হিন্দুর সংসারে সেই প্রাচীন রীতি-নীতি দেখা ঘটিল না।”

কৃষ্ণকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি লইয়া গোলযোগ, তিন বৎসরের মধ্যে আর একটি প্রধান ঘটনা। সেই এটর্নি ভদ্রলোকটি কামেরিয়ার সম্পত্তি কামেরিয়াকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্ত বাস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, ইহার একটা মীমাংসা হইলেই তিনি গৃহত্যাগ করিবেন; নচেৎ কঠোর রাজহস্ত গ্রহণ করিবেন। ভদ্রলোকটি সেইদিনই ককণাময়ের সহিত পরামর্শ করিয়া, কৃষ্ণকান্তকে বিষয় হইতে যে-দখল

করিবার জন্ত সমস্ত আয়োজন করিয়া ফেলিলেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিবার জন্ত কৃষ্ণকান্তকে নোটিশ দেওয়া হইল। যাহা করিলে কৃষ্ণকান্ত সম্পত্তির আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন, সেই সমুদয় কারণ বিস্তারিতভাবে নোটিশে প্রকাশ করা হইল।

পাশও কৃষ্ণকান্ত কর্তৃক জ্যেষ্ঠের অপমানের কথা করুণাময় মুহূর্তের জন্তও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনি কি করিয়া কৃষ্ণকান্ত ও তাহার ধর্মজ্ঞানহীন পিতাকে পথের ভিখারী করিয়া, হৃদয়ের আলা নিবারণ করিবেন, তাহাই তাহার ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠিল। করুণাময় সেইদিনই পিতাপুত্রের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। বিষয় লাভের স্পৃহা করুণাময়ের মনে তিলান্বিতের জন্তও স্থান পাইল না।

করুণাময় যাহা যাহা করিয়াছেন, সমস্তই অগ্রজকে জানাইলেন। ভবরাম, করুণাময় ও ভদ্রলোকটিকে নিকটে বসাইয়া স্নেহভরে বলিলেন—“এরূপ উদ্বোধন-আয়োজনের কোনই আবশ্যক নাই। মা বামেরির অর্থেরও কোন প্রয়োজন নাই। মা আমার আবার অবনতির পথে ফিরিয়া আসিতেও ইচ্ছুক নহেন। আমি যাকে এই সম্পত্তির কথা বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি রোদন করিতে করিতে বলিলেন—“বাবা! কেন আমাকে অর্থের স্তূপে পড়িয়া ময়লা মাটি মাখিতে বলিতেছেন?” আব

আমি মাকে জোর করিয়া কোন কথা বলিতে পারিলাম না, মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম । মা আমার স্বর্গের পবিত্র পারিজাত পুষ্প—ভগবানের চরণে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন । পাখি বন-সম্পত্তির মলিনতা স্পর্শ করিলে, ভগবানের চরণে তিনি স্থান পাইবেন না । এরূপ গহিত-কার্য্য তোমরা হস্তক্ষেপ করিও না—অপরাধ হইবে ।

“যাহা ভগবৎলীলায় ঘটে ঘটুক । সংসারে ত্যাগেই পুণ্য—গ্রহণে পুণ্য নাই । উহাদের নিকট গ্রহণ করিলে লাভ নাই, বরং ক্ষতি আছে ; কিন্তু উহাদিগকে ত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই—লাভ আছে । গ্রহণের জন্ত পুরুষকার প্রয়োগের প্রয়োজন নাই । যদি অর্থ-সম্পত্তি বামেরিয়া-মায়ের আবশ্যক হইত, চেষ্টা করিলে দোষ ছিল না । বিনা কারণে, বিনা প্রয়োজনে কৃষ্ণ-কান্তকে পথের ভিখারী করিবার প্রয়োজন কি ? কাল পূর্ণ হইলে সকলেই নিজ নিজ গহিতকার্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবে । প্রাশ্চিত্ত আপনা হইতেই হইবে ।”

কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটি ভবরামের পা ছুইখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন । বোধ হয় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইনি মানুষ—না দেবতা ? করুণাময় আর কোন কথা কহিল না ।

ভদ্রলোকটি সেইদিনই আফিসের কাগজপত্র দেখিয়া যাহা

অন্নায় ও অধর্মপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিজ সম্পত্তি হইতে তাহাদিগকে তাহা প্রত্যর্পণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। স্ত্রী-পুত্রের জন্ম বৎসিকিৎ রাখিয়া সমস্ত সম্পত্তি পর সেবায় অর্পিত করিলেন। সতী হেনাঙ্গিনীর পঞ্চাশ সহস্র টাকা মূল্যের অলঙ্কার-গুলি করুণাময়ের হস্তে দিয়া হেনাঙ্গিনীর অন্তিম বাক্যানুযায়ী স্বামী-পুত্রহীন নিরাশ্রয়াদের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্ম অনুরোধ করিলেন।

ভদ্রলোকটী তিন দিনের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া ভবরামের চরণে আসিয়া প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন, “আশীর্বাদ করুন, যেন কৃতকর্মের মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারি।”

ভবরাম তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া বলিলেন—“সত্যই কি তুমি সংসার ত্যাগ করিবে?”

ভদ্রলোকটি বলিলেন, “আমার পক্ষে সংসার এখন বিষের আগার! বিষের আলায় আমি দিবারাত্র ছট্‌কট্‌ করিতেছি; মানুষের মুখ আমি আর দেখিব না, কিংবা আমার এই পাপমূর্তি আর কাহাকেও দেখাইব না। ত্যাগ সেইদিনই করিয়াছি। তিনটা দিন কেবল নরক-যাতনা ভোগ করিতেছিলাম। আমি অবশিষ্ট জীবন ভগবৎ আরাধনা করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তাহাও না পারি, অরণ্যে অরণ্যে ঘুরিব—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিব।

অধর্মার্জিত অর্থে পুষ্ট দেহ হয় শুষ্ক হইয়া যাক, না হয় ইহা ভক্ষণ করিয়া বাঘ, ভেক, শূগাল, কুকুর ক্ষুধিবৃত্তি করুক। যে পাপ অর্জন করিয়াছি, তাহার ভোগ কত জন্ম ভুগিতে হইবে জানি না। আর আমাকে পাপের বোঝা ভারী করিতে আদেশ করিবেন না।”

ভবরাম সমস্ত কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “ভগবান্ তোমায় শাস্তি দান করুন।”

ভদ্রলোকটা চলিয়া গেলেন। ভবরাম এখন আর কারবারাদি কিছুই দেখেন না। সংসারে থাকিয়া উদাসীনের জায় দিন বাপন করিতেছেন। সাংসারিক বা কারবারাদির কোন কথা করুণাময় জোষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলে ভবরাম বলেন—

“ভাই! আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। উপরের দিকে চাহিয়া গাহা কর্তব্য, সম্পন্ন করিয়া বাও—ধর্মের প্রতিকূলতাচরণ কখন করিও না। আমার যে কয়টা গণা দিন ছিল, তাহা শেষ হইয়া আসিয়াছে। মায়ার শৃঙ্খল পরিয়া বাইতেছি, আবার শৃঙ্খল পরিয়াই আসিতে হইবে। জানি না কতদিনে শৃঙ্খলমুক্ত হইতে পারিব।”

করুণাময় সেইদিন হইতে ভবরামকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না। কেবল সশঙ্কিতচিত্তে দাদার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। অদূরে গাঢ় অন্ধকার দেখিয়া

করুণাময় প্রতি মুহূর্তে শিহরিয়া উঠিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিত। দাদা ভিন্ন করুণাময় এ জগতে আর কাহাকেও জানিত না।

নবম পরিচ্ছেদ ।

আরও এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে । ভবরামের সে তেজ, সে শক্তি, সেই উৎসাহ, চক্ষের সে উজ্জ্বল দীপ্তি আর নাই । দেহ জীর্ণ, শীর্ণ, স্থবিরের দ্যায় হইয়া উঠিয়াছে । এ অবস্থাতেও কিন্তু তাঁহার চতুষ্পাঠীর জন্ত চিন্তা ও পরিশ্রমের বিরাম নাই ।

প্রথম জীবনে ভবরাম একজন পাকা সংসারী ছিলেন । বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া গড়ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছিলেন । প্রথম জীবনে বিলাসব্যাধির আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন নাই । তখন হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিয়াছিল । চল্লিশ বৎসর বয়সের পর তিনি গুরুদেবের দর্শন পান । বাল্যকাল হইতে তাঁহার ব্যাকুলতা ছিল বলিয়াই হিন্দুধর্মের জ্যোতিঃ মধ্যজীবনে দেখিতে পাইয়াছিলেন । হিন্দুধর্মের স্নিগ্ধ দীপালোক পাঠ্যাবস্থায় বালকদের নয়ন-সমক্ষে না ধরিলে,—হিন্দুধর্মের প্রাচীন রীতি-নীতি দ্বারা বালকগণের অস্থি মজ্জা গঠিত করিতে না পারিলে,—হিন্দু-শাস্ত্রগ্রন্থের সাত্ত্বিক জ্ঞান হইতে বালকগণকে বঞ্চিত রাখিলে,—ভগবৎভক্তির বীজ সুকুনীর বাগ্যদ্বন্দ্বের অঙ্কুরিত

না করিলে,—হিন্দুর সংঘ সাধনায় বালকগণকে অভ্যস্ত না করাইলে,—বিলাস-ব্যাপির অপকারিতা বাল্যকাল হইতে বালকগণকে বুঝাইয়া না দিলে,—ব্রাহ্মণ সন্তানগণকে বাল্যকাল হইতে প্রাণায়াম ও যোগের মৰ্ম উপলব্ধি করিতে না দিলে,—ভাবী-জীবনে অভাব-রক্ষণীয় গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জ্ঞান, পোষাক-পরিচ্ছদের বাহুল্যতার অপকারিতা বাল্যকাল হইতে বালকগণকে বুঝিবার অবসর না দিলে অথবা আদর্শ চতুষ্পাঠিতে সেইরূপ শিক্ষিত না করিলে,—হিন্দুর পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর হয়, তাহা ভবরাম নিজ জীবনে বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন । এই জন্তই তিনি ভগ্নদেহ, ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও ভগ্ন-মন লইয়া এই শেষ জীবনেও দেশে দেশে আদর্শ হিন্দু চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিতে ও তাহার উপকারিতা দেশবাসীকে বুঝাইতে প্রাণঘাতী পরিশ্রম করিতেছেন । ভবরাম যদি প্রাণায়ামে অভ্যস্ত না হইতেন, যোগ ধর্ম যদি তাঁহার সাথী না হইত, তাহা হইলে বহু বৎসর পূর্বেই তিনি সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতেন । দেহের শক্তি যে কিছুই নহে, মনের বলই যে একমাত্র শক্তি—এখনও ভবরাম তাহা সংসারকে দেখাইতেছেন । তিনি এখন যোগ সাধনার পর মধ্যরাত্রে কেবলমাত্র কয়েক বিন্দু জাহ্নবীর পুত-সলিল পান করিয়া থাকেন । তত্রাচ ভারতের পূর্ব আদর্শ স্থাপনের জন্ত এখনও ভবরামের পরিশ্রমের বিরাম নাই ।

এইরূপ অবস্থায় দেখিতে দেখিতে আরও এক বৎসর অতীত হইয়া গেল । ভবরাম একবারে শক্তিহারা হইয়া পড়িলেন । করুণাময়ের হৃদয়ে দাবানল জলিয়া উঠিল । করুণাময় ব্যাকুল হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে দাদাকে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন । ভবরাম হাসিয়া বলিলেন, “ভাই ! শেষাবস্থায় আমাকে আর কেন মানুষের হাতে তুলিয়া দিতেছ ? জীবনীশক্তি ফিরাইবার কি মানুষের শক্তি আছে ? আমার সময় হইয়াছে । সময় হইলে কি মানুষ কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে ? অপরে এ কথা বলিতে পারে, হিন্দুর এমন কথা বলিতে নাই । ভাই ! ঐশিক-শক্তিতে সকল অবস্থায় বিশ্বাস রাখিও ।

“ভাই করুণাময় ! আমার শেষ সময় হইয়া আসিয়াছে, তোমাকে দুই একটি কথা বলিবার আছে । তোমার শিশু-ভ্রাতৃপুত্র দুইটির আমি কোনদিন আশা রাখি নাই । উহারা যে জীবিত থাকিয়া কোনদিন জগতের উপকারে আসিবে, সে ভরসা অল্প । ভগবানের তাহা অভিপ্রেত হইলে, প্রথম ভ্রাতৃপুত্র-টিকে তোমার হৃদয়ে শেল দিয়া অকালে গ্রহণ করিতেন না । মঙ্গলময় তিনি, যাহাতে জীবের মঙ্গল নিহিত থাকে, তাঁহার ইচ্ছা-বশে তাহাই জগতে সংঘটিত হয় । তবে যদি আমাদের পুণ্যাত্মা পূর্বপুরুষগণের আশীর্বাদ ও ভগবানের ইচ্ছায় উহারা জীবিত

থাকিয়া, পূৰ্ণপুরুষগণের নাম, কীর্তি ও সম্মান বজায় রাখিতে পারে, তবে তাহা দেবতার আশীৰ্বাদ জানিও। আমার অবর্তমানে উহাদের প্রতি স্নেহপরবশ হইক। কখনও বিলাসিতার ছায়া স্পর্শ করিতে দিও না। আমার জীবনের বাহা সকল ছিল, তাহা তুমি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিও। প্রাচীন হিন্দু রীতি-নীতি অনুসারে উহাদের অস্থি মজ্জা গঠিত করিতে চেষ্টা করিও। আমাদের বংশে কেহ যেন কখনও সনাতন প্রথার পরিবর্তন না করে। তাহা হইলে বংশের পতন অবশ্যস্বাভাবী।

“সাগরবালা তোমার পূজনীয়া মাতৃ-স্বরূপিনী হইলেও অজ্ঞান জীলোক বলিয়াই চিরদিন মনে করিবে। তাহার পিতৃমাতৃকুলে স্বীকারা আছেন, তাঁহারা উন্নত প্রকৃতির নহেন। তাঁহারা সকলেই সঙ্কীর্ণমনা। সাগরবালার মন উন্নত হইয়া ঈশ্বরাভিমুখীন হইয়াছে, ইহা আমার জীবনব্যাপী চেষ্টার ফল। উহাদের বংশের কেহই হিন্দুভাবাপন্ন নহেন এবং হিন্দুর প্রাচীন রীতি-নীতি বজায় রাখিতেও তাঁহারা কখন সচেষ্ট নহেন। তাঁহাদের সহিত সাগরবালার মেশামিশি যতই অল্প হইবে, ততই সাগরবালা উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। আমার অবর্তমানে এই কথাটি চিরদিন মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে।

আর ক্যামেরিয়া—মা ক্যামেরিয়া আমাদের গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপিনী। তিনি নিজের উন্নতির পথ নিজেই দেখিয়া লইয়াছেন।

তঁাহার সহিত পরামর্শ বাতীত কোন কাজ কখন করিও না । মা কান্নেরিয়া আমার যে কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক হইবেন, প্রাণান্তেও সে কার্য্য করাইতে কখন তঁাহাকে বাধ্য করিও না । আমার মৃত্যুর পর মা কান্নেরিয়া যেক্রপ অবস্থায় যেখানে থাকিলে সুখী হন, তদবস্থাতেই তঁাহার থাকিবার সুবিধা করিয়া দিবে । স্মরণ রাখিবে, তঁাহার মতের বিরুদ্ধাচরণ করা তোমার অগ্রজের নিষেধ রহিল ।

“ভাই করুণাময় ! আমাদের ভবিষ্যৎশীর্ষদের কে কিরূপ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা জগদ্ব্যবহায় জানেন । ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত থাকে, তাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য । কেহ হয় ত সংসর্গ-দোষে প্রাচীন হিন্দু রীতি-নীতির অবমাননা করিবে,—কেহ হয় ত দেব-দ্বিজের ভক্তি রাখিবে না—কেহ হয় ত হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থের মর্যাদা পালন করিবে না,—কেহ বা ভ্রাতৃপ্রেম হইতে বঞ্চিত থাকিবে, জ্বীলোকেরা হয় ত জ্বী-স্বভাব বশতঃ পরস্পর হিংসা করিবে, কেহ বা গুরুজনের অবাধ্য হইবে, আবার কেহ হয় ত হিন্দুর একান্ববর্তী-প্রথার প্রতি ঘৃণা করিবে । ভাই করুণাময় ! জ্বীস্বভাবকে আমি অত্যন্ত আশঙ্কা করি—স্বভাবতঃই উহার সঙ্কীর্ণমনা । অনেক সময় উহাদের প্ররোচনাতেই হিন্দুর শাস্তিপূর্ণ সংসারে অশান্তির উদ্ভব হয়—হিন্দুর সোণার সংসার ছারখার হইয়া যায় । উহার ভিন্ন বংশের,

ভিন্ন গোত্রের, নিজ নিজ পিতামাতার প্রকৃতি লইয়া আমাদের বংশে আসিতেছে ও আসিবে। আমরা পিতা মাতা হইতে যে শিক্ষা, দীক্ষা, নন ও অন্তঃকরণ পাইয়াছি, উহাদের সহিত সেগুলির পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। আমরা আমাদের বংশের সকলকে যেরূপ জন্মবধি “আপনার” বলিয়া জানি বা অস্থিমজ্জা ও মনের সহিত জড়িত করিয়া ফেলিয়াছি, উহারা পরের ঘরে আসিয়া প্রথমে তদ্রূপ পারে না—আবার কেহ কেহ চিরজীবনেও পারে না। অনেক স্ত্রীলোকই স্বামী ও পুত্রকন্যাকে, বড় জোর তাহার দেবর ভাস্করকে আপনার বলিয়া মনে করে; কিন্তু দেবর বা ভাস্করের স্ত্রীকে তাহারা “আপনার” করিতে পারে না। এই জগুই হিন্দুর সংসারে অশান্তির আবির্ভাব হয়। একপস্থলে স্ত্রীলোকের সহিত স্ত্রীলোকেই ঘেঁষ, হিংসা ও কলহ করে। স্ত্রীলোকে দেবর ভাস্করের উপর হিংসা করিতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং তাহারা তাহাদিগকে স্নেহ করে, ভালবাসে ও হৃদয়ের সহিত সম্মান করে। কেবল তাহাদের সহধর্মিণীদের সহিতই ঘেঁষাঘেঁষী ও কলহ হইয়া থাকে। সংস্কারের অভাব ও মনের সঙ্কীর্ণতাই ইহার প্রধান কারণ। ইহার জগু স্ত্রীলোকের পিতা মাতারাই অধিকতর দায়ী। হিন্দুর একান্নবর্তী সংসার যে স্বর্গের স্থায় সুখশান্তিপূর্ণ, জগজ্জননী লক্ষ্মী যেখানে সুখে বাস করেন,—ভগবানের আশীর্বাদ একান্নবর্তী সংসারে

সে অহরহঃ বর্ষিত হয়, একথা গ্রন্থনকার বিদেশীভাবাপন্ন, উন্নত, শিক্ষিত হিন্দু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। একজনের রোগ-শয্যাপার্শ্বে পঞ্চাশ জন আসিয়া কাতর নয়নে মুখের দিকে চাহিবে, ইহা স্মথের,—না পীড়ার সময় একমাত্র তাহার সহধর্ম্মিণী নিরাশ্রয় হইবার আশঙ্কায় রোদন করিবে, ইহা স্মথের? কোন্টি স্মথের একবার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি! একা চিরজীবন অথো-পাচ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করিয়াছে, কিন্তু বান্ধকো তাহার উপার্জন-শক্তি রহিল না! সংসার-সাগরে কূল-কিনারা দেখিতে না পাইয়া হতাশ অন্তরে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। বান্ধকো সাহায্য পাইবার মত কাহাকেও দেখিতে পাইল না, ইহা ভাল, না চিরজীবন পাচজনকে প্রতিপালন করিয়াছে, যথা-সাধ্য একান্নবস্ত্রী-সংসারে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, বান্ধকো তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া পরিশ্রম হইতে অবসর গ্রহণ করিল,;ইহা ভাল? যে দিক্ দিয়াই চিন্তা কর, একান্নবস্ত্রী-প্রণার মত হিন্দুর সুন্দর প্রথা আর কিছু নাই! ইহা যোগি-ঋষিগণের মস্তিষ্কপ্রসূত।

“ভাই! করুণাময় এই সনত্ত বিষয় ও আরও নানারূপ চিন্তা করিয়া আমি একখানি উইল প্রস্তুত করিয়াছি। এই উইলের বলে আমাদের ভবিষ্যৎসংশয়েরা কেহ কখন বিপথগামী হইতে পারিবে না এবং আমাদের বংশে কেহ কখন একান্নবস্ত্রী-প্রথা

নষ্ট করিতে পারিবে না। হিন্দুর এমন দিন আসিবে, যখন প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থানী আমার এই উইলের অনুকরণে বংশের শাস্তি, হিন্দুয়ানী ও সংসারে একান্নবর্তী-প্রথা রক্ষার জন্ত চরমপত্র প্রস্তুত করিয়া যাইবেন। তাই! উইলখানি লেখা আমার শেষ হইয়া গিয়াছে। তোমাকে শুনাইবার জন্ত কাছে রাখিয়াছি।”

ভবরাম উইলখানি পড়িতে লাগিলেন। করুণাময়ের চক্ষু দিয়া জলধারা গড়াইতে লাগিল।

(উইলের মর্ম্ম)

১। আমার স্বাবর অস্থাবর যাহা কিছু সম্পত্তি সমস্তই আমার মৃত্যুর পর দেবতার সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। কেহ কখন দান, বিক্রয় বা বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ করিতে পারিবে না। আমার সম্পত্তিগুলির বর্তমান আয় বাহা আছে, পরে যাহা বৃদ্ধি হইবে, খরচ বাদে সেই আয় দেবতার নামে গচ্ছিত থাকিবে।

২। কারবারাদির আয় হইতে হিন্দুর প্রাচীন-রীতি-নীতি অনুসারে সকলের ভরণপোষণ নিৰ্দ্ধারিত হইবে। যিনি বা ঋাহারা একান্নবর্তী-সংসারে থাকিতে অনিচ্ছুক হইবেন, তিনি বা তাঁহার সংসার হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইবেন না। গৃহকর্ত্তা তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবেন। হিন্দুতাবাদ

হইয়া প্রাচীন রীতি-নীতি না মানিলেও গৃহস্থামী তাঁহাদিগকে গৃহে স্থান দিবেন না ।

৩। আমার বংশের কেহ কখন কাহারও নিকট চাকরী গ্রহণ করিতে পারিবেন না, যিনি করিবেন সংসারে তাঁহার স্থান হইবে না। তিনি আমার বংশের সকলের সহিত সর্বপ্রকার সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন। কেহ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন না।

৪। সকলকেই গৃহস্থামীর আদেশ অনুসারে চলিতে হইবে। সংসারের জী, পুরুষ, বালক, গৃহস্থামীর বিনা অনুমতিতে স্বাধীনভাবে কেহ কখন কোন কার্য করিতে পারিবেন না। যিনি করিবেন, তাঁহাকে গৃহস্থামী পাত্ৰানুসারে ও অপরাধের তার-তম্যানুসারে এক দিন, দুই দিন বা তিন দিন পর্য্যন্ত অনশনে থাকিয়া আমার দেবগৃহে ভগবৎ আরাধনার রত রাখিবেন। অথবা বিবেচনা করিলে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করাইতে পারিবেন।

৫। আমার বংশে কেহ কখন চৰ্ম্মপাত্তকা ব্যবহার করিতে পারিবে না। অথবা জীপুরুষ কেহ কখন বহুমূল্য অনাবশ্যক পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে পারিবে না। মংস্ত্র, মাংস এবং হিন্দ্র অথবা ও অম্প্র কোন জিনিষ ব্যবহার বা স্পর্শ করিতে পারিবে না, যিনি করিবেন তিনি বংশ হইতে ত্যক্তরূপে পরিগণিত

হইবেন। সকলকেই সাহসিক আহার ও গৈরিক বসন পরিধান করিতে হইবে। প্রাতঃসন্ধ্যা, দেবকার্য্য ও দীন দুঃখীর সেবার সকলকেই সাধ্যমত রত থাকিছে হইবে।

৬। নারিকেল ডাঙ্গার এই ত্রিতল বাসভবন “রামনয় আশ্রম” নামে স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ইহাও অত্যাশ্চর্য্য সম্পত্তির দ্বারা কেহ কখন দান বিক্রয় বা ব্যক্তিবিশেষে বিভাগ করিতে পারিবেন না। এই আশ্রমে পূজা, অর্চনা, অতিথি-সেবা ও হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য সম্পন্ন হইবে। আমার বংশের সকলেই এখানে বাস করিয়া ধর্ম্মকার্য্যের অহুষ্ঠান করিতে পারিবেন, কিন্তু কেহ কখন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিতে পারিবেন না। এই অট্টালিকা-সংলগ্ন গৃহে ও ভূমির বাহ্যে আয় হইবে, তাহা এই “আশ্রম ওহবিলে” জমা হইবে। ভবিষ্যতে এই আয় হইতেই “রামনয় আশ্রমের” ভগ্ন অংশ নিৰ্ম্মাণ, আবশ্যকমত নূতন গৃহাদি নিৰ্ম্মিত, এই আশ্রম-সংলগ্ন ভূমি ক্রয় করিয়া ইহার বিস্তৃতি-বৃদ্ধি, আবশ্যক হইলে অতিথি-শালা, পূজাগৃহ, আত্মর-আশ্রম, চতুষ্পাঠী ও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের বিস্তৃতি ইত্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হইবে। “রামনয় আশ্রমের” আর গৃহস্থামী কখন সংসারে ব্যয় করিবেন না।

৭। আমার মৃত্যুর পর আমার প্রাণস্বরূপ অমূল্য কল্পনা-ময় এই উইলের উপদেশানুসারে গৃহাশ্রম ও কার্য্যকারীদের

বন্দোবস্ত করিবেন। তাহার উপর কাহারও কর্তৃত্ব চলিবে না।

৮। গৃহস্থাত্মনের যিনি জ্যেষ্ঠ, ভবিষ্যতে তিনিই গৃহস্থানী হইবেন এবং যিনি জ্যেষ্ঠা থাকিবেন তিনিই গৃহকর্ত্রী হইবেন। গৃহকর্ত্রী গৃহস্থানীর আদেশ অনুসারে চলিবেন।

৯। বংশের ভাবী বংশধরগণকে আমার স্থাপিত “আদর্শ চতুষ্পাঠীর” নিয়মানুসারে থাকিয়া ষষ্ঠ বিংশতি বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইবে। তাঁহারা গুরু সন্যাসে বাস করিবেন, গৃহে বাস করিতে পারিবেন না। ষষ্ঠবিংশতি বর্ষের পর সংসার আশ্রমে আসিবেন। ইহার পর গৃহস্থানী কর্ত্তবা মনে করিলে, তাহাদের পরিণয়াদি কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

১০। ভাবী বংশধরগণ সকলেই প্রাণায়াম ও যোগসাধনে অত্যন্ত হইবেন—নচৎ সংসার আশ্রমে গৃহস্থানী স্থান দিবেন না।

১১। ভাবী বংশধরগণকে গৃহস্থানী উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া কাহাকেও চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের পদে, কাহাকেও অতিথি-সংকার রত, কাহাকেও আতুর-আশ্রমে, কাহাকেও দীন-দুঃখীর সেবায়, কাহাকেও বিষয় ও কারবারাদি সংরক্ষণে নিয়োজিত করিবেন।

১২। আমার জন্মভূমির যে স্থলে জনক-জননীর পবিত্র স্মৃতি-স্মারক মন্দির প্রস্তর প্রোথিত করা হইয়াছে, সেই স্থলে কারবারাদির আর হইতে একটি আশ্রম ও চতুষ্পাঠী নির্মিত হইবে। তথায়

যে রূপ কাকালী ভোজন, দীন-দুঃখীর সেবা কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা কখন বন্ধ হইবে না। প্রতি বৎসর আমার বংশের সকলে গিয়া আমাদের পুণ্যস্থান জনক জননীকে হৃদয়ের সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিবেন। তখন “রামময় আশ্রমে” আমার বংশের কেহই থাকিতে পাইবে না। এই সম্মান-প্রদর্শন আমার বংশের আবালবৃদ্ধবনিতা পুণ্য ও পবিত্র কার্য্য বলিয় মনে করিবে।

১৩। সাগরবালা সম্মান-জননী ও আমার সহধর্ম্মিণী। ইহার প্রতি সম্মানার্থ দেবর করুণাময় তীর্থ-দর্শন, বিধবার ব্রত ও ব্রহ্মচর্য্য পালন, আতুর দীন-দুঃখীর সেবা, দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী পূজা, রাস, কাকালী ভোজন, বৃক্ষ, জলাশয়, শিব-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যাহা করিবার ইচ্ছা হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

১৪। আমার সম্পত্তি ও কারবারাদির আয় হইতে এঁা উইলের লিখিত ও সংসার আশ্রমের অজ্ঞাত ব্যয় নির্বাহ করিয়া যাহা উর্বৃত্ত থাকিবে, তাহা হইতে দেব-সেবা বা দীন-সেবার ভা অল্প বিঘ্ন-সম্পত্তি বা ধর্ম্মাভ্যাসোদিত নূতন ব্যবসার সৃষ্টি হইবে।

ভবরাম আর পাঠ করিতে পারিলেন না। তাঁহার ক্ষীণ দেহাধিহীনোলে কদলীপত্রের মত কম্পিত হইতে লাগিল। মুখানি বিবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু সেই স্নান মুখের উপর কি যেন এ

দিব্য জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। এমনটি করুণাময় আর কোন দিন দেখেন নাই। ভবরামের চক্ষের পলক পড়িতেছে না। ভক্তিপূরিত অনিমেঘনয়নে ভবরাম যেন কাহার পানে চাহিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে ভবরাম করঘোড়ে কাহার স্তব করিতে লাগিলেন। দাদার ভাবান্তর ও মুখের দেবভাব দেখিয়া করুণাময় ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ভবরাম ভূমে নস্তক নত করিয়া বার বার কাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা গড়াইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মুখের জ্যোতিঃ আরও ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এখনও ভবরামের চক্ষের পলক পড়িল না। দৃষ্টি একদিকে নিবদ্ধ! জলধারার বিরাম নাই। বহুক্ষণ পরে চক্ষের পলক পড়িল, ভবরাম করুণাময়কে ইঙ্গিতে জানাইলেন, “আমাকে দেবগৃহে লইয়া চল।” কিয়ৎক্ষণ পরেই সেইস্থানে ঝানেরিয়া ও সাগরবালা ছুটিয়া আসিল। সকলেরই মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। কাহারও মুখে বাক্য নিঃসৃত হইল না। নন্দ্য যাতনা সকলেরই বাক্যের অতীত হইয়া উঠিল। কনিষ্ঠের স্বন্ধে ভর দিয়া ভবরাম দেবগৃহে উপস্থিত হইলেন। ভবরাম উইলখানি পাঠ করিতে করিতে ক্রান্তির দিবা কান্তি নয়ন সমক্ষে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি যেন ভবরামকে জানাইলেন, “যোগরত হও, ভগবানে

আত্মসমর্পণ কর। তোমার সুসময় উপস্থিত। সে সুসময় সমাগত হইবারও আর অধিক বিলম্ব নাই। ঐ দেহ একে একে তোমার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতেছে! অজ্ঞাত শক্তি তোমার কৰ্ম্মসূত্রগুলি একত্র করিয়া তোমার নব দেহ নিৰ্ম্মাণ করিতেছেন। ধ্যানে নিমগ্ন হও। তোমাকে সাবধান করিবার জন্য পূৰ্ব্বত গুহা হইতে ছুটিয়া আসিতেছি। তোমার মহান্ কৰ্ম্মফল সমাপ্তিতে যে দেহ নিৰ্ম্মিত হইতেছে, যাহাতে তুমি প্রবেশ করিবে, তাহাকে আর কাহারও সাবধান করিবার প্রয়োজন হইবে না। সেই সৰ্ব্বনিয়ন্তার চিন্তা ব্যতীত এখন আর কোন চিন্তা মনে স্থান দিও না। বোগে বসিয়া, হৃদয়-চাকলা দূর করিয়া, অকম্পিত দীপশিখার তায় মনকে ব্রহ্মের চরণে নিবদ্ধ কর।”

ভবরামের মুখ দিয়া আর বাক্য নিঃসৃত হইল না। তাঁহাদে সে দৃষ্টিও আর নাই। ভবরাম যোগাসনে উপবেশন করিলেন। মুখ গভীর, দেহ নিশ্চল, দিবা জ্যোতিতে মুখখানি উদ্ভাসিত। ওষ্ঠদ্বয় এক একবার মৃদু হাস্তে কম্পিত হইতেছে।

ঝানেরিয়ার চক্ষু দিয়া অজস্র জলধারা গড়াইতে লাগিল। সে ভারিতে লাগিল, একরূপ সময়ে এমন ভাবে, বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া বাবা ত কখন যোগাসনে উপবেশন করেন নাই! বাবার আঁচু মুখমণ্ডলে একরূপ পবিত্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল কেন? সতী সাগরবালা কিছু বুঝিতে না পারিয়াও ব্যাকুল হইয়া

উঠিলেন। বামেরিয়ার চক্ষে জলধারা দেখিয়া তাঁহার অন্তরায়া
কাঁপিয়া উঠিল। চক্ষে অঞ্চল দিয়া সাগরবালা রোদন করিতে
লাগিলেন।

করুণাময়ের হৃদয়ের ভাব লেখনীমুখে বাহির হইবার নয়।
কেহ যদি ভ্রাতৃভক্ত পাঠক থাক, কল্পনা-তুলিকায় করুণাময়ের
হৃদয়ের ভাব অঙ্কিত করিয়া দেখ। করুণাময়ের হৃদয়ের কোমল
অংশটুকু কে যেন ছিন্ন করিয়া লইতেছে; যন্ত্রণায় করুণাময়ের
নাভুভক্ত প্রাণ শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। করুণাময় ভাবিতে
লাগিল, “দাদার একুপ গম্ভীর মূর্তি, নিশ্চল অঙ্গ, মুখের দিবা
জ্যোতিঃ কোনদিন ত দেখি নাই। আজ দাদার একুপ দেবোপমা
মূর্তি দেখিতেছি কেন? আমাদের প্রতি দাদার সেই অগাধ,
অপরিমেয় স্নেহ-মমতার চিত্র মাত্র মুখখানিতে নাই। ভগবান!
একি করিলেন!! আমি যে সংসারে এতদিন কেবল দাদার স্নেহ
ভালবাসারূপ সংসার-সমুদ্রে মনের আনন্দে সন্তরণ করিতেছিলাম।
যে দিকে ইচ্ছা অবহেলে ভাসিয়া বাইতাম—ভুত ভবিষ্যৎ চিন্তা
করিতাম না; কেবল দাদার আদেশই আমার একমাত্র অবলম্বন
ছিল। সে আদেশ ছাড় কি অত্যাশ কোনদিন তাহার বিচার করি
নাই! দাদার আদেশ দেববাক্য বোধে শিরোধার্য করিয়া পালন
করিতাম মাত্র! ভাবিতাম, দাদার আদেশ ভৃত্যবৎ পালন করিবার
জন্তই সংসারে আসিয়াছি, ভাল মন্দ বিচার করিবার জন্ত আসি

নাই । এখন কাহার আদেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিব ? সংসারে স্বাধীনভাবে এ পর্য্যন্ত কোন কার্যাই করি নাই ! কি করিয়া ভয়সঙ্কুল সংসার-সাগরে পার হইব !

চিন্তার পর চিন্তা,—কত চিন্তা আসিয়া করুণাময়ের হৃদয় উদ্বেলিত করিতে লাগিল । করুণাময়ের চক্ষু পলকহীন, সেই পলকহীন চক্ষে অবিরাম অশ্রুধারা গড়াইয়া বক্ষঃস্থল প্রাবিত করিতেছে ! করুণাময়ের মনে হইল, একবার দাদাকে প্রাণের যাতন জানাই ! “দাদা” “দাদা” বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে গেল, কিন্তু করুণাময়ের কণ্ঠ কে যেন রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, করুণাময় ডাকিতে পারিল না । করুণাময় ভবরামের পা ছুঁনি বক্ষে ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহাও পারিল না ! ভবরামের কার্যো ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া করুণাময়ের বুঝি সাহস হইল না ! করুণাময় জ্ঞানশূণ্য হইয়া ভবরামের চরণতলে লুপ্তিত হইয়া পড়িল । অন্য সময় হইলে ভবরাম কনিষ্ঠের অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাদিতেন, করুণাময়কে বক্ষে তুলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতেন ; কিন্তু আজ ভবরাম যে গৃহে অতিপিক্রমে এত দিন বাস করিতেছিলেন, সে গৃহ ত্যাগ করিবেন, তাই মহাষাটকার আয়োজনে তিনি মহাবাস্ত । অপরদিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করিবার সময়ও তাহার নাই ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

সব ফুরাইয়া গেল ! ভবরামের আশা, উৎসাহ, শক্তি সবই অনন্তে লীন হইয়া গেল । রহিল কেবল তাঁহার স্মৃতি ! ভবরাম দেশের জন্ত বিপুল পরিশ্রম করিয়া অসময়ে নিজেকে মৃত্যুর স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন । তবু হতভাগ্য দেশবাসীর মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না !

ভবরাম সেই যে গুরুদেবের ইচ্ছিতে যোগে বসিলেন, সে যোগ আর ভঙ্গ হইল না ! প্রহরের পর প্রহর অতীত হইতে লাগিল, করুণাময় দাদার মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন । ক্ষণে ক্ষণে ভাবিতে লাগিলেন, “এখনই বুঝি দাদা করুণাময় বলিয়া ডাকিবেন ।” কিন্তু করুণাময় দাদার সে স্নেহভঞ্চিত স্বর আর শুনিতে পাইলেন না । করুণাময় আজ যথার্থই পিতৃহীন হইল । আর করুণাময়কে তেমন করিয়া স্নেহস্বরে “করুণাময়” বলিয়া কেহ ডাকিবে না ! তেমন করিয়া সশব্দিত হৃদয়ে মঙ্গলামঙ্গল ভাবিয়া করুণাময়ের মুখের দিকে আর কেহ চাহিবে না ! করুণাময়ের অমঙ্গলের আশঙ্কার তেমন করিয়া আর কেহ ভাবিবে না । করুণাময়ের দুঃখ ও কষ্টের অশ্রুট ধ্বনি

অগ্নি-গোলকের মত তেমন করিয়া আর কাহারও প্রাণে বাজিবে না । করুণাময়ের স্বখ-দুঃখের সাক্ষী, আশা ও আনন্দের সঙ্গী, পথ-প্রদর্শক, সংসারের অগ্রগামী সঙ্কচর চিরতরে চলিয়া গিয়াছে ! আছে কেবল শক্তিহীন, স্নেহহীন, মনতাপূর্ণ জড় দেহখানি ! করুণাময় যখন সংজ্ঞাহীন দেহে ধূলানলুপ্তিত, তখন স্বপ্নে দেখিলেন, যেন অন্ধ্রজ তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া স্নেহভরে অঙ্গের ধূলাগুলি মুছিয়া দিলেন । পরে মস্তকে মঙ্গল কর স্পর্শ করিয়া বলিলেন—“উঠ ভাই করুণাময় ! একবার শেষ দেখা তোমায় দেখিয়া যাই ! তোমাকে শিশুকাল হইতে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছি । সংসারে তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন ছিলে ! তোমার মমতাতেই আমি সংসার ত্যাগ করিতে পারি নাই । আজ বিধাতার আদেশে চিরতরে তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছি । সংসারের উত্তাল-তরঙ্গে তোমায় ছাড়িয়া যাইতেছি । এখন ভগবান ভিন্ন কেহ আর তোমার সহায় নাই ! তিনিই তোমায় রক্ষা করিবেন । যদি সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তোমাকে যেন সঙ্গীরূপে আবার পাই ! নচেৎ সংসার ও জীবন মরুভূমিবৎ প্রতীক্ষমান হইবে । শোকে অভিভূত হইও না ! আমার অপরিমেয় স্নেহ ও ভালবাসার ঞ্চণ হইতে আংশিকভাবে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা কর । আমার পরিত্যক্ত দেহ ভূমিশয্যায় পড়িয়া আছে—ইহা চন্দনে চর্চিত করিয়া দাও । বক্ষঃস্থলে

হরিনাম লিখিয়া দিয়া দেহখানি পবিত্র কর । সুবাসিত সুগন্ধি
কুসুমরাশিতে দেহখানি আবৃত কর । ননোহর কুসুমের মালা গাথিয়া
কণ্ঠে পরাইয়া দাও । শবাধারোপরি কুসুম-শয্যা প্রস্তুত কর ।
স্তবকে স্তবকে সুগন্ধি কুসুমে দেহ ঢাকিয়া, শবোপরি কুসুমমালায়
আচ্ছাদিত করিয়া সাজাইয়া দাও । গঙ্গাতীরে চন্দন কাষ্ঠের চিতা,
সজ্জিত করিয়া তোমার জ্যেষ্ঠের পরিত্যক্ত দেহ চিত্রোপরি স্থাপিত
কর । পবিত্র শ্রীনৃগাবলীতা ও মদীয় গ্রন্থরাজি তুহুপরি রাখিয়া
দাও । ঘৃত ও চন্দন কাষ্ঠের পবিত্র অগ্নিশিখা আকাশ নার্গে হু হু
করিয়া উথিত হউক তোমার জ্যেষ্ঠের দেহ সেই অনলে
ভস্মীভূত হইয়া পুণাতোয়া জাহ্নবী সলিলে ভাসিয়া যাক ! তোমার
হস্ত পবিত্র ও ধন্য হউক ! মুক্তমূহ হরিগুণ গানে শশানভূমি
প্রতিধ্বনিত হউক ! উঠ ভাই ককণাময় ! মমতায় আর তোমার
জ্যেষ্ঠের পরিত্যক্ত দেহ ফেলিয়া রাখিও না । সংসারের কর্তব্য
কর্ম্ম চিরদিন তোমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে । শোকে মুহুর্নাম
হইলে চলিবে না । সংসারে কর্তব্য সম্পাদনের জন্ত শোক, দুঃখ,
শ্রম, লজ্জা, ভয়, মান, অভিমান, লোকনিন্দা সকলই তাগ
করিতে হয় । এখন তোমার শোক-দুঃখ তাগ করিবার সময়
আসিয়াছে । আমি চিরজীবন তোমাকে যে সব শিক্ষা দিয়া
আসিয়াছি, তাহা কি বিস্মৃত হইলে ? উঠ ভাই ককণাময় ! সংসারের
কর্তব্য ও হিন্দু পারলৌকিক কার্যসাধন কর ।”

অচেতন দেহ সংসারাভিজ্ঞ বালক এই প্রকার হঠাৎ স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। জোষ্ঠের অমৃতসিক্ত স্নেহপূর্ণ, অথচ হৃদয়-বিদারক কথাগুলি অচেতনাবস্থায় শুনিয়া ক্ষিপ্ত-প্রায় উঠিয়া বসিল। তাহার কৰ্ণে বার বার সেই কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। করুণাময় চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে দাদা ভূমিশযায় শয়ন করিয়া আছেন। অঙ্গস্পর্শে দেখিলেন, তাঁহার জড়দেহ তুষার শীতল হইয়াছে। উহা রক্তহীন স্পন্দনহীন ও নিশ্চল। প্রথমতঃ করুণাময় নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। শেষে দেখিল সত্যি দাদার প্রাণহীন দেহ ভূমে লুপ্তিত হইতেছে। ভবরাম যোগাসনে বসিয়াছিলেন—ইহা দেখিয়াই করুণাময় জ্ঞানহারী হইয়া পড়িয়াছিল। দেহত্যাগ কালে ভবরাম করুণাময়কে একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইলেন। ভবরাম বক্তনির্ঘোষ স্বরে করুণাময়ের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া বুঝি শেষ স্নেহরজ্জু ছিন্ন করিলেন।

প্রাণহীন দেহ দেখিয়া করুণাময় চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে ভবরামের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। পরক্ষণেই ভবরামের পা ছুখানি বক্ষে তুলিয়া লইয়া গগনভেদী স্বরে চীৎকার আরম্ভ করিলেন। করুণাময়ের সেই হৃদয়বিদারক চীৎকারে বৃক্ষের পত্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিল। পশুপক্ষীও বুঝি রোদন সংবরণ করিতে পারিল না।

বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় ও প্রতিবাসিগণ হৃদিনাম সংকীৰ্ত্তন

করিতে করিতে ভবরামের প্রাণহীন দেহ পুণ্যতোয়া ভাগীরথী
তীরে যখন লইয়া যাইতেছেন, তখন এলায়িত-কুস্তলা, সাগরবালা
পাগলিনীর ছায়া স্বামীর শব দেহের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে লাগি-
লেন ! সে দৃশ্য কি ভীষণ ! এই শোকাবহ দৃশ্যে সকলেরই বক্ষঃস্থল
বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল । কামেরিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে
বক্ষে জড়াইয়া বলিলেন, “মা ! কিছু দিন অপেক্ষা কর ; আমরাও
যাইয়া বাবার সঙ্গে অনন্তকালের নিমিত্ত মিলিত হইব । বাবাকে
বহুদূরে যাইতে হইবে ! একা বাতীত সে পথে যাইবার উপায়
নাই ! যদি উপায় থাকিত, তবে বাবাকে কখনই একা
ছাড়িতাম না । বাবা যাহাতে নিরাপদে গন্তবাস্থানে উপনীত
হইতে পারেন, তাহার উপায় করিতে হইবে । চল মা ! বাবার
আত্মা যাহাতে নির্ঝিল্লি দেবলোকে পহঁছিতে পারে, যোগাসনে বসিয়া
ভগবানের চরণে তাহার জ্ঞান প্রার্থনা করিগে ।” কামেরিয়া
সাগরবালাকে বক্ষে জড়াইয়া গৃহে লইয়া আসিল ।

চন্দন কাষ্ঠ ও পবিত্র গব্যাস্ত্র সংযোগে ভবরামের পবিত্র দেহ
কয়েক দণ্ডের মধ্যেই ভস্মীভূত হইল । সকলই শেষ হইয়া গেল ।
সঙ্গে সঙ্গে ইহ-জীবনের মত ভবরামের সংসারলীলাও শেষ হইল ।
কর্মবীর চলিয়া গেলেন—পশ্চাতে অনেক অসম্পূর্ণ মহৎ কার্যা
রাখিয়া গেলেন ।

অশানাদি নির্দোষ করিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে সকলেই

জাহ্নবী সলিলে অবগাহনের জন্ত জল্লাহ অবতরণ করিলেন । কেবল করুণাময় জাহ্নবীতীরে উন্নত হইয়া বসিয়া আছেন । বক্ষ-পঙ্কজ ভেদ করিয়া “হরিধ্বনি” যেন করুণাময়ের হৃদয়ে আঁসিয়া আঘাত করিতেছে । আঁখিযুগলে দর বিগলিত ধারায় শোকাশ্রু-নির্গত হইতেছে ।

সঁহসা অনুরে কে একজন গায়িল :—

“আগে অহং তত্ত্ব দূর কর মন, সংসার বাসনা মনে ।

তবে সংসারেতে স্তব্ধ পাবি তুই ছোঁবেনা রে শমনে ॥”

রজনী প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে । নিমতলার শ্মশান ঘাট নিস্তব্ধ ! কুলুকুলুনাদিনী জাহ্নবী তট নিস্তব্ধ ! বিরাট বোয়ান নিস্তব্ধ ! জল ও স্থল সকলই নিস্তব্ধ !

করুণাময় চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে একজন সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান । অন্ধকারে করুণাময় তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না । তাঁহার মন তখন অগ্রজের দেবোপম মূর্তির ধামে রত । সন্ন্যাসী করুণাময়কে তাঁহার অনুসরণ করিতে ইচ্ছিত করিলেন ।

করুণাময় সন্ন্যাসীর সঙ্গে জাহ্নবীতটে একটি নির্জন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সন্ন্যাসী বলিলেন, “করুণাময় ! তুমি এখন সংসারে একাকী । ভবরাম দেহত্যাগ করিবার পূর্বে যোগা-সনে বসিয়া তোমার জন্ত অনেক চিন্তা করিয়া গিয়াছেন । সেই

চিন্তা কর্ষ্মশূত্র হইয়া আজ আনাকে এই স্থানে এই সময়ে টানিয়া আনিয়াছে । একা তোমাকে সংসারের পিচ্ছিল পথে চলিতে হইবে । পাছে তোমার পদস্থলন হয়, এইজন্ত তোমাকে কিছু উপদেশ দিয়া নাইব । এতদিন জ্যেষ্ঠের আদেশ, শ্রীয়ে অন্ত্যায় বিচার না করিয়া যেক্রমে পালন করিয়া আসিয়াছ, চিরদিনই তদ্রূপ করিবে । সংসারের কার্য্য সবই করিবে, কিন্তু কার্য্য করিবার সময় নিজেকে প্রশ্ন করিবে, “ভগবান কেন আমাকে সজ্জন করিয়াছেন?” এই “কেন”র যদি মীমাংসা করিতে পার, তাহা হইলেই তুমি প্রকৃত সংসারী হইবে ।

“তুমি যে নানুষ্ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, নিশ্চয়ই ইহার ভিতর একটা কারণ বা উদ্দেশ্য আছে । বিনা কারণে, বিনা উদ্দেশ্যে একটি কোট পতঙ্গও ভগবান ভগতে প্রেরণ করেন নাই ।

“তোমার মন প্রশ্ন করিতেছে, এই কারণ বা উদ্দেশ্য কি ?
 আছে ! শুন করুণাময় ! তুমি কেবল এইটি বুঝিয়া সংসারের কার্য্য করিও যে, “মানুষ নিজের জন্ত বা নিজ কার্য্য সাধনের জন্ত কখন জন্মগ্রহণ করে না । ভগবানের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্তই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ । ইহা অনেক দূরের কথা । যখন সংসার ধর্ম্ম সম্পন্ন করিতে করিতে ততদূরে আসিতে পারিবে, তখন ইহা তোমার কীৰ্ত্তম্য হইবে ।

“তুমি যদি ভগবানের প্রয়োজন সাধনের জন্তই সংসারে আসিয়া

পাক, তবে সংসারে যাহা কিছু করিতেছ ভগবানের প্রীত্যর্থ করিতেছ, ইহা তোমাকে মনে করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। যাহা পাপ, তাহা কখনই ভগবানের প্রিয় কার্য্য হইতে পারে না। অতএব তোমাকে সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। সংসারে ভগবানের কার্য্য করা ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। নিজের বলিতে আমাদের কিছু নাই এবং থাকিতেও পারে না। চ্যুত বৃক্ষটি ফলভরে নত হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে বৃক্ষের কোন সুখ বা লাভ নাই। ভগবানেরই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে বৃক্ষিতে হইবে। নদী অবিরাম কল কল শব্দে বহিয়া যাইতেছে, ইহাতে নদীর কি কোন সুখ বা লাভ হইতেছে! ভগবানের উদ্দেশ্য সাধন বা তাঁহারই কার্য্য করিয়া যাইতেছে বৃক্ষিতে হইবে। এইরূপ পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, যাহা কিছু সকলই ভগবানের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া চলিয়া যাইতেছে। পশু লাক্কল টানিয়া বা গাভী মানুষকে দুগ্ধ দান করিয়া তাহাদের কি ফললাভ হইতেছে? ভগবানের উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে বৃক্ষিতে হইবে। তুমি ব্যবসা করিবে, বাণিজ্য করিবে, সংসার ও আত্মীয়-পরিজনকে প্রতিপালন করিবে, স্ত্রী-পুত্র, ভ্রাতৃভায়া, ভ্রাতৃপুত্র ইত্যাদিকে ভরণ-পোষণ করিবে, সমস্তই ভগবানের প্রীত্যর্থ তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিতেছ, ইহা ভাবিয়াই করিবে। সেইরূপ যাহা আশাক্রীয়, যাহা হিন্দু

রীতি-নীতির বিরোধী, তদ্রূপ কার্য বা অহংজ্ঞানে অথবা স্বার্থের বশবর্তী হইয়া কোনদিন কোন কার্য করিবে না। সংসারে যাহার উদ্দেশ্য সাধন বা যাহার প্রীত্যর্থ কার্য করিবে, তাঁহাকে সৰ্ব্বক্ষণ হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিবে। তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হইবে। তাঁহার সৰ্ব্বা সৰ্ব্বক্ষণ হৃদয়ে অনুভব করিবার চেষ্টা করিবে। যাও করুণাময়! পবিত্র দেহ,—পবিত্র হৃদয় মন লইয়া সংসার-ধর্ম পালন কর।”

এই অমৃতময় উপদেশগুলি প্রদান করিয়া জাহ্নবীতটে অন্ধকার-রাশির মধ্যে আবার হঠাৎ সন্ন্যাসী অদৃশ্য হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

কে ঐ পাগলিনী ? গ্রামে, নগরে, পর্বতে, কান্তারে, ধনীর প্রাসাদতুল্য অটালিকায়, দরিদ্রের পর্ণকুঠীতে ঘুরিয়া বেড়ায়—এ পাগলিনী কে ? পাগলিনীর কখন ধূলিধূসরিত অঙ্গ, কখন ছাই-ভস্ম মাথা কষিত-কাঞ্চনের ত্রায় শরীর, কখন পরিধানে বৃক্ষের বৃক্ষল । পাগলিনী কখন শ্মশানে শবদাহ দেখিয়া হো হো করিয়া হাসে, কখন আপনার মনে নিষ্ঠুরে বসিয়া কাঁদে । আতুর, দীন যখন রোগজীর্ণ দেহে পর্ণকুঠীতে ছিন্ন কন্থায় শয়ন করিয়া পাগলিনীর জন্ত কাঁদে, পাগলিনী তখন দূর দূরান্তর হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া সাস্বনা প্রদান করে । ধনীর অটালিকায়—পুত্র-শোকাতুরা জননী যখন পুত্রের জন্ত বক্ষে করাঘাত করিয়া মর্শ্বভেদী গীৎকার করে—তখন কোথা হইতে পাগলিনী ছুটিয়া আসিয়া শোকাতুরার নয়নাশ্রু মুছাইয়া দেয় । পুত্রকণ্ঠাহীন নিরাশ্রয়া অশীতিপর বৃদ্ধা অম্মাভাবে ক্ষুধার যন্ত্রণায় যখন ছটফট করে, পাগলিনী কোথা হইতে উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী আনিয়া তাহার কাছে বসিয়া তাহাকে যত্নপূর্বক ভোজন করায় ।

দম্ভাতঙ্কর যখন অন্ধকার রজনীতে পরস্পর অপহরণের জন্ত

নিজ্জন অরণো বসিয়া পরামর্শ করে—পাগলিনী তখন ছুটিয়া গিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মের ভয় দেখায় । চীৎকার করিয়া তাহাদের দুরভিসন্ধি পাঁচজনের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়—দম্ভারা বিফল-মনোরথ হইয়া ছুটিয়া পলায় । দীর্ঘ শিখায়ুক্ত ভণ্ড ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গণ অপরকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়া যখন স্বগৃহে গোপনে সেই পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, পাগলিনী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া হো হো করিয়া হাসিতে থাকে । ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তখন লজ্জায় অধোবদন হয় । হিন্দু ও ব্রাহ্মণকে অনাচার করিতে দেখিলে, পাগলিনী বোমকষায়িত লোচনে তাহাদের পানে চাহিয়া থাকে । পাগলিনীকে দেখিলে তাহাদের অন্তরায়্য কাঁপিয়া উঠে । দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, শ্রাদ্ধাপূজা প্রভৃতিতে গুরু বা পুরোহিত চণ্ডীপাঠ করিতেছেন, পাগলিনী তথায় বাইয়া উপস্থিত । তখন গুরু বা পুরোহিত মহাশয়কে ভয়ে ভয়ে চণ্ডীপাঠ করিতে হয়, পাছে অশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া কেলেন । নিঃস্ব পিতা বয়স্হা কন্ডা লইয়া বিব্রত । অথাভাবে বিবাহ দিতে না পারায় দিন দিন বক্ষের রক্ত শুষ্ক হইয়া বাইতেছে, পাগলিনী বাইয়া আশ্বাসবাণী শুনাইল । তারপর কোথা হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিল । প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতেছে, পাগলিনী বাইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দাড়াইল । গর্ভিণী প্রসব-বেদনায় তিন দিন তিন রাত্রি চীৎকার করিতেছে, প্রসব হইতে

পারিতেছে না। পাগলিনী ছুটিয়া গিয়া স্মৃতিকা গৃহে প্রবেশ করিল। পরক্ষণে জননীর ক্রোড়ে সন্তানকে শয়ন করাইয়া পাগলিনী অদৃশ্য হইল। পুত্রের কঠিন পীড়া, চিকিৎসকের অভাব নাই, সকলেই হতাশ হইয়া চলিয়া আসিয়াছে, পুত্রের জনক জননী পুত্রের জন্ত হৃদয়ভেদীরবে চীৎকার করিতেছে, পাগলিনী এমন সময় ছুটিয়া গিয়া মৃত্যুশয্যাশায়ী পুত্রের নিকট ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া বসিল। অলক্ষণের মধ্যেই পুত্রকে উঠাইয়া বসাইয়া পাগলিনী ছুটিয়া পলাইয়া গেল। শোকের পরিবর্তে গৃহে আনন্দরোল উঠিল।

অমাবস্তার গাঢ় অন্ধকারে গৃহস্থের ধন লুণ্ঠনের জন্ত দস্যুগণ তরণী বাহিয়া চলিয়াছে, পাগলিনী কোথা হইতে ছুটিয়া গিয়া প্রবলস্রোতে নৌকা ডুবাইয়া দিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। দস্যুগণ প্রাণের দায়ে সাঁতার দিয়া কে কোন্ দিকে ভাসিয়া গেল। বাহারা প্রবলস্রোতে তীরে উঠিতে পারিল না, পাগলিনী আবার তাহাদিগের হাত ধরিয়া তীরে ছুঁড়িয়া দিতে লাগিল। কোথাও সতীর অবমাননা হইতেছে, পাগলিনী ছুটিয়া গিয়া, সতীকে পশ্চাতে রাখিয়া নিজে সম্মুখে দাঁড়াইল। পশুটা প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইয় গেল।

পাগলিনী কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন আকাশের দিকে অনিমেঘনয়নে চাহিয়া থাকে; কিন্তু ক্ষণে পাগলিনীর বড়ই

আনন্দ ! পাগলিনী শ্মশানে গেলেই হো হো করিয়া হাসিতে থাকে । দেশে, বিদেশে, সহরে, ক্ষুদ্র পল্লীতে পাগলিনীকে সকলেই জানে বটে ; কিন্তু তাহার প্রকৃত পরিচয় কেহই অবগত নহে । পাগলিনী কোথায় থাকে, তাহাও কেহ জানে না ।

যাহারা আতুর, দীন, রোগজীর্ণ, কঙ্কালসার, তাহারা পাগলিনীকে ভক্তি করে ; কিন্তু হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা কি করিয়া জানাইবে, তাহা যেমন তাহারা বুঝিতে পারে না, তেমনই পাগলিনী কে তাহাও তাহারা জানে না । ধনীর অট্টালিকার পাগলিনীকে সকলেই চিনে, কিন্তু পাগলিনী কে, ইহা তাহারা জানে না । পুলকগ্রাহী, অম্মভাবগ্রস্তা, নিরাশ্রয়া অশীতিপর বৃদ্ধা, পাগলিনীকে দেবী বলিয়া গাথ করে ; কিন্তু সত্যি পাগলিনী কে তাহা কেহ জানে না । দম্ভা-তন্দরেরা পাগলিনীকে ভয় করে, দেখিলে ত্রাসে পলাইয়া যায় ; কিন্তু পাগলিনী যে ডাকিনী কি যোগিনী, তাহা তাহারা জানে না । রূপটাচারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ পাগলিনীকে দেখিলে ভয়ে কম্পিত হইতে থাকে ; কিন্তু পাগলিনী যে কে, তাহা জানে না । অনাচারী হিন্দুগণ পাগলিনীকে দেখিলে শিহরিয়া উঠে, অমৃতপ্ত-হৃদয়ে অশ্রুবর্ষণ করে ; কিন্তু পাগলিনীকে দেখিলে কেন এমন হয়, তাহা তাহারা জানে না । পূজাবাড়ীতে চণ্ডী অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণগণ পাগলিনীকে দেখিলে আশঙ্কার দিশাহারা

হইয়া পড়েন ; কিন্তু কেন এমন হয়, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না । পাগলিনীকে সকলেই এক একবার ছায়ার মত দেখেন ; কিন্তু পাগলিনী দেবী, মানবী—কি শিশাচী, তাহা তাঁহারা জানেন না । কল্যাণদায়গ্রস্ত পিতামাতা পাগলিনীকে চিনে, কিন্তু কোথা হইতে আসিয়া কেন পাগলিনী তাহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিল না । পাগলিনীকে সকলেই চিনে—জানে ; কিন্তু সত্যি পাগলিনী কে, তাহা কেহ জানে না । পাগলিনীকে কেহ বলে, “পাগলিনী”—কেহ বলে, “সন্ন্যাসিনী”—কেহ বলে, “ডাকিনী”—কেহ বলে “প্রেতসিদ্ধা”—কেহ বলে, কামাখ্যা পাহাড় হইতে ডাকিনী মন্ত্ৰ শিখিয়া আসিয়াছে । ইংরাজীনিবিশ স্নানশিক্ষিতগণ বলেন, “বেটা ডাকাতদের গুপ্তচর হে” ; আবার কেহ বলেন, “না হে ! বেটা অত্ৰ কোন কুম্ভলবে বেড়ায় ।”—এইরূপ যাহার যেমন শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা—যাহার যেমন প্রকৃতি, সে কর্ত্তনাবলে পাগলিনীর সেইরূপই মূর্ত্তি গঠিত করিয়া লয় । দম্ভা ও তন্দ্বরেরা মনে করে, “পাগলিনী সরকারের গুপ্তচর । বেটা এ দেশের মানুষ নয়, অত্ৰ কোন দেশ হইতে সরকার বাহাদুর আমদানী করিয়াছে ।”

পাগলিনী এই সব কাজ করিয়া বেড়ায়, পাগলিনীর অগোচর স্থান কোথাও নাই ; কিন্তু সকল সময় সকলে পাগলিনীকে দেখিতে পায় না । কোথা হইতে কি হইল, অনেক সময়েই

মানুষ বুঝিতে পারে না। কাহারও বৃদ্ধ পিতা পীড়িত, পুত্র দূরদেশে। একমাত্র পুত্রকে দর্শন করিবার জন্ত পিতা ছটফট করিতেছে—কে আসিয়া স্বপ্নঘোরে পুত্রকে সম্মুখে গৃহে ফিরিতে বলিয়া গেল। পুত্র আর মুহূর্তের জন্তও স্থির থাকিতে পারিল না। সহস্র কার্য ত্যাগ করিয়া পিতাকে দেখিবার জন্ত ছুটিল। কেহ কোথাও যাইবার জন্ত শুভযাত্রা করিয়া বাহির হইতেছে। বিপদ ঘটিবে বলিয়া কে যেন কাণে কাণে বাণ্য দিয়া গেল। তাহার আর যাত্রা করিবার সাহস হইল না। পরক্ষণে শুনিল, যে নৌকায় যাইবার কথা ছিল, তাহা জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। কেহ কোন গুরুতর বিষয়ের চিন্তা লইয়া ছটফট করিতেছে—তাহার শয্যাকণ্টক উপস্থিত—সমস্ত রজনী নিদ্রা নাই—চিন্তারও বিরাম নাই—রজনী প্রভাত হইলেই তাহাকে হয় ত পথের ভিখারী হইতে হইবে; চিন্তার মীমাংসা কিছু হইল না। কে আসিয়া কাণে কাণে তাহার চিন্তার মীমাংসা করিয়া দিয়া গেল। দৈবপ্রাপ্ত স্বপ্নের ফল ভাবিয়া তাহার চিন্তা-ক্লিষ্ট হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। কাহাকেও প্রবলের চক্রান্তে রাত্রি প্রভাত হইলেই কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। সে নির্দোষী হইলেও তাহার একপ শক্তি নাই যে, নিজের পক্ষ সমর্থন করিয়া নির্দোষিতা প্রমাণ করে। তাহার সহায় সম্বল নাই—অর্থবলও নাই। কারাদণ্ড নিশ্চয় জানিয়া বিচারকের

আদেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অদৃষ্টকে ধিকার দিতেছে এমন সময় একজন সর্বপ্রধান আইনজ্ঞ হঠাৎ আসিয়া তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে দাঁড়াইল। তাহার নির্দোষিতা বিচারককে বুঝাইয়া দিল। ফলে চক্রান্তকারীরা গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইল। কোথা হইতে কি হইল বেচারী বুঝিতে পারিল না। এত গুপ্ত বিষয় তাহার পক্ষ সমর্থনকারী কি করিয়া জানিল, বুঝিতে না পারিয়া সে আশ্চর্য ও স্তম্ভিত হইল। দেবতাবোধে পক্ষ সমর্থনকারীর মুখের দিকে সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। লোকচক্ষুর অন্তরালে এইরূপ কত ব্যাপার পাগলিনীর দ্বারা সংঘটিত হয়, অথচ পাগলিনীকে কেহ দেখিতে পায় না। যাহারা দেখিতে পায়, তাহারা চিনিতে পারে না।* আবার যাহারা চিনিতে পারে, তাহারা পাগলিনী কে জানিতে পারে না। কত লোক কত চেষ্টা—কত অনুসন্ধান করিয়াছে; কিন্তু পাগলিনীকে কে জানিতে বা বুঝিতে পারিল না।

পাগলিনী কোথাও মুহূর্তের জন্ত স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। সে এই মাত্র কালীঘাটে কালী-মন্দিরের মধ্যে ছিল। আবার একটু পরেই তারকেশ্বরের মন্দিরে গিয়া দেখ, তারকনাথের মস্তকে অঞ্জলি ভরিয়া বিশ্বপাত্র প্রদান করিতেছে। পাগলিনী এইমাত্র গঙ্গার উপর একখানি নৌকার ছাদে বসিয়াছিল, কণকাল পরেই তাকে বাঁশবেড়ের একটি হিন্দু-গৃহস্থের রোগ-শয্যাপাশে

বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইবে । পাগলিনী এই মাত্র কাশীধানে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে স্থির হইয়া অচঞ্চল-দৃষ্টিতে কি দেখিতেছিল, একটু পরেই দেখিবে, কলিকাতার রাজপথে একটী বিদেশী পরিচ্ছদধারী স্বেচ্ছ-হিন্দুকে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কি বলিতেছে । পাগলিনী এইমাত্র আরামবাগের আদর্শ হিন্দু-চতুষ্পাঠির অধ্যাপককে বিনম্রবচনে কি বলিতেছিল, একটু পরেই দেখিবে গছায় গিয়া একজন পাণ্ডাকে তীব্র তিরস্কার করিতেছে । ক্রোড়পতি পাণ্ডা কৃতাজ্জলিপুটে অধোবদনে পাগলিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে । পাগলিনী কে, তাহা সে জানিতে পারিল না ।

কেহ বলে পাগলিনী বাতাসের সঙ্গে উড়িতে পারে—কেহ বলে রাত্রে পাগলিনীর ডানা বাহির হয় । কেহ বলে পাগলিনী জলে ডুবিয়া তিন দিন তিন রাত্রি থাকিতে পারে । কেহ বলে পাগলিনী বাতাস খাইয়া থাকে—কেহ বলে পাগলিনী গাছ চালাইতে জানে—পাগলিনী গাছের উপর বসিয়া ঝড়ের ন্ত উড়িয়া যায় । কেহ বলে পাগলিনী একা নয়, উহার আরও সঙ্গী আছে ।

আজ প্রবলপ্রতাপ জমীদার কৃষ্ণকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ-
ঘাতে মৃত্যু হইবে । জমিদারবাবু অনাচারী পশুপ্রকৃতি বন্ধুগণকে
সঙ্গে লইয়া ময়মনসিং জেলায় জমীদারী পরিদর্শনের জগ আসিয়া-
ছিলেন । জমীদারবাবুর আচরণে প্রজাবর্গ তাঁহার উপর কেহই

সম্ভূষ্ট নহে। কয়েক দিবসের জন্ত এখানে আসিয়া কত লোকের সর্বনাশ করিয়াছেন। যে সমস্ত দীন প্রজার গৃহে যুবতী ভার্যা বা কন্যা আছে, তাহারা সশঙ্কিত অবস্থায় দিনপাত করিতেছে।

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। কয়েকজন বলবান্ প্রজা নিঃশব্দে কাছারীতে প্রবেশ করিয়া জমিদারকে একটি নদীর ধারে ধরিয়া আনিয়াছে। জমিদারের মুখ একরূপ ভাবে বস্ত্রাবৃত করিয়াছে যে, সহস্র চেষ্টাতেও কৃষ্ণকান্ত চীৎকার করিতে পারিতেছে না। বিজাতীয় ক্রোধে সকলেরই চক্ষু রক্তবর্ণ। দস্তে দস্তে বর্ষণ করিয়া কেহ বলিতেছে, “বেটার গলাটায় আমাকে আগে চোপ বসাতে হবে।” এই বলিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সজোরে তীক্ষ্ণধার দা উত্তোলন করিল। কেহ বলিল, “জীবন্ত অবস্থায় আগে বেটার নাড়ি ভুঁড়িগুলা বাহির করিয়া ফেলি।” কেহ বলিল, “যে চক্ষে বেটা আমার মেয়েটার প্রতি চাহিয়াছিল, সেই চক্ষু ছুটা আগে তুলিয়া ফেলি।” অবশেষে সকলে এক মত হইয়া স্থির করিল, অগ্রে হাত দুইটা কাটিয়া নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দেওয়া হউক। তারপর পা দুখানা কাটিয়া নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। তারপর নাড়িভুঁড়িগুলা ভাসাইয়া দিয়া সর্বশেষে মুণ্ডটা কাটিয়া নদীর মাঝখানে ফেলিয়া দিব। এইরূপে একে একে ভাসাইয়া দিলে পাপিষ্ঠের কোন সন্ধানই কেহ পাইবে না। কৃষ্ণকান্ত

সকলই শুনিতোছে, কথা কহিবার শক্তি নাই। জীবিত অব-
স্থাতেই তাহার দেহের শোণিত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত
জীবিত কি মৃত, তাহা সে নিজেই অনুভব করিতে পারিতেছে না।
দিবালোকে যদি কেহ দেখিত, তাহা হইলে তাহার শরীরে জীবনের
চিহ্নমাত্রও কেহ দেখিতে পাইত না। সে মনে করিতেছে, আমার
হস্তপদ কৰ্ত্তন করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।
এইবার শিরচ্ছেদন করিবে। কৃষ্ণকান্ত জীবিতকালে কখন ভগ-
বানকে ডাকে নাই। বাল্যকাল হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে
বিলাস-স্রোতে গা ভাসাইয়াছে। যৌবনে ধন-সম্পদের অধিকারী
হইয়া পশুভাবে জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছে। ভগবানকে
কখন স্মরণ করিবার অবসর বা সময় ঘটে নাই। কৃষ্ণকান্তের
মৃত্যু সময় উপস্থিত। একপ ভীষণ মৃত্যু ছুঁত্যা-মানবের জগুই
অপেক্ষা করে। ভগবান সকলের দেহেই ভক্তি বিশ্বাস প্রদান
করিয়াছেন। সুসময় না আসিলে কাহারও হৃদয়ে সে সমস্তের
বিকাশ হয় না। কৃষ্ণকান্তের হৃদয়ের চিররুদ্ধ ভক্তি-বিশ্বাস আজ
সময় পাইয়া উন্মোচিত হইল। সে কাতরে ভগবানকে ডাকিতে
লাগিল, “প্রভু! তুমি আমার শোচনীয় মৃত্যু অবলোকন করিয়া
আমার কৃতপাপ ক্ষমা কর। আমার পাপের সংখ্যা নাই! মৃত্যু-
সময়ে প্রমাণ পাইলাম ধর্ম, অধর্ম জগতে বিরাজমান! প্রভু!
তোমার করুণা ভিন্ন আমার আর গতি নাই। এতদিন ধন-

সম্পদে মত্ত থাকিয়া তোমাকে মনে করি নাই । দয়াময় ! বাল্যকাল হইতে সে শিক্ষাও পাই নাই । যে সময়ে আপনাকে আমার মনে পড়িল, তাহা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ ! আর কখন আপনাকে ডাকিব প্রভো !”

কৃষ্ণকান্তের আর ডাকিবার সময় রহিল না । একজন কৃষ্ণকান্তকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণধার দা উঠাইল । চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে দা আসিয়া কৃষ্ণকান্তের হস্তের উপর পড়িল । হঠাৎ সকলে স্তম্ভিত, ভীত, ত্রস্ত হইয়া উঠিল । তীক্ষ্ণধার দা কৃষ্ণকান্তের হস্তস্পর্শ করিবার পূর্বেই, কে একজন আসিয়া তাহা কাড়িয়া লইয়া নদীতে ফেলিয়া দিল ।

নদীতীরে, সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারে, কে একজন খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল । সে হাসির কি তীব্র শক্তি ! বৃক্ষ, লতা, পাতা কাঁপিয়া উঠিল । শ্রোতস্বিনীর কল কল শব্দ বৃষ্টি থামিয়া গেল ! যে বেথানে ছিল, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল । কাহারও ধমনীতে আর যেন রক্ত চলাচল হইতেছে না । সকলেই বাক্শক্তিহীন । পলাইবার ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু চরণ শক্তিহীন । পা উঠিতেছে না ।

“সাবধান ! এমন কাজ আর কখন করিস না । ব্রহ্মহত্যা ! উঃ, ভয়ঙ্কর—মহাপাতক !! যা ! চলিয়া যা !”

মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাদের শক্তি ফিরিয়া আসিল । অভয়বাণী পাইয়া, যে বেদিকে পারিল, প্রাণ লইয়া ছুটিয়া পলাইল ।

কৃষ্ণকান্তের মুখের বসন ও হস্তপদের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল । বস্ত্র উন্মোচিত হইলে মুখ-গহ্বর হইতে রক্তধারা বহিতে লাগিল, কিন্তু যেন মস্তবলে তখনই তাহা নিবারিত হইল । কৃষ্ণকান্ত সকলই দেখিতেছে, কিন্তু কথা কহিবার সাহস হইতেছে না । সেই গভীর অন্ধকারের মধ্য হইতে জলদগম্ভীরস্বরে কে বলিতে লাগিল—
“দাবধান ! বিপথগামীর প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হয়, তাহা ত চাক্ষুষ দেখিলে ! ইহা ইহজীবনের কয়েক মুহূর্তের দণ্ড । জন্ম-জন্মান্তরে, শত শত বর্ষ ধরিয়া, ইহাপেক্ষা শতগুণ ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় । যাক্, আর বোঝা ভারি করিও না ! যাহাকে ডাকিতেছিলে, যিনি তোমাকে পাপী বলিয়া ঘৃণা না করিয়া সমস্তে রক্ষা করিলেন, তাহার চরণে আশ্রয়-সমর্পণ কর । যে নাম স্মরণ করিতেছিলে, সেই নামাঘ্নিতে তোমার পাপরাশি দগ্ধ হইয়া যাইবে ।”

কি বজ্র-গম্ভীর স্বর ! প্রতি শব্দটী কৃষ্ণকান্তের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া যেন হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে বিদ্ধ হইয়া রহিল । কৃষ্ণকান্ত স্বপ্নরাজ্যে ডুবিয়া, জ্ঞানহীন—মৃতের গ্রায় সেই নদীতীরে পড়িয়া রহিল ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

“না ! সমস্ত দিন তোকে দেখিতে পাই না ! এমন করিয়া দূরে দূরে বেড়াইলে আমরা কি করিয়া থাকিব না ? যেখানে যাস্, আমাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাস্ না কেন না ? তুই এক দণ্ড না থাকিলে, আমাদের ঘর যে অন্ধকার হইয়া যায় ! অনানন্দ আর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা হয় না । চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয় ।”

বক্তা সত্য সত্যই কাঁদিতে লাগিল ।

“কেন কাকা, তুমি আমার উপর রাগ কর ! আমি কি তোমাদিগকে না দেখিলে সুস্থির থাকি ! তাহা যদি থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাকে আর এতদিন দেখিতে পাইতাম না । কত দূর-দূরান্তরে যাই, আবার তোমাদের জন্তই ত ছুটিয়া আসি কাকা !”

“তোমার জন্ত আমার বড়ই ভয় হয় না ! পাছে আর তোকে দেখিতে না পাই ! এমন করিয়া আর দিন রাত্রি দেশ-বিদেশে বেড়াস্ না মা ।”

“কাকা ! এই কথাটি আমাকে বলিও না ! কেবল এই

জগুই আমি সংসারে পড়িয়া আছি। আমি দিনরাত্রি যদি দেশ-বিদেশে না বেড়াই, তাহা হইলে মহাপুরুষদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাঁহাদের আদেশেই আমি সংসারে আবদ্ধ আছি। তাঁহাদের আদেশ পালন না করিলে, আমার জীবন যে রূপ হইবে কাকা! আমার কি শক্তি আছে কাকা? তাঁহাদের করুণাদত্ত কণামাত্র শক্তি লাভ করিয়া, তাঁহাদেরই কার্য্য করিতেছি! এই নম্বর দেহে যদি জগতের কণামাত্র উপকার করিতে পারি, তাহা হইলেই নারী-জন্ম সার্থক হইবে। বাবা আমার, দেশের জগু—হিন্দুধর্মের জগু, অকালে জীবলীলা শেষ করিয়াছেন। তাঁহার আরও কার্য্য একটুও অগ্রসর করিতে পারিলে, ধন্য হইব। বুদ্ধির জড়তাবশে হিন্দুর মন এখন অবিশ্বাসে পূর্ণ। যোগবলে যে শত যোজনের ঘটনা চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, শত যোজনের পথ চক্ষের নিমিষে যাওয়া যায়, হিন্দু এখন ইহা বিশ্বাস করিতে চাহে না। হিন্দুর যে ভারতে জন্ম, হিন্দুর শক্তি যে বিভিন্ন হিন্দুর জন্মভূমির মত যোগভূমি যে ব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও নাই, হিন্দুর আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি যে নাগুষ্টকে দেবতার সমকক্ষ করে, এ সমস্ত কথা হিন্দু এখন বিস্মৃত হইয়াছে! দৈব-প্রভাবে রামচন্দ্র বৈরাগ্যে নিজের শক্তি নিজে উপলব্ধি করিতে পারিতেন না, পদে পদে আত্মবিস্মৃত হইতেন, হিন্দুও তেমনই বুদ্ধির জড়তাবশে, যাহা কিছু নিজের, সে সমস্তই ত্যাগ করিয়াছে।

“আমার বাবা মহাত্মা ভবরাম, যে বীজ কন্ডার হৃদয়ে বপন করিয়া গিয়াছেন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—শরীর পতন করিয়াও সেই বাজ ভারতভূমিতে ছড়াইয়া যাইব। যদি পৰ্বতগুহাবাসীদের আশীর্বাদ থাকে, আর বাবার চরণে যদি আমার যথার্থ ভক্তি থাকে, তাহা হইলে দেখিবেন, এক দিন না একদিন বাবার ইচ্ছা-শক্তি নব-মূর্তি ধারণ করিয়া জগতে কার্য্য করিবে। হিন্দু আবার হিন্দু হইবে। যতদিন আমার দেহের শেষ শক্তিবিন্দুর ক্ষয় না হইবে, ততদিন আমার এ চেষ্টার বিরাম হইবে না।”

ভবরামের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে, কামেরিয়ার সঙ্গে করুণাময়ের এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল। কামেরিয়ার শক্তির পরিচয় পাঠক পূৰ্ব পরিচ্ছেদে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভবরাম যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, কামেরিয়া পাগলিনীপ্রায় হইয়া, তাহাকে বিশাল বনস্পতিতে পরিণত করিবার জন্ত সমস্ত শক্তি সামর্থ্য ও যোগবল নিয়োজিত করিয়াছে। কামেরিয়া জগতের হিতের জন্ত যোগবলে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাই করুণাময় অভিমান-ভরে কামেরিয়াকে কতই অনুযোগ করিলেন। ভবরাম যে আরন্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারিয়া, দেহপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কামেরিয়া মুহূর্তের জন্তও বিন্ধুত হইতে পারে নাই। তাই কামেরিয়া পাগলিনী।

করুণাময় হতাশ-অস্তরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

“মা ঝামেরি ! পাগলী আমার ! তোর এই অক্লান্ত চেষ্টা কি সফল হইবে না ! দাদার ইচ্ছা কি পূর্ণ হইতে দেখিতে পাইব না মা ? হিন্দু কতদিনে আবার সেই পূর্ব্বের গৌরবময় হিন্দু হইবে না ? ব্রাহ্মণ-বালকগণ কবে আবার অর্থকরী বিজ্ঞানচেষ্টার পরিবর্তে প্রভাত সন্ধ্যায় বেদ পাঠ করিবে না ? হিন্দু কবে আবার ভারতের প্রাচীন রীতি-নীতির আদর করিতে শিখিবে না ? সে দিনের কি এখনও অনেক বিলম্ব আছে ?”

“কি করিয়া জানিব কাকা ! ভগবান ভিন্ন এ কথার উত্তর দিবার শক্তি আর কাহারও নাই । তবে বতদূর দৃষ্টি যায়, তাহাতে মনে হয়, হিন্দু নিশ্চয়ই একদিন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবে ।”

ঝামেরিয়া একদৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া, করুণাময়ের মুখের উপর চঞ্চল দৃষ্টি স্থাপিত করিল । করুণাময় বুঝিলেন, পাগলী বেটীর কোথায় আবার ডাক পড়িয়াছে, এখনই ছুটিবে ।

করুণাময় স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—“পাগলী মা আমার ! মা’ মা, কোথায় কে তোকে ডাকিতেছে ! কার বৃষ্টি সময় হইয়াছে । মায়ার শ্রুতলে বাঁধিয়া তোর কর্তব্যে আর বাধা দিব না ।” করুণাময়ের চক্ষে পলক পড়িতে না পড়িতে, পাগলিনী বায়ুর সঙ্গে কোথায় মিলাইয়া গেল ।

* * * * *

সেতুবন্ধ রামেশ্বরের পথে তিনটি সন্ন্যাসী বিপন্ন হইয়া,

ভগবানকে ডাকিতেছেন । ইতঃপূর্বে একদল দস্যু, সন্ন্যাসীর বেশে
 তীর্থযাত্রীদের সঙ্গ লইয়া তাহাদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছিল ।
 সেইজন্ত পুলিশের লোক এখন সন্ন্যাসী দেখিলেই, নানাবিধ
 যন্ত্রণা দিয়া দস্যু কি সাধু তাহার পরীক্ষা করিতেছেন । কয়েকজন
 শাস্তিরক্ষক সন্ন্যাসীত্রয়কে নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিয়া বলিল, “এখনও
 বল, চোরাই মাল তোরা কোথায় কাহার কাছে রাখিয়াছিস্ ?”

তাহারা হাসিয়া বলিলেন—“সতাই বাবা, আমরা চোর নহি—
 সন্ন্যাসী ।”

বিলম্বিত শ্রমশ্রম্ভক্ষ হঠপুঠ-দেহ একজন পুলিশ কন্স্টাবল চক্ষু
 রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, “চোর শালা—শালা লোককো, এক একশ
 জুতি লাগাও ।”

বোধ হয় ইনি দারোগা বা পুলিশের ইনস্পেক্টর হইবেন ।

একজন ভোজপুরী সজোরে একটি সন্ন্যাসীকে নাগরা জুতা
 সনেত পদাঘাত করিল । লোকটা বোধ হয় পুলিশের কনেষ্টবল বা
 নিম্নতন কোন কন্স্টাবল হইবে । নাগরা জুতার তলদেশ লোহ-
 মণ্ডিত ! আঘাতে সন্ন্যাসীর গা কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল ।
 সন্ন্যাসী লোকটার মুখের দিকে কেবল চাহিয়া রহিলেন, একটি
 কথাও বলিলেন না । ক্রোধ বা যন্ত্রণার চিহ্ন সে চাহনিতেন নাই,
 সে দৃষ্টি স্থিষ্ণ—সম্পূর্ণ বিরক্তিশূন্য !

ঠিক সেই সময়ে, জেলার প্রধান শাস্তিরক্ষক—একজন

সাহেব, অন্ধকূপ-সদৃশ সেই ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । সাহেবকে দেখিয়া সকলেই হতভম্ব হইয়া পড়িল । একরূপ অসমনয়ে, বিনা সংবাদে, ছদ্মবেশে, প্রধান কর্মচারী আসিলেন ! সাহেব যে নিম্নতন কর্মচারীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ! পুলিশকর্মচারীদের হৃদয় ছুর ছুর করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল । সাহেব ক্রোধ-কম্পিত স্বরে, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “তোদের মত নৃশংস কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্মচারীর দোষেই, নিষ্পাপ সাধুবাস্তি নির্ধাতিত হয় । চোর ধরিয়া দিলে, গুপ্ত পাকাইতে পাকাইতে বাহাত্তরী দেখাইবার সীনা থাকে না । চোর ধরিবারও তোদের যেরূপ শক্তি নাই, সেইরূপ কে চোর—কে সাধু, তাহা বুঝিবারও তোদের কোন সামর্থ্য নাই । ঘুষের লোভে, বিনা অপরাধে নির্দোষীকে নির্ধাতিত করিতে তোরা যেরূপ দক্ষ, প্রকৃত অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করিতেও তোরা সেইরূপ অভ্যস্ত ! তোদের মত অর্থলোভী, নৃশংস, কর্মচারীর দোষেই শাসন-বিভাগের লোককে সাধারণের চক্ষে হেয় হইতে হইয়াছে । যাহারা নির্দোভ, ধর্মভীরু, তাহাদিগকে তোদের মত লোকের সংসর্গে পড়িয়া নিন্দনীয় হইতে হয় । কত দেশে কত নিরপরাধ ভদ্র ও সাধুবাস্তি তোদের মত পণ্ডপ্রকৃতি লোকের দ্বারা এইরূপে লঙ্ঘিত হইতেছে, কে তাহাদের সংবাদ রাখে ? আমি তোদের কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিব । এখনই সরকারী নিদর্শন পরিত্যাগ কর । এই মুহূর্তেই আমি তোদের

পদচ্যুত করিলাম। বিচারকের সম্মুখে কঠোর দণ্ডের ভয়
অপেক্ষা কর।”

সাহেব, সন্ন্যাসিগণকে সসম্মানে মুক্তি প্রদান করিয়া চলিয়া
গেলেন। কোথা হইতে কি ব্যাপার সংঘটিত হইল, কেহ কিছুই
বুঝিতে পারিল না। পাঠক! তুমি হয় ত বুঝিয়াছ, ইহা সেই
পাগলিনীর খেলা!

উপসংহার ।

— ৩০৫ —

হরিদ্বারের বিজন অরণ্যে পূর্ণকুটীর বাড়িয়া, ঐ যে একটি সাধু ভগবচ্চরণে মনকে নিয়োজিত করিয়া দ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন, পাঠক ! উহাকে কি চিনিতে পার ? সাধুর সংসার আসক্তি, ভোগ সুখস্পৃহা কিছু মাত্র নাই । নদীর জল পান ও বৃক্ষপত্র ভক্ষণ করিয়া, সাধু জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছেন । সাধু পরকালের চিন্তায় কাতর হইয়া, ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন । পাগলী মা এক একবার আসিয়া সাধুকে দর্শন দিয়া গান শোত, তাপ, বর্ষা সাধুর মস্তকের উপর দিয়া গাইতেছে । সাধুর ব্রত অতি কঠোর । পাঠক ! ইনিই আমাদের সেই প্রবল প্রতাপশালী জমিদার—কৃষ্ণকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় । পাগলী মায়ের কথাতাই, কৃষ্ণকান্তের হৃদয়ে ভগবদভক্তির উদয় হয় । বিষয়-সম্পত্তি সাধু-সেবায় অর্পণ করিয়া, কৃষ্ণকান্ত সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন । কঠোর সাধনায় কৃষ্ণকান্তের পাপরাশি ধৌত হইয়া গিয়াছে । কৃষ্ণকান্তের হৃদয়ে এখন বিমল জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত ।

পাগলী মা এখন জগতের হিতের জন্ত, হিন্দুকে প্রকৃত হিন্দু

করিবার জন্ত, লোক-লোচনের আঁতুরালে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। পাগলী মায়ের তিলাঙ্ক বিশ্রাম নাই। কেবল দিনান্তে একবার করিয়া সাগরবালা ও করুণাময়কে দেখিয়া যান। ভবরামের সম্মান দুইটি পাগলী মায়ের বড়ই প্রিয়। তাহাদিগকে একবার করিয়া না দেখিলে, পাগলী মা কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না। ভবরামের আরক্ত কার্য সম্পন্ন করিবার জন্ত, মা প্রাণপণ করিতেছেন। সংসারে প্রতিনিয়ত যে সব ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, সংসারী মানব চক্ষুচক্ষে সে সকলের মঙ্গলামঙ্গল উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। সুতরাং পাগলী মাকে তাহারা কি করিয়া চিনিবে? মোহাক্ষ মানবকে সত্য বস্তু চিহ্নিত করার জন্ত, পাগলী মায়ের চেষ্টার বিরাম নাই।

করুণাময়, জ্যেষ্ঠের সঙ্কলিত অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। করুণাময় এখন “আদর্শ গৃহী।” তাঁহার সংসার এখন “হিন্দুর আদর্শ সংসার।” ব্রাত্যুপুত্র দুইটিকে জ্ঞানী, ধার্মিক ও হিন্দু সংসারের গৃহস্থামীর উপযুক্ত করিয়া গঠিত করিবার জন্ত তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ফকু যাহাতে গৃহস্থামীর উপযুক্ত হয়, তজ্জন্ত করুণাময় অহরহঃ ধ্যানে বসিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। ফকু এখন হইতে, পুণ্ড্রভ্রাতের আদেশের প্রীতিকা করিয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। জ্যেষ্ঠ ভবরাম, কনিষ্ঠ করুণাময়ের

